Banglapdf.net

যায় বেলা অবেলায়

শফীউদ্দীন সরদার

AKAS

SUVOM

যায় বেলা অবেলায়

শফীউদ্দীন সরদার

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

যায় বেলা অবেলায়

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ :
মহররম ১৪১৭ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বাংলা
জুন ১৯৯৬ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ
জমাঃ সানিঃ ১৪২৫ হিজরী
শ্রাবণ ১৪১১ বাংলা
আগস্ট ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ৮৫ ০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-8367-72-1

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞ আমি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক এ.এম.এম. বাহাউদ্দীন সাহেবের কাছে যাঁর মেহেরবানীতে আমার তিন তিনটে উপন্যাস পর পর তাঁর বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাওয়ায় আমি ঢাকার সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ায় খোশ্ কিস্মতি অর্জন করেছি। তাঁর এ মেহেরবানী অনন্য।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই "যায় বেলা অবেলায়" উপন্যাসটিই 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় আমার ঐ তিনটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ জন্য সম্মানিত সম্পাদকসহ এ পত্রিকার সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর হাসিবুল হাসান, অনুজ প্রতিম কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ, অগ্রজ প্রতিম সাহিত্যিক অধ্যাপক আব্দুল গফুর, কবি রুহুল আমিন খান, অনুজ প্রতিম মুনশী আব্দুল মান্নান, আহমদ সেলিম রেজা, হাসনাইন ইমতিয়াজ, দরবার আলম, মজিফ খান, আমার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র ও জামাইদের সবাইকে, যারা আমাকে লেখার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আজ স্মরণ করি মরহুম সৈয়দ মুজিবুল্লাহকে যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় আমাকে প্রথম অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমি ভ্রাতৃপ্রতিম মওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের কাছে যিনি পয়লা উদ্যোগ নিয়ে তাঁর 'মদীনা পাবলিকেশান্স' থেকে আমার উপন্যাস "বখতিয়ারের তলোয়ার" পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন।

এই "যায় বেলা অবেলায়" উপন্যাসটিও বই আকারে প্রকাশ করার জন্যে জনাব মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান ও মদীনা পাবলিকেশান্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি সকলের সার্বিক ভালাই কামনা ক আমীন।

শফীউদ্দিন সরদার

যায় বেলা অবেলায়

শফীউদ্দীন সরদার

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

যায় বেলা অবেলায়

এক

স্থবির ওয়াক্ত। সারা জাহানের একার্ধ গভীর নিঁদে অচেতন। বেশুমার নক্ষত্রের সফেদ মিছিল দুনিয়ার শামিয়ানা রোশনাই করে রেখেছে। কিন্তু আসমানের নীচেই জমাট বাঁধা অন্ধকার। জমিনটা তামামই কালো পর্দার কাফনতলে মুর্দার মতো সংজ্ঞাহীন। সুতোর মতো এক ফালি সরু চাঁদ তক্‌লিফ করে তশরীফ এনেই তড়িঘড়ি পালিয়ে গেছে অন্ধকারের আগ্রাসন আঁচ করতে পেরেই। ঝোপ-ঝাড়ের জোনাকিরা সাঁঝের বেলায় অপরিসীম খায়-খাটুনি করে ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে গেছে মাঝরাতে। শ্রমক্লান্ত দু' একটির দীপ্তিহীন দ্যুতি ছাড়া পাণ্ডুয়ার পথে-প্রান্তরে দুস্‌রা কোন দীপ নেই। প্রান্তরের অন্তিমে অরণ্যঘেরা বস্তিতেও সব বাতি নিভে গেছে। শুধু টিমটিম করে বাতি জ্বলছে হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের খানকাহ শরীফে। মৃদু হাওয়ায় দোদুল্যমান তরুলতার আবেষ্টনী ভেদ করে সে বাতির ঝিলিক ক্ষণে ক্ষণে বাইরে এসে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে। রাতের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে শৃগালের হাঁক আর সারমেয়দের অক্ষম হুমকি ছাড়া তামাম বাঙ্গালা নিস্তব্ধ।

এই নীরবতা ভেদ করে একটি দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো। অশ্বের লক্ষ্য খানকাহ শরীফ। হৃষ্টপুষ্ট উঁচু-চওড়া অশ্ব। সওয়ারও এক বলিষ্ঠ নওজোয়ান। তার অকুতোভয় দৃষ্টিতে হিম্মতের স্বাক্ষর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। উজ্জ্বল মুখমন্ডলে সদ্য-গজানো শ্মশ্রুর হালকা কালো আস্তরণ তার সৌন্দর্যের দীপ্তিকে তাগড়া করে তুলেছে। নওজোয়ানের শিরোভাগে শিরস্ত্রাণ আর কটিদেশে খাপবদ্ধ তলোয়ার।

অল্পক্ষণেই অশ্বটি খানকাহ শরীফের চত্বরে এসে দাঁড়ালো। লাফ দিয়ে নেমে নওজোয়ান তার অশ্বটিকে গাছের সাথে বাঁধলো। তারপর সে তাজিমের সাথে খানকার দিকে এগুলো। সুফী নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব খানকাহ শরীফেই ছিলেন। এবাদতের ফাঁকে অল্প একটু ঝিমুচ্ছিলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন ফৌজী লোক তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তাঁর ভ্রুযুগল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয়ে এলো। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, কে?

আগন্তুক বিনীতকণ্ঠে জবাব দিলো, হুজুরের এক নগণ্য খাদেম।

সে এগিয়ে এসে শিরস্ত্রাণ খুলে সুফী সাহেব কদমবুছি করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনুতাপের সাথে বললো, গোস্তাকী মাফ করবেন হুজুর! নেহায়েতই নিরুপায় হয়ে এই অসময়ে আপনাকে তকলিফ্ দিতে হলো।

খানকাহ্ শরীফের আলোতে দাওয়াটাও কিঞ্চিৎ আলোকিত ছিলো। সেই আলোতে আগন্তুকের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সুফী সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার নাম?

ঃ আলী আশরাফ।

ঃ কোথা থেকে আসছো?

ঃ গোয়ালপাড়া থেকে।

সুফী সাহেবের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো আর একবার। তিনি খেয়াল করে দেখলেন, এই অসময়ে গোয়ালপাড়া থেকে ফৌজীলোকের আগমন কোন খোশ খবরের আলামত নয় আদৌ। মনের ভাব চেপে রেখে ফের তিনি সওয়াল করলেন, তোমাকে কি এর আগে কখনও দেখেছি?

ঃ জি না হযরত! আমি এখানে নয়া আদমী। আমি মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী হুজুরের তালেবে এলেম। আমার হুজুরের হুকুমে আমি আজকেই বাদ আসর পাণ্ডুয়ার সুলতানী ফৌজে যোগদান করেছি।

মাওলানা বলখী সাহেবের নাম শুনে সুফী সাহেব প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি খোশ-দীলে বললেন, তুমি মাওলানা বলখী সাহেবের ছাত্র?

ঃ জি হাঁ। তাঁর খানকাতেই এলেম হাসিল করেছি।

ঃ এ এলাকায় আগে কখনও এসেছো?

ঃ জি না।

বিস্ময়ের ছাপ সুফী সাহেবের মুখমন্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি স্থির নজরে আলী আশরাফের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অতঃপর বললেন, এই আঁধার রাতে আমার খানকাহ বাড়ীর পথ তুমি চিনতে পারলে কি করে?

ঃ নকশা দেখে হযরত।

ঃ নকশা দেখেই অচিন রাহা চিনতে পারো?

ঃ তা পারি। আমার ফৌজী উস্তাদ মেহেরবাণী করে এ এলেমটুকু আমাকে ভালো করেই দিয়েছেন।

ঃ সাব্বাস্!

সুফী সাহেব তৃপ্তিবোধ করলেন। এই তৃপ্তির সাথে শরিক হওয়ার মতো মানসিক অবস্থা আলী আশরাফের ছিল না।

সে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, কিন্তু আমার বড় বদনসীব হুজুর! এখানের ফৌজে এসে যোগ দিয়েই এক নাখোশ পয়গাম নিয়ে আমাকে আপনার কাছে আসতে হলো।

সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেন। অপেক্ষাকৃত ভারী গলায় বললেন, ওটা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছি। এবার বলো, কি সে পয়গাম?

আলী আশরাফ তার কামিযেব জেব থেকে একখানা লেফাফাবদ্ধ পত্র বের করলো।

তাজিমের সাথে পত্রখানা সুফী সাহেবের হাতে দিয়ে বললো, উজির খান জাহান সাহেব এই খত আপনাকে পাঠিয়েছেন।

পত্রখানা হাতে নিয়েই সুফী সাহেব ত্রস্তপদে খানকাহ শরীফে ঢুকলেন। বাতির সামনে বসে একান্ত মনোযোগসহকারে পত্রখানা পাঠ করে আবার তা আগাগোড়া পাঠ করলেন। তারপর আর একবার। প্রতিবারেই তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলেন। পত্র পাঠ করে তিনি যখন আশরাফের কাছে ফিরে এলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে অপরিসীম না-খোশের অভিব্যক্তি। মর্মাহত অবস্থায় আলী আশরাফের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর তিনি সখেদে বললেন, ঈমান, ইজ্জত, আস্থা সবই এ দুনিয়া থেকে উঠেই গেলো একেবারে? একসাথে সবাই আমরা মোনাফেক হয়ে গেলাম?

কথা খুঁজে না পেয়ে আলী আশরাফ বললো, হুজুর!

ঃ পত্রে কি লেখা আছে তা তুমি জানো?

ঃ জি না হুজুর। পত্র পাঠের কোন এযাযত আমার ছিলো না।

ঃ খান জাহান সাহেব মুখে কিছু বলেন নি?

ঃ জি হাঁ, বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপনার আপোস-মীমাংসার তামাম কোশেশ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সুলতানী ফৌজ শাহজাদা শাহাবউদ্দীন আজম শাহকে অতর্কিতে আক্রমণ করে কয়েদ করেছে। তাঁর জান বাঁচানোর প্রশ্ন এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। সুবেহ সাদিকের মধ্যেই আপনার হস্তক্ষেপ না পড়লে শাহজাদার মওত অনিবার্য।

ক্ষোভে আর আক্রোশে হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন। পেরেশান অবস্থায় এদিক ওদিক কয়েক কদম পায়চারি করার পর বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আমি ভাবছি ফৌজের সাথে খান জাহান সাহেব গোয়াল পাড়ায় থাকতে এমন কান্ড ঘটাতে পারলো কি করে?

এর জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, হুজুর, এই অল্প সময়ে আমি যতদূর জেনেছি আর আমার জানার মধ্যে গলদ যদি না থাকে, তাহলে সবকিছুই উজির সাহেবের এক্তিয়ারের বাইরের ব্যাপার! লড়াইয়ের তামাম এক্তিয়ার সুলতানে আলা দৌলত খাঁ, মুরাদ বেগ আর ভরত সিংকে দিয়েছেন। উজির দশরথ দেবও নয়া ফরমান নিয়ে এসে তাঁদের কাতারে সামিল হয়েছেন। লড়াই, সন্ধি, কয়েদ, খুন – তামাম ব্যাপারেই চূড়ান্ত ফয়সালা নিজেরাই তাঁরা করছেন। উজির খান জাহান সাহেবের কোন কর্তৃত্বই নেই এখানে।

ঃ খান জাহান সাহেবের তাহলে কাজটা কি গোয়াল পাড়ায়?

ঃ সুলতানী ফৌজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার উপর নজর রাখা মাত্র।

সুফী সাহেব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বিরক্তি সহকারে স্বগতোক্তি করলেন, হুঁঃ! উম্‌রাহী জিল্লতি আর বলে কাকে!

সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে আলী আশরাফ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু সে

ব্যাপারে সুফী সাহেবকে তাকিদ দেয়াও গোস্তাকী। পন্ডিত মানুষ সুফী সাহেব। আল্লাহওয়ালা লোক। আরজ পেশ করার পর এন্তেজার করা ছাড়া আর করার কিছুই নেই এখানে। অনন্যোপায় হয়ে আলী আশরাফ জিজ্ঞাসু কন্ঠে বললো, হুজুর!

আলী আশরাফ চোখ তুলে চাইতেই সুফী সাহেব প্রশ্ন করলেন, শাহাবউদ্দীন আজম শাহ কখন কয়েদ হয়েছেন?

ঃ ওটাও সঠিক আমার জানা নেই হুজুর। খুব সম্ভব আজকেই বাদ মাগরিব। উজির সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েই খতখানা হাতে দিয়ে রওনা হওয়ার হুকুম দিলেন। বেশী কিছু জানার মওকা পাইনি।

সুফী সাহেব কি যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর আচানকভাবে প্রশ্ন করলেন, উজির সাহেবের হস্তাক্ষর আমি চিনি। এ খত তাঁরই লেখা। কিন্তু তুমি একজন নয়া আদমী! ছাউনিতে এতো লোক থাকতে এমন একটা ঈমানদারীর দায়িত্ব তিনি তোমার হাতেই দিলেন?

সুফী সাহেবের দৃষ্টি আলী আশরাফের মুখমন্ডল ভেদ করে তার দীল পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। পাকা জহুরীর মতো তিনি দৃষ্টির কষ্টিপাথর দিয়ে আলী আশরাফকে যাচাই করতে লাগলেন।

তা বুঝতে পেরে আলী আশরাফ শরমিন্দা কন্ঠে বললো, সবই খোদাতায়ালার ইচ্ছে হুজুর! এত লোকের মধ্যে কেন যে এত বড় ইজ্জত তিনি আমাকে দিলেন, তা আন্দাজ করার সাধ্য আমার নেই। তবে আমার আব্বাকে উনি জানতেন, আর বলখী হুজুরের পত্র পেয়ে উনি আমাকে নেক নজরে নিয়েছেন – এইটুকুই শুধু বুঝতে পারি।

সুফী সাহেব এবার প্রসন্ন দিলে বললেন, আল্ হামদুলিল্লাহ!

একটু অপেক্ষা করো এখানে। আমি এক্ষুণি একটা খত লিখে নিয়ে আসছি।

দাওয়ায় একটা খাটিয়া পাতা ছিলো। সেদিকে ইঙ্গিত করে সুফী সাহেব দ্রুতপদে খানকাহ শরীফে প্রবেশ করলেন। খাটিয়ার উপর বসে আলী আশরাফ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আল্লাহ তায়ালার বিশাল এ দুনিয়ায় অগণিত কওম উন্মুক্ত আসমানে উড়ন্ত পাখির মতোই ভাসমান। কারো জন্যেই কোন স্থান আগে থেকেই আখেরীভাবে নির্ধারণ করা ছিলো না, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতি কওমকেই তার আবাসস্থল হাসিল করতে হয়েছে। ইত্তেফাকের কুওতে যে কওম যত বেশী বলীয়ান সে কওম তত সহজেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল কওমের জায়গায় নিজের আবাস কায়েম করেছে। আজাদীর উদ্দীপ্ত গৌরবে যারা এক জায়গায় অধিককাল অনড় হয়ে থাকে কালক্রমে সেই জায়গাই সেই কওমের নিজস্ব মুলুক বা আজাদ ভূমিরূপে চিহ্নিত হয়। কিন্তু এই চিহ্নই কোন আখেরী সনদ নয়। নিজেদের কুওত, ঈমান আর ইত্তেফাকের মধ্যে যখনই ফাটল দেখা দেয় তখনই তাদের কওম ও আজাদ ভূমির অস্তিত্বের প্রশ্ন বিপন্ন হয়ে ওঠে।

সৃষ্টির আদি ওয়াক্ত থেকে এই দুনিয়ায় এই লড়াই চলে আসছে অবিরাম। এরই

ফলশ্রুতিতে আদিবাসীদের ইংল্যান্ড দখল করে নর্ম্যানরা। ইউরোপে ঢুকে পড়ে ককেশিয়ান শাখা। অনার্যদের পরাভূত করে আর্যরা এসে তাদের আবাসভূমি কায়েম করে ভারতবর্ষে। কালক্রমে নানা গোত্রে বিভক্ত আর্যদের আস্তানায় প্রোথিত হয় ইসলামের ঝাণ্ডা। অনার্যদের আবাসভূমি ভারতবর্ষে শুরু হয় আর্যোদ্ভূত হিন্দু আর নবাগত মুসলমানদের আধিপত্যের লড়াই। কওমী জোশ, ঈমান ও একতার বরকতে মুসলমানদের হুকুমাত কায়েম ও সুদৃঢ় হয় ভারতবর্ষে। কিন্তু পরাভূত আর্য হিন্দুকুল আলমে ইসলামের ঝাণ্ডা তলে মাথা নুইয়ে থাকলেও তাদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুর্বার খাহেশ তাদের দীল থেকে একেবারেই অন্তর্হিত হয় না। ফল্গুধারার মতো তা অদৃশ্যভাবে বইতে থাকে অনুক্ষণ। বাংলার সালতানাতের প্রেক্ষাপটও ঐ একই প্রবাহে আক্রান্ত।

ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতাব্দির গোড়ার দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলামুলুক অভিযানের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আজাদভূমি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা মুলুকে। এর অস্তিত্বকে শানদার রাখার মূলে প্রাণশক্তিরূপে কাজ করে একতা, ইত্তেহাদ, ঈমান, শৃঙ্খলা আর কওমী স্বার্থের ময়দানে ব্যক্তিস্বার্থের অকুণ্ঠ কোরবানী। এই প্রাণশক্তির লালনই ইসলামের ঝান্ডাকে যেমন সারা জাহানে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে, এর অবমাননাও তেমনি মুসলমানদের সামনে জিল্লতির রাহা খোলাসা করে দিয়েছে। ইসলামের আগমনের প্রায় সোয়াশ' বছরকাল পর ইলিয়াস শাহী সালতানতের প্রতিষ্ঠা হয় বাংলা মুলুকে। প্রতিষ্ঠাতা হাজী শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ। এই সময়ের মধ্যে ইসলামের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার ইরাদায় অনেক সুফী-সাধক আউলিয়া বাংলা মুলুকে আসেন এবং ধর্ম প্রচারের সাথে মুসলমানদের হুকুমাতকে কওমী আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাখার কোশেশ করেন। কওম ও আজাদীর স্বার্থে তাঁরা অনেকেই সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে যান। কওমী ইয্‌যত হেফাজত করার নিয়তে কেউ কেউ আবার রণাঙ্গণেও নেমে যান নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে।

ইলিয়াসশাহী হুকুমাতকে নসিহত ও নির্দেশনা দান করতে যে কয়জন সুফী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মোজাফ্‌ফর শামস্ বলখী ও হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শয়খ আলাউল হক, শয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মনেরী, শয়খ হামিদউদ্দীন কুঞ্জনশীন নাগৌরী প্রমুখ সুফীগণের অল্পবিস্তর ভূমিকা থাকলেও কওমী আদর্শ থেকে ইলিয়াস শাহী হুকুমাতের নিদারুণ বিচ্যুতি লক্ষ্য করে মাওলানা মোজাফ্‌ফর শামস্ বলখী ও হজরত নূর কুতুব-ই-আলমই সর্বাধিক বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং এই হুকুমাতের কর্ণধারদের হামেশাই নসিহত করার কোশেশ করেন। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম স্রেফ নসিহত করেই ফারাগে থাকতে পারেন নি। তাঁকে কখনও কখনও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কিন্তু কথায় বলে, 'আকেল মন্‌দকে লিয়ে ইশারা কাফী।' যারা বেয়াক্কেল তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঠেললেও কাজ হয় না ইরাদা মাফিক। কওমী আদর্শ থেকে কোন হুকুমাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একবার বিচ্যুত হয়ে পড়লে চরম আঘাত না পাওয়াতক্ তাঁদের হুঁশে আনা যায় না। মাওলানা মোজাফ্‌ফর শামস্ বলখী আর হজরত নূর কুতুব-ই-আলম শত চেষ্টা

করেও তা পারেন নি। ইলিয়াসশাহী হুকুমাতের এক বিশিষ্ট পর্যায়ে মুসলমান উমরাহদের মধ্যে কওমী চেতনা, ঈমান আর একাত্মবোধ একদিকে যেমন নিতান্তই কমজোর হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্ব, গাদ্দারী আর স্বার্থপরতা তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে ইলিয়াসশাহী হুকুমাত বালা মুলুকে মুসলমানদের অন্যতম মশহুর হুকুমাত হওয়া সত্ত্বেও চরম মূল্য দিয়ে এই হুকুমাতকে পর্দার অন্তরালে অপসারিত হতে হয়। একডালা কেল্লার অপরাজেয় শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো জমিনের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আলী আশরাফ এই পরিণতির বিরুদ্ধে এক বুলন্দ্ প্রতিবাদ।

দুই

ঈসায়ী চতুর্দ্দশ শতাব্দির শেষার্ধের কথা। মাওলানা মোজাফ্ফর শামস্ বলখী সাহেবের খানকাহ শরীফে একটা আনুষ্ঠানিক মিলাদে মাহফিল এই মাত্র শেষ হলো। মিলাদ অন্তে উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব তবারক নিয়ে এলেন। তবারকের ঝুড়ি বারান্দার উপর রেখে তিনি তালেবে এলেমদের বললেন, ঝুড়ি থেকে প্রত্যেকেই একটা করে মোড়ক নাও। দু'টি কেউ নিবেনা। হিসাব করা মোড়ক। একজন একটা বেশী নিলে আর একজনের কম পড়বে।

ঝুড়ি রেখে উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব বলখী সাহেবের খাশ কামরায় ছুটলেন। কিছু বুজুর্গকে নিয়ে বলখী সাহেব ব্যস্ত আছেন সেখানেই। তিনি তলব করেছেন উস্তাদজীকে।

বিহারের এক প্রান্তে মাওলানা মোজাফ্ফর শামস্ বলখী সাহেবের খানকাহ শরীফ। জৌনপুর শহরের একদম নিকটে বলখী সাহেবের খানকাহ শরীফে ছাত্র সংখ্যা অনেক। ছোট-বড়-মাঝারী এই তিন কেসিমের তাল্বে এলেম। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা এই তিন দফায় তালিম দেয়া হয় এদের। ছোট দলে ছেলের সাথে পাশ্ববর্তী এলাকার ছোট ছোট মেয়েও ছবক নিতে আসে। বড় দলেদের ছাত্ররাই খানকাহ শরীফের কর্মী। মিলাদ-জালসা-মাহফিলের তামাম আন্জাম বড় ছেলেরাই করে। তাদের বেশীর ভাগই খানকাহ শরীফে থাকে। এখানে তারা কেতাব পড়ে, ইবাদত করে, খানকাহ শরীফ পরিচর্যায় শ্রম দেয় এবং পালাক্রমে বাইরে গিয়ে ফৌজী এলেম শেখে। মাঝারী আর ছোটরা অধিকাংশই বাইরে থেকে আসে। নেহাতই এতিম ছাড়া ছোটরা কেউ খানকাহ শরীফে থাকেনা।

ছোটদের ছবক দেয়া শেষ হয়েছে। মিলাদটিও শেষ হলো। এখন তবারক দেয়া হচ্ছে। তবারক দেয়া হয়ে গেলেই ছোট বাচ্চাদের ছুটি। মাঝারীদের ছবক দেয়া একটু

পরেই শুরু হবে।

উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ ঝুড়ি রেখে যেতেই হৈ হৈ করে ছুটে এলো ছোট ও মাঝারী দলের ছেলেমেয়েরা। তারা হুটোপুটি করে তবারক তুলে নিতে লাগলো। এরই মধ্যে সকলে ঈমান-আদব অনেকখানি আয়ত্ত করে ফেলেছে। বাচ্চাসুলভ কাড়াকাড়ি করছে তারা ঠিকই, কিন্তু একটার বেশী দুটো কেউ নিচ্ছে না।

ভিড়ের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে তবারকের মোড়ক নিয়ে বেরিয়ে আসতেই অন্য একজনের ধাক্কা লেগে মোড়কটা তার হাত থেকে ছিটকে অনেকখানি দূরে গিয়ে পড়লো এবং মোড়ক ফেটে তবারকগুলো ধূলোর মধ্যে ছড়িয়ে গেলো। হতাশায় মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলো। তাকে কাঁদতে দেখে মাঝারী দলের একটি বালক ঝুড়ি থেকে আর একটা মোড়ক এনে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সমবয়সী দুসরা এক বালক এসে থপকরে মোড়কটি তার হাত থেকে কেড়ে নিলো। মোড়কটি ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে সে বললো, উস্তাদদের হুকুম তুমি শোনো নি? একটার বেশী হিস্‌সা কারো নেই!

মেয়েটিকে দেখিয়ে দিয়ে পয়লা বালক বললো, দেখছো না, ওরটা যে পড়ে গিয়ে বরবাদ হয়ে গেলো!

দ্বিতীয় বালক এর জওয়াবে বললো, ওর নসীবে ওটা নেই বলেই বরবাদ হয়ে গেছে। একজনের জন্যে তো আর একজনের হক মারতে পারো না?

পয়লা বালক বললো, কিন্তু আমরা সবাই খাবো আর ও

ঃ তাই যদি মনে করো, তাহলে তোমার নিজের হিস্‌সাটা দিয়ে দাওনা ওকে।

ঃ বাহ! তাহলে আমি খাবো কি?

ঃ তাহলে আর কথা বলছো কেন? যাও, আরাম করে খাও গে। পরের দিয়ে পীরের ধার সবাই শুধ্‌তে পারে!

আর কিছু না বলে দ্বিতীয় বালকটি মেয়েটিকে টেনে নিয়ে ভিড় থেকে একদম ফাঁকে চলে এলো। নির্জন জায়গায় এসে সে তার পিরহানের জেব থেকে তবারকের একটা মোড়ক বের করলো। মোড়কটা মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, ছিঃ! কাঁদতে নেই। নসীবে যা নেই, তা নিয়ে আফসোস্ করতে হয় না। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তা সহ্য করতে হয়।

জবাবে মেয়েটি কোন কথাই বললো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে এক নজরে চেয়ে রইলো। বালকটি এবার হেসে উঠে বললো, কি বোকা মেয়েরে! চেয়ে দেখছো কি? খাও।

মেয়েটি এবার ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, তুমি এটা কোত্থেকে আনলে? ঐ ঝুড়ি থেকে?

ঃ হ্যাঁ, ঐ ঝুড়ি থেকেই নিয়েছি ঠিক, কিন্তু এটা অন্য কারো হিস্‌সা নয়। আমার নিজের ভাগের এটা।

ঃ তোমার নিজের ভাগের? তাহলে তুমি খাবে কি?

ঃ আরে, আমি তো আসার আগে আজ খুব খেয়েছি বাড়ীতে। পেট ভরাই আছে। কিছুই আর এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

ঃ তাই?

ঃ বিলকুল। তুমি খাও।

ঃ না, বাড়ী নিয়ে যাবো। আম্মার সাথে খাবো।

ঃ তাহলে তাই যাও। আম্মার সাথেই খেয়ো।

ছেলেমেয়েরা অনেকেই ইতিমধ্যে বাড়ীর পথ ধরেছে। এক হাতে কিতাব আর অন্য হাতে তবারকের মোড়ক নিয়ে এই মেয়েটিও ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

মেয়েটি খুব ছোট। বছর আষ্টেক বয়স। সুন্দর গোলগাল পটে আঁকা মুখমণ্ডল। কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তার সে সৌন্দর্য নিষ্প্রভ। পরনে তার জরাজীর্ণ লেবাস। অতদবিরে তার সর্বাঙ্গ মলিন। উস্কোখুস্কো মাথার চুল যত্নের অভাবে কাকের বাসার চেয়েও অধিকতর শ্রীহীন। আচরণে সে অত্যন্ত সহজ ও সরল। তার অসহায় চাউনিতে হেফাজতির ঐকান্তিক আরজু!

হাত থেকে তবারকের মোড়কটা কেড়ে নেয়ায় আর সেই সাথে দু'কথা শুনিয়ে দেয়ায় সেই পয়লা বালকটি অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলো। একটু পরেই উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব ফিরে এলে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বালকটির বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করলো। ফরিয়াদ শোনার পর উস্তাদজী দ্বিতীয় বালককে তলব দিলেন। দ্বিতীয় বালক সামনে এসে হাজির হলে উস্তাদজী নাখোশ কণ্ঠে বললেন, আলী আশরাফ, তুমি কোন বেইনসাফী কাজ করবে এ ধারণা আমাদের কারো নেই। তোমার আখলাকে হঠাৎ এমন গল্‌তি দেখা যাচ্ছে কেন?

আলী আশরাফ কিছু বুঝতে না পেরে বিনীত কণ্ঠে বললো, আমি কি কোন গোস্তাকী করেছি হুজুর?

ঃ তুমি নাকি একটা মাসুম মেয়েকে তবারকের হক থেকে বঞ্চিত করেছো?

ব্যাপারটা এবার আঁচ করতে পেরে আলী আশরাফ খোলাসা কণ্ঠে বললো, আ বঞ্চিত করিনি হুজুর। ওর নসীবে ওটা ছিলো না বলেই মোড়কটা ওর হাত থেকে ড়ে বরবাদ হয়ে গেছে।

ঃ কিন্তু তাই বলে ওকে বাদ দিয়েই তবারক খেতে পারলে তোমরা? আমাকে বললেই তো আর একটা মোড়ক পাঠিয়ে দিতাম?

ঃ ওকে বাদ দিয়ে খাইনি হুজুর।

ঃ কেন, আফজাল আলী যে বলছে, ওকে দুস্‌রা কোন মোড়ক নিতে দাওনি তুমি?

ঃ ও যেটা দেখেছে, সেইটেই ও বলছে। যা দেখেনি, সেটা ও কেমন করে বলবে?

উস্তাদজীর নজর এবার তীক্ষ্ণ হলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মতলব?

ঃ আমি আমার নিজের মোড়ক লেড়কিটাকে দিয়ে দিয়েছি হুজুর।

উস্তাদের তীক্ষ্ণ নজর মোলায়েম হলো। তিনি আবেগ বিস্ময়ে বললেন, তোমার

নিজেরটা মানে তোমার হিস্‌সেটাই দিয়ে দিয়েছো ওকে?

ঃ জি হাঁ হুজুর।

ঃ তুমি তবারক খাও নি?

ঃ তাতে কি হুজুর! সকালে আমি ঢের নাস্তা করেছি। কিন্তু লায়লা আকতারের মুখ দেখে মনে হলো ও কিছুই খায়নি আজ।

ঃ লায়লা আকতার? ও তো বড়ই গরীব মেয়ে।

ঃ আমারও তাই ধারণা হুজুর। আর সেইজন্যে আমার হিস্‌সায় দু'টো মোড়ক থাকলে দুটোই ওকে দিতাম।

ঃ কই সে?

ঃ ঐ যে হুজুর! ওই সে যাচ্ছে।

উস্তাদজী রাস্তার দিকে নজর দিয়ে দেখলেন, লায়লা নামের মেয়েটি মেঠো পথ ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। নজর ফিরিয়ে নিয়ে উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব প্রসন্ন দীলে বললেন, সাব্বাস বেটা! একটা মস্ত বড় পেরেশানী থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দিলে! ওর মতো এতিম বাচ্চা এখান থেকে খালি হাতে ফিরে গেলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের নামে অপরিসীম গুনাহ লেখা পড়তো। এবার এসো তুমি আমার সাথে। তবারকের কয়েকটা মোড়ক বেঁচে গেছে। ওখান থেকে নেবে একটা এসো।

আলী আশরাফকে টেনে নিয়ে উস্তাদজী রওনা হলেন। আফজাল আলী তা দেখে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, এ্যাঁ! বেঁচে গেছে? আমিও তাহলে আসবো হুজুর?

উস্তাদজী নাখোশ নজরে পেছন ফিরে তাকালেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, না। তুমি ঐ এতিম মেয়েটাকে ঝুড়ির একটা মোড়ক দিতে গিয়েছিলে, যদিও তাতে আর একজনের হিস্‌সা মারা যেতো, তবু ঐ এতিমের জন্যে তোমার দীলে রহম পয়দা হয়েছিলো। আর এ কারণেই তোমার অপরাধ নিলাম না। কিন্তু নালিশ না করে তোমার নিজেরটা ঐ এতিমকে দিয়ে যদি সে কথাটা বলতে আমাকে, তোমাকে আমি আরো দু'টো মোড়ক ইনাম দিতাম।

আলী আশরাফকে নিয়ে উস্তাদজী কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

* * *

আলী আশরাফও একজন এতিম বালক। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা তার ভালো। জৌনপুর শহরের প্রবেশপথেই তার মকান। বলখী সাহেবের খানকাহ শরীফ থেকে যে রাস্তাটি ঘুরে বেঁকে শহরে এসে ঢুকেছে, সেই রাস্তার উপরে। এক কথায় বলা যায়, আলী আশরাফের মকানটাই শহরের এই দিকটার প্রবেশদ্বারের প্রহরী। মকানটা আশরাফের পৈতৃক মকান নয়। আলী আশরাফের আব্বা আলী আসগার ছিলেন একজন মশহুর যোদ্ধা। শেষ জীবনে তিনি জৌনপুর সুলতানী ফৌজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এক গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অপরিসীম বীরত্বের দ্বারা জৌনপুরের বিজয়কে নিশ্চিত করে দিয়ে তিনি শহীদ হন। তারই প্রতিদানস্বরূপ এই বাড়ী এবং একটা মোটা অংকের অর্থ

জৌনপুরের সুলতান আলী আসগারের পরিবারকে ইনাম দেন। ছোটখাটো ধরনের একটা রুচিশীল বাড়ী। শহরের কেন্দ্রস্থলে এর চেয়ে অনেক বড় একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ী সুলতান আলী আসগারের পরিবারকে দিতে চান। কিন্তু পরিবারে লোকসংখ্যা নিতান্তই কম হওয়ায় মরহুম আলী আসগারের স্ত্রী তাতে নারাজ হন এবং শহরের এক প্রান্তে নিরিবিলি এলাকার এই বাড়ীটাই পছন্দ করেন। মরহুমের পরিবারে মরহুমের স্ত্রী আর একমাত্র সন্তান আলী আশরাফ ছাড়া তৃতীয় কোন আপনজন ছিলো না। অবশ্য আলী আসগারের জীবদ্দশায় দাস-দাসী আর ঝি-চাকরে পরিবারটা বাহ্যিকভাবে মস্তবড়ই ছিলো। আলী আশরাফের আম্মাও কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করায় আলী আশরাফ এখন একেবারেই একা। পুরান আমলের বৃদ্ধ নওকর শেখ আব্দুল্লাহ এখন আলী আশরাফের একমাত্র অভিভাবক। আব্দুল্লাহর সাথে আর একটা নওকর, একজন সহিস, একটা ঝি আর দুইজন অশ্বশালার পাহারাদার নিয়ে এতিম আলী আশরাফের সংসার। তবে সেইজন্যে তেমন কোন মুসিবতে পড়তে হয়নি আশরাফকে। জৌনপুরের খোদ সুলতানের নেকনজর আর বলখী সাহেবের স্নেহ দুর্ভেদ্য-দুর্গের মতো আলী আশরাফকে আগাগোড়াই হেফাজত করে রেখেছে।

বচপন কাল থেকে আলী আশরাফ আব্দুল্লাহর কোলেই মানুষ হয়েছে। আজও আব্দুল্লাহকে ছেড়ে সে খানকাহ শরীফে রাত কাটাতে পারে না। সকাল বেলা খাইয়ে দাইয়ে আব্দুল্লাহ তাকে পাঠিয়ে দেয় খানকাহ শরীফে। সরাবেলা খানকাহ শরীফে কাটিয়ে আলী আশরাফ বিকেল বেলা নিজ মকানে ফিরে আসে। ইদানীং সকাল থেকেই ফৌজী উস্তাদের কাছে ফৌজী শিক্ষা নিতে যায়। আগে আব্দুল্লাহই তাকে কাঁধে করে খানকাহ শরীফে রেখে আসতো আর নিয়ে যেতো। এখন অনেক বড় হয়েছে আলী আশরাফ। বছর তের চলছে। এখন সে সর্বত্র নিজেই যায় নিজেই আসে। বড় রাস্তা বেয়ে ঘুরে বেঁকে গেলে প্রায় এক ক্রোশ। মেঠো পথে সোজা গেলে আধা ক্রোশেরও কম। এই পথই বেছে নিয়েছে আলী আশরাফ।

শহরের উপকণ্ঠে মেঠো পথের ধারে একটা মস্তবড় বস্তি এলাকা। ভিস্তিওয়ালা, লাকরিওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ফলওয়ালা, সবজিওয়ালা ক্ষৌরকার আর ধোবীরা বাস করে এখানে। এছাড়াও এখানে থাকে কামিন-মযদুর ছুতোর-কামার লোকেরা। সকলেই এরা শহরের দিকে ছোটে। কাজকাম আর বেচাকেনা শেষ করে সাঁঝ ওয়াক্তের আগেই বস্তিতে ফিরে আসে। এই বস্তিরও অনেক বাচ্চা খানকাহ শরীফে পড়ে। আলী আশরাফের সাথীর অভাব হয় না।

সেদিন আলী আশরাফের বেরুতে একটু দেরী হলো। পথে নেমে সাথী কাউকে পেলো না। সে আনমনে একা একাই পথ ধরে যাচ্ছে। যেতে যেতে রাস্তায় একটা কিতাব কুড়িয়ে পেলো। ছেঁড়াফাটা পুরানো এক কিতাব। বাচ্চাদের পাঠ্যবই। খানকাহ শরীফের তালেবে-এলেমদের কারো না কারো হবে। খানকাহতে গিয়ে তালাশ করলেই এর মালিক বেরিয়ে পড়বে। আলী আশরাফ পুনরায় পথ চলতে লাগলো। একটা বাড়ীর কাছে এসেই বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। বাঁক ঘুরে এগুতেই সে দেখতে পেলো ছোট একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে রাস্তা বেয়ে। সে কাঁদছে আর দুই হাতে সমানে

চোখ ডলছে। আর একটু কাছাকাছি হতেই আলী আশরাফ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, আরে, লায়লা আকতার! তুমি কাঁদছো কেন, আর ফিরেই বা আসছো কেন?

আলী আশরাফকে দেখে লায়লা আকতার আরো জোরে কাঁদতে লাগলো। আলী আশরাফ লক্ষ্য করে দেখলো, অতিরিক্ত কান্নার ফলে তার চোখ দুটো ইতিমধ্যেই ফুলে গেছে। আলী আশরাফ ফের তাকে প্রশ্ন করলো, আহা, কি হয়েছে তা তো বলবে আগে?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে লায়লা আকতার জওয়াব দিলো, আমার কিতাব হারিয়ে গেছে।

ঃ তো কি হয়েছে তাতে? তার জন্যে এত কাঁদতে হবে?

ঃ উস্তাদজি মারবে যে! মকানে গেলে আম্মাও আমাকে মারবে।

ঃ কেন, মারবে কেন?

ঃ কিতাব না থাকলে আমি পড়া শিখব কি দিয়ে?

ঃ দূর পাগলী। আর এর একটা কিতাব কিনে নেবে।

ঃ হাদিয়া দেবো কেমন করে? আমাদের যে কড়ি নেই!

ঃ তাহলে উস্তদজীকে বললেই খানকাহ থেকে একটা কিতাব দিয়ে দেবেন।

ঃ না, আর দেবেন না। দু'বার নিয়েছি। ফের গেলে মারবে।

ঃ তুমি খুব কিতাব হারাও?

ঃ হুঁ।

মাথা নেড়ে লায়লা আকতার জওয়াব দিলো। আলী আশরাফ আবার প্রশ্ন করলো, পড়াশুনাতে মন নেই?

লায়লা আকতার জওয়াব না দিয়ে মাথা নীচু করলো। আলী আশরাফ তার কুড়িয়ে পাওয়া কিতাবটা সামনে ধরে বললো, দেখো তো, এইটে তোমার কিতাব না কি?

লায়লা আকতারের মুখমণ্ডলে যে খুশীর দীপ্তি ফুটে ওঠে, বিস্ফারিত নেত্রে সে আলী আশরাফের মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইটেই। এইটেই তো আমার কিতাব। তুমি কোথায় পেলে?

ঃ পথে। ঐ ওখানে কুড়িয়ে পেয়েছি।

ঃ আমাকে দেবে?

ঃ দেবোই তো।

ঃ তাহলে দাও।

আলী আশরাফের হাত থেকে এক রকম ছোঁ মেরেই লায়লা আকতার কিতাবখানা নিয়ে নিলো। আলী আশরাফ হেসে উঠে বললো, এবার খুশী হয়েছো?

ঃ হুঁউ!

পরিমানের চেয়েও মাথাটা তার অনেক বেশী কাত করে লায়লা আকতার জওয়াব দিলো।

ঃ এর পর আর কাঁদবে নাতো?

ঃ না।

ঃ চলো এবার খানকাহ শরীফে যাই।

লায়লা আকতার গম্ভীর হলো। বললো, না, আজ খানকাহ শরীফে যাবো না।

ঃ কেন?

ঃ দেরী হয়ে গেল যে!

ঃ দেরী তো আমারও হলো।

ঃ আমাদের যে সবার আগে ছবক দেয়। এতক্ষণ ছবক দেয়া শুরু হয়ে গেছে। দেরীতে গেলে উস্তদ খুব নাখোশ হবেন।

ঃ না গেলে যে আরো বেশী নাখোশ হবেন উনি!

লায়লা আকতার চিন্তায় পড়লো। চিন্তা করে বললো, বকবে নাতো?

ঃ আরে দূর! বকবে কেন? ইচ্ছে করে গাফিলতি করলে বা জেনে শুনে কসুর করলে বকেন। তুমি তো আর ইচ্ছে করে কোন কসুর করো নি? চলো, আমি উস্তাদজীকে বুঝিয়ে বললে উনি মোটেই নাখোশ হবেন না।

লায়লা আকতার ইতস্তত করতে লাগলো। আলী আশরাফ তাকে ঠেলে নিয়েই খানকাহ শরীফে রওয়ানা হলো।

পরের দিন মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেব আলী আশরাফকে খাস কামরায় তলব দিলেন। আলী আশরাফ সেখানে গিয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই লক্ষ্য করলো, একজন উঁচুদরের ফৌজী কর্মকর্তা পাশের এক কুরসীর উপর উপবিষ্ট। আলী আশরাফকে দেখিয়ে মাওলানা সাহেব সেই ফৌজী কর্মকর্তাকে বললেন, আফতাব খাঁ সাহেব, এর নামই আলী আশরাফ। খুবই আকেলমান্দ ছেলে। যেমন ব্যবহার, তেমনি মেধাবী। এলেমের প্রতি এর গভীর আগ্রহ।

আফতাব খাঁ জৌনপুরের একজন উচ্চ পর্যায়ের সালার। নিজের পদ আর খানদান সম্পর্কে তিনি সব সময়ই সজাগ। নিরাসক্ত নজরে আশরাফের দিকে চেয়ে আফতাব খাঁ বললেন, তোমার নাম আলী আশরাফ?

আলী আশরাফ আদবের সাথে জওয়াব দিলো, জি, হ্যাঁ।

ঃ তুমি আলী আসগারের ছেলে?

ঃ জি।

ঃ সস্তা বাহবা নিতে গিয়ে আহাম্মকের মতো জানটা দিলেও তোমার আব্বাতো তোমার আখেরাতটা মজবুত করেই গেছে। ছাপ্পড় ফেঁড়ে পাওয়ার মতো সুলতানের নেক নজরটা পেয়ে গেছো। সুলতানের এই অনুগ্রহের ইয্যত রাখতে পারবে তো?

আলী আশরাফ এ কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বললো, জি!

আফতাব খাঁ বললেন, তোমার তো ওয়ালী কেউ নেই। উপযুক্ত অভিভাবক না থাকলে ছেলে-ছোকরারা বেশীর ভাগই বিপথগামী হয়। যদিও মাওলানা সাহেব তোমার

চরিত্রের তারিফ করেছেন, তবু আমি বলবো, ওটা বরবাদ হতে কতক্ষণ? বস্তির ছেলেদের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়ালে, বেত্তমিজী ছাড়া খানদানী আখলাকের কিছুই শেখা যায় না।

ঃ আপনি দোওয়া করবেন আমি যেন কোনদিনই কোন বেত্তমিজী না শিখি!

ঃ শুধু দোওয়া করলেই কোন আহম্মককে হুঁশে আনা যায় না। সেজন্যে চাই সৎ পরিবেশ, হুঁশিয়ার তালিম আর তালিমের ইস্তেমাল। সৎ পরিবেশ আর সুসংসর্গ ছাড়া খানদানের বাইরের কেউ সত্যিকারের ইনশানরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

একটা নাবলককে আফতাব খাঁ যে আই ধরনের নসীহৎ করা শুরু করবেন মাওলানা সাহেব তা আন্দাজ করতে পারেন নি। তিনি উস্‌খুস্‌ করে বললেন, না, আলী আশরাফের দ্বারা আল্লাহর রহমে ইনসানিয়াতির খেলাপি কিছু হবে না। নিজেই সে অনেক সদগুণের অধিকারী। এছাড়াও তাকে হুঁশিয়ারভাবেই তালিম দেয়া হচ্ছে।

আফতাব খাঁ একই রকম উপেক্ষার সাথে বললেন, তা হোক। তবু সম্পদশালী এতিমের লাগাম সব সময়ই শক্ত হাতে ধরে রাখতে হয়।

এরপর আলী আশরাফকে বললেন, তুমি উস্তাদ বুরহান উদ্দীন খানের কাছে লড়াই শিখতে যাও?

আলী আশরাফ বললো, জি হ্যাঁ। উনিই আমাকে মেরেবানী করে ফৌজী শিক্ষা দেন।

আফতাব খাঁর কপালের চামড়া অনেক খানি কুঁচকে গেলো। একটু নিরব থেকে তিনি তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, হুঁঃ! বুরহান উদ্দীন খাঁন সাহেব এ তল্লাটের খানদানী উস্তাদ। যাকে তাকে তিনি অস্ত্র শিক্ষা দেন না। সুলতানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত না হলে তোমার প্রতি তাঁর এই মেহেরবানী কোন দিনই হতো না।

আলী আশরাফ প্রতিবাদ করে বললো, না, তামাম মনোযোগী তালেবে এলেমদের প্রতিই তাঁর খুব মেহেরবানী। সবাইকে তিনি ডেকে ডেকে ছবক দেন। ছবক দেয়ার সময় খাওয়া দাওয়ার কথা তিনি একেবারেই ভুলে যান। এক বারের জায়গায় একই তালিম দশ দশবার দিতেও তিনি একটুও নাখোশ হন না।

তেরছা নজরে চেয়ে আফতাব খাঁ বললেন, থামো! এ ধরনের গোস্তাকী আমার খুবই না-পছন্দ। তুমি একটা বাচ্চা ছেলে। আমার চেয়ে উস্তাদজীর খবর তুমিই বেশী জানো এরকম ধৃষ্টতা কোন খানদান ঘরের ছেলে কোন মুরুব্বীর কাছে দেখায় না। আমি সুলতানের এক জবরদস্ত সালার। আমার ছেলেকেই শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন উনি। দু'দুবার আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি নিজে গিয়ে সুপরিশ করে তবেই তাকে রাজী করতে পেয়েছি।

আলী আশরাফ ভড়কে যাওয়ার ছেলে নয়। অবিচলিত কণ্ঠে সে এর জওয়াবে বললো, যারা ছবক নিতে গাফিলতি করে, শিক্ষায় যাদের মনোযোগ নেই কিংবা ফৌজী শিক্ষার পক্ষে আসলেই যারা কমজোর তাদেরকেই উস্তাদজী ফেরত পাঠান। পহেলী

ছবকের দলে এ যাবত একজনকেই ফেরত দিয়েছেন তিনি।

মাওলানা সাহেব সচকিত হয়ে বললেন, কে সে? আমাদের খানকাহর কোন তাবেলে এলেম?

আলী আশরাফ বললো, জি হাঁ, আমাদের আফজাল আলীকে। ফৌজী শিক্ষায় তার এতটুকু মনোযোগ নেই।

আফতাব সাহেব গর্জে উঠলেন। বললেন, ঝুট! বিলকুল ঝুট! যে বিষয়টা জানোনা সে বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া শুধু আহাম্মকিই নয়, পুরো দস্তুর বেয়াদবী।

ঃ জানবো না কেন? আমার সামনেই যে ঘটনা।

ঃ খামোশ! কথার পিঠে কথা বলাটাও আমার না-পছন্দ। আফজাল আলীকে কতটুকু জানো তুমি? কোন শিক্ষার প্রতিই তার এতটুকু অনাগ্রহ নেই, বরং তার মতো আগ্রহী তালেবে এলেম খুব কমই আছে এই জৌনপুরে। বুরহানউদ্দীন সাহেব তাকে ফেরত দিয়েছেন কোন ফালতু ঘরের ছেলে ভেবে, অমনোযোগের জন্যে নয়। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের মধ্যে কোন ফালতু ঘরের ছেলে ঢুকিয়ে পরিবেশটা উনি দূষিত করতে চান না।

প্রত্যুত্তরে আলী আশরাফ আরো কিছু বলার কোশেশ করতেই মাওলানা সাহেব অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তুমি এঁকে চেনো? ইনিই আফজাল আলীর আব্বা।

আলী আশরাফ অবাক হয়ে বললো, এ্যাঁ! তাই নাকি? আপনিই আফজাল আলীর আব্বা?

এরপর হাত তুলে সে আফতাব খাঁকে সালাম দিয়ে বললো, আফজাল আলী এই খানকাহতে আমার সাথেই পড়ে।

সালামের কোন জওয়াব না দিয়ে আফতাব খাঁ বললেন, সেটা তোমার খোশ কিসমতি যে, আমার ছেলের সাথে তোমার পড়ার মওকা ঘটেছে। এই সুযোগের অপব্যবহার করো না। কোন খানদান ঘরের ছেলেপুলেদের সঙ্গ পাওয়া ভাগ্যের কথা। সব সময়েই আফজালের সাথে থাকবে, তার সাথেই চলাফেরা করবে। এতে উঁচুস্তরের আদব-আখলাক ও চালচলন অনায়াসে শিখতে পারবে। আর এ কথাটা বলার জন্যেই তোমাকে আমি ডেকেছি। সুলতান তোমাকে অনুগ্রহ করেন যখন তখন তোমার দিকটা দেখা আমাদেরও একটা কর্তব্য।

আলী আশরাফ অবাক হয়ে বলখী সাহেবের মুখের দিকে তাকালো। বলখী সাহেবও বিব্রত বোধ করলেন। খানকাহ শরীফে আদবের বরখেলাপ হামেশাই যে দু'একটা ছেলে করে, আফজাল আলী তাদের মধ্যে অগ্রগামী। বলখী সাহেব এ ধরনের হামবড়ির কোন ইয্যতই কখনও দেন না। কিন্তু আফতাব খাঁ একজন মেহমান। এই খানকাহ শরীফে আজই পয়লা এসেছেন। কোন মেহমানের সাথে অপ্রিয় আচরণ করা গৃহস্বামীর অনুচিত বোধে কোন শক্ত কথা না বলে গলা ঝেড়ে বললেন, তা মানে, আর কিছু কি বলবেন?

ঃ বলার কথা ঐ একটাই। এ ছেলেটি নাকি ফৌজী শিক্ষার ব্যাপারে খুবই তৎপর।

কোনদিনই গড়হাজির থাকে না। একই তো রাস্তা। প্রতিদিন উস্তাদের কাছে যাওয়ার সময় আমার আফজাল আলীকে ডেকে নিয়ে যাবে আর সবসময়ই সাথে সাথে থাকবে, এই নির্দেশটাই একে দিতে চাই। আপনিও এ ব্যাপারে একে একটু তালিম দেবেন।

মাওলানা সাহেব বললেন, কিন্তু যতদূর আমি জানি আর শুনেছি, আফজাল আলী অস্ত্র শিক্ষার নামে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। আফজালের খোঁজে খানকাহ্য় এসে আপনার নওকরেরাই একথা আমাকে বলেছে। কাছে না পেলে আশরাফ কি করে সঙ্গ দেবে ওকে?

ঃ আশরাফকে সেজন্যেই ওর কাছে কাছে রাখতে চাই। আশরাফ সাথে থাকলে ও আর অন্যদিকে যাবে না – এইটেই আমার ধারণা। আর আশরাফের তো এতে লোকসানের কিছু নেই। আমার ছেলের সাথে ঘুরলে এর মতো একটা এতিম ছেলের ইয্যত বাড়বে বৈতো কমবে না। এছাড়া উঁচু তবকার আদব-আখলাকও মফুত শিখতে পারবে। আলী আশরাফের ভালাই-এর জন্যে আমার এত বলা।

নির্লজ্জতার এক নজীরহীন প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গা তুললেন জৌনপুরের এই জবরদস্ত্ সালার। এরা সেই কাতারের লোক যারা অন্যের কাছে উপকার নিতে চায়, অথচ সে জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, উপকার নিয়ে উপকারীকেই ধন্য করতে চায়। আফতাব খাঁ বিদেয় হলে মাওলানা সাহেব তার হতভম্ব তালেবে এলেম আলী আশরাফকে বললেন, আল্লাহ তায়ালার বিশাল এই দুনিয়ায় এমন বিচিত্র লোক এ জিন্দেগীতে অনেক দেখতে পাবে। এদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং এসব থেকে লোকচরিত্র সম্বন্ধে তালিম গ্রহণ করতে হবে।

* * *

আলী আসগারের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে প্রভুভক্ত নওকর শেখ আব্দুল্লাহ যেগুলোকে একান্ত সতর্কতার সাথে হেফাজত করে রেখেছে সেগুলোর মধ্যে পয়লা নম্বর মুনিবপুত্র আলী আশরাফ এবং তার পরেই আলী আসগারের কয়েকটি বাছাই বাছাই অশ্ব। আলী আসগার তাঁর অশ্বগুলোকে সন্তানের মতো লালন পালন করতেন। আব্দুল্লাহও অদ্যাবধি তাই করে। আলী আসগারের আমলের কিছু অশ্ব ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেলেও অনেক তাজি তাজি নতুন অশ্বের জন্ম হয়েছে আস্তাবলে। আলী আশরাফের জন্যে সেগুলোকে যত্ন সহকারে পালন করা হচ্ছে। এ কারণেই আলী আসগারের ইন্তেকালের পর অন্যান্য তামাম নওকর ছাঁটাই হয়ে গেছে। কিন্তু অশ্বশালার নওকর সহিস কোরবান আলী আজও বহাল আছে নকরীতে। অশ্ব পালন আর বাড়তি অশ্ব বিক্রয় আয় উপায়ের একটা অন্যতম উৎসও এ সংসারের।

নওকর আব্দুল্লাহকে একেবারে নওকর ভাবা ঠিক নয়। সে একজন উঁচুদরের সেপাইও । আলী আসগারের পাশে দাঁড়িয়ে অনেক বড় বড় লড়াইয়ে আব্দুল্লাহও বীরের মতো লড়েছে। শাহী সোওয়ারী, তীরন্দাজী, তলোয়ার আর নেজাবাজীতে তার দখল

দেখে আলী আসগারও অনেক সময় তাক লেগে যেতেন। শুধু ফারাগটা এই যে, শেখ আব্দুল্লাহ কোন পেশাদার সেপাই নয়। স্ত্রীপুত্রহীন একক আব্দুল্লাহ জঙ্গী জীবনকে পেশা হিসাবে নেয়নি। আলী আসগারের মহব্বতে পড়ে দূর সম্পর্কের রিস্তেদার শেখ আব্দুল্লাহ আলী আসগারের পরিবারেরই একজন হয়ে রয়ে গেছে এবং পরিবারের খেদমতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে।

আলী আশরাফকে শেখ আব্দুল্লাহ ছয় বছর বয়স থেকেই তলোয়ার, তীরধনুক আর ঘোড় সোওয়ারীতে ছবক দেয়া শুরু করেছে। উস্তাদ বুরহানউদ্দীন পদ্ধতিগতভাবে যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেন, শেখ আব্দুল্লাহ আলী আশরাফকে সে শিক্ষার সাথে আগে থেকেই পরিচিত করে দিয়েছে।

আরো কয়েক মাস পরের কথা। এই বয়সেই আলী আশরাফ একা একাই ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। সুবেহ সাদিকের পরেই সে ফৌজী শিক্ষা নিতে যায়। অতঃপর খানকাহ শরীফের পাঠ শেষে ঘরে ফিরে সে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। যতক্ষণ বেলা থাকে, ঘোড়ায় চড়ে সে রাস্তাঘাটে, বনবাদারে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ইতিপূর্বে কোরবান আলী আর শেখ আব্দুল্লাহ পালাক্রমে দুস্‌রা ঘোড়া হাঁকিয়ে আলী আশরাফের পেছনে পেছনে পাহারা দিয়ে ছুটতো। এখন আর সে প্রয়োজন হয় না। এখন আলী আশরাফ একা একাই পথ প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। পোষ মানানো ঘোড়া। যখন যেভাবে চালায়, ঠিক সেইভাবেই তখন চলে। বেয়াড়াপনা করে না। এদিক ওদিক ঘুরে মাগরিব ওয়াক্তের মধ্যেই আলী আশরাফ ঘরে ফিরে আসে। মাগরিব নামাজের পর একান্ত মনোযোগ সহকারে কিতাব খুলে বসে।

সেদিন সে বনের ধারের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছে। বস্তি এলাকার কাছাকাছি আসতেই সে দেখে ছোট্ট ছোট্ট তিনটে মেয়ে লাকরীর বোঝা মাথায় নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এলো। দু'টি মেয়ে রাস্তায় উঠে বোঝা মাথায় অনেকখানি এগিয়ে গেলো আর তৃতীয়টি সবেমাত্র রাস্তায় এসে উঠলো। রাস্তার উপর উঠতেই পা ফসকে যাওয়ায় তৃতীয় মেয়ের মাথা থেকে লাকরীর বোঝা পড়ে গেলো। বোঝাটা মাথায় উঠানোর জন্যে সে বার বার যারপরনাই কোশেশ করলো। কামিয়াব হতে না পেরে সে সাহায্যের জন্যে তার সঙ্গীদের ডাকতে লাগলো। কিন্তু সঙ্গীরা তার ইতিমধ্যেই অনেক দূরে চলে গেছে। তার আওয়াজ আর তাদের কানে পৌঁছলো না। মেয়েটি তখন নাজেহাল হয়ে ছটফট করতে লাগলো। আলী আশরাফ নিকটে এসে অবাক হয়ে গেল। এই তৃতীয় মেয়েটি লায়লা আকতার!

আলী আশরাফ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আরে! লায়লা আকতার, তুমি!

আলী আশরাফকে ঘোড়ার পিঠে দেখে লায়লা আকতার প্রথমদিকে হকচকিয়ে গেলো। পরে সে অসহায় কণ্ঠে বললো, আমার বোঝাটা আমি মাথায় তুলতে পারছি নে।

ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে আলী আশরাফ বললো, এত লাকরী! কোথা থেকে আনলে?

ঃ ঐ বন থেকে

ঃ জ্বালানির জন্যে?

ঃ না, বেচার জন্যে।

আলী আশরাফ তাজ্জব বনে গেল! বললো, বেচার জন্যে! তুমি লাকরী বেচো?

ঃ আমি বেচি না। সগীর চাচা। আমি কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দিই, সগীর চাচা বেচে দেয়।

ঃ সগীর চাচা কে?

ঃ আমাদের বস্তির বেপারী। ঐ সগীর চাচারই একটা চালাঘর ভাড়া করে তো থাকি আমরা।

ঃ কে কে থাকো তোমরা?

ঃ আমার আম্মা আর আমি।

ঃ তোমার আব্বা নেই?

ঃ না।

ঃ তাহলে কামাই করে কে?

ঃ আমার আম্মা আর আমি। আম্মাজান শাল-গজারীর পাতা দিয়ে ঠোঙ্গা বানায় আর আমি বন থেকে লাকরী কুড়াই। এই বেচেই খাই আমরা।

লায়লার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আলী আশরাফ কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, তুমি হররোজ লাকরী কুড়াও?

ঃ হররোজ নয়। মাঝে মাঝে দুই একদিন বাদ যায়।

ঃ তার মানে প্রায় রোজ?

ঃ হ্যাঁ। যেদিন খানকাহ্ শরীফের ছুটি থাকে সেদিন সকাল বেলা কুড়াই, আর ছুটি না থাকলে বিকেল বেলা।

ঃ তুমি এত তকলীফ্ করো?

ঃ আমরা গরীব যে! তক্লীফ্ না করলে আমরা খানা পাবো কোথায়?

ঃ এত মেহনত করেও তুমি খানকাহ শরীফে পড়তে যাও?

ঃ আমি তো যেতে চাইনে। কিন্তু না গেলে যে আম্মা আমাকে মারে আর বকে!

বেলা ডুবু ডুবু প্রায়। তা লক্ষ্য করে লায়লা আকতার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো, বোঝাটা একটু ধরে আমার মাথায় তুলে দেবে?

আলী আশরাফ তখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। লায়লা আকতার দ্বিতীয়বার ঐ একই অনুরোধ করতেই সে সচকিত হয়ে বললো, এ্যাঁ! বোঝা? ও হ্যাঁ, তোমার মকান এখান

থেকে কত দূর?

ঃ দূরে নয়। নয্‌দিক্‌ তো। ঐ তো ঐ বস্তিতে। রাস্তার ধারে একটা মকান পরেই আমাদের মকান।

ঃ নাও, এই লাগাম ধরে তুমি আগে আগে হাঁটো, আমি বোঝা নিয়ে সাথে সাথে আসছি।

আলী আশরাফ লায়লার দিকে ঘোড়ার লাগাম বাড়িয়ে ধরলো। ভয় পেয়ে লায়লা আকতার কয়েক ধাপ সরে গেলো। বললো, ওরে বাবা! কামড়াবে যে!

আলী আশরাফ হেসে বললো, কামড়াবে না। পোষা ঘোড়া। তুমি লাগাম ধরে আগে হাঁটলেই ও তোমার পেছনে পেছনে হাঁটবে। বোঝাটা আমি নিচ্ছি।

ঃ তুমি বোঝা নিয়ে যাবে?

ঃ তাতে কি? ধরো লাগাম!

ভয়ে লায়লা আকতার ইতস্ততঃ করতে লাগলো। আলী আশরাফ ধমক দিয়ে বললো, কি বুয্‌দীল মেয়েরে! ভয় পাও তো একা একা লাকরী কুড়াতে আসো কেন? ধরো লাগাম।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লায়লা আকতার লাগামটা হাতে নিলো। আলী আশরাফ হুকুম করলো, এবার আগে আগে যেতে থাকো।

বলেই সে ঘোড়ার গায়ে একটা থাবা মেরে বললো, চল্‌। থাবা খেয়ে ঘোড়াটি অবলীলাক্রমে সামনের দিকে এগুতে লাগলো। ভয়ে ভয়ে লায়লা আকতার যতখানি দূরে থাকা সম্ভব, ততখানি দূরে থেকে লাগাম হাতে যেতে লাগলো। বোঝা নিয়ে আলী আশরাফ লায়লা আকতারের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

খানিক পথ চলার পর লায়লা আকতারের সাহস কিছুটা বেড়ে গেলো। সে আলী আশরাফকে প্রশ্ন করলো, তুমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াও, ঘোড়া তোমায় কামড়ায় না?

আলী আশরাফ বললো, দূর পাগলি! ঘোড়ায় চড়া শিখলে পোষা ঘোড়া কামড়ায় না। যেদিকে যেতে বলবে, ঠিক সেই দিকেই যাবে। ঘোড়ায় চড়তে না জানলে ঘোড়া তা বুঝতে পারে। আর তখনই ছটফট করে। তুমি ঘোড়ায় চড়া শিখবে?

ঃ আমি? ছিঃ! আমি যে মেয়েছেলে!

ঃ মেয়েছেলে হয়েছো তো কি হয়েছে? কত মেয়েছেলে ঘোড়ায় চড়া শেখে আর ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়ায়!

ঃ তারা বেশরম।

ঃ না, তারা বাহাদুর। দুশমনের মোকাবেলা করার জন্যে ছেলেমেয়ে সকলেরই ঘোড়ায় চড়তে জানার আর ফৌজী শিক্ষা থাকা দরকার।

ঃ মেয়েছেলে ফৌজী শিক্ষা নিয়ে কি করবে? ময়দানে গিয়ে লড়াই করবে?

ঃ দুর্দিন এলে তাতো করতেই হয়। যে মুলুকের ছেলেমেয়েরা সবাই লড়তে জানে, তাদের গায়ে হাত দিতে কোন দুশমনই সাহস পায় না।

লায়লা আকতার বিস্মিতভাবে আশরাফের দিকে তাকালো এবং বললো, তুমি আমাদের উস্তাদের মতো কথা বলছো। আমাদের উস্তাদও তাই কয়।

ঃ ঠিকই কয়।

ঃ বাব্বা! ওসব শুনলেই আমার ভয় লাগে!

বোলচালের মধ্যে একটু পরেই তারা বস্তিতে পৌঁছে গেলো। বাড়ির পাশে এসেই লায়লা আকতার লাগামটা ছেড়ে দিয়ে বললো, ঐ যে, ঐটা আমাদের মকান।

আলী আশরাফ দেখলো, একটা বাড়ীর পরেই ছোট্ট এক গলির উপর একটা ধুবড়ে পড়া চালাঘর। ঘরখানার সামনের আঙ্গিনাটা পোড়া মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেউটির সামনে চটের একটা পর্দা আঙ্গিনাটার আব্রু রক্ষে করছে। আলী আশরাফ বললো, আরে, তোমাদের মকান তো খুব নিকটেই!

ঃ হ্যাঁ, ঐ তো। আমি তাহলে যাই।

লাকরীর বোঝা লায়লা আকতারের মাথায় দিয়ে আলী আশরাফ বললো, যাও।

বোঝা মাথায় লায়লা আকতার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার মকান কোথায়?

ঃ ঐ যে, ঐ বড় রাস্তার ধারে। একদিন যাবে আমাদের মকানে?

ঃ না। আম্মা তাহলে বকবে।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে যাও।

লায়লা আকতার পা বাড়ালো। আলী আশরাফ ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়ার মুখ বাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে দিলো।

* * *

উস্তাদ বুরহানউদ্দীন খান সাহেবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা নিতে যাওয়ার পথেই সালার আফতাব খাঁর মকান। ঠিক মকান নয়, একটা ছোটখাটো প্রাসাদ। একদম রাস্তার উপর সদর ফটক। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলী আশরাফ আফজালকে ডেকে নেয়ার চেষ্টা কয়েকবার করেছে। কিন্তু প্রতিবারেই সে বিফল মনোরথ হয়েছে। সকালে এলে হয় দেখেছে বাড়ীর কেউ তখন পর্যন্ত উঠেনি, সদর ফটক বন্ধ, নয় শুনেছে– আফজাল আলী গভীর ঘুমে বেহুঁশ, তাকে জাগিয়ে দেয়ার এক্তিয়ার কারো নেই। বিকেলে এসেও ফায়দা হয়নি। নওকরের মুখে শুনেছে, আফজাল আলী বাইরে গেছে। কোথায়– কেউ তা জানে না। ফটক থেকেই ফিরে গেছে আলী আশরাফ। ভেতরে যাওয়ার জরুরতই পড়েনি। বার কয়েক বেহুদা চেষ্টা করার পর আলী আশরাফ হাল ছেড়ে দিয়েছে। খামাকা হয়রান হওয়ার খায়েশ তার আর হয়নি।

বহুতদিন বাদ এক বিকেলে সদর ফটক খোলা দেখে আলী আশরাফ আর এক দফা

আফজাল আলীকে তালাশ করতে এলো। আশে পাশে কাউকে কোথাও না দেখে সে ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এককদম দুইকদম করে আঙ্গিনাটা পার হয়ে এক প্রশস্ত দহলীজের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজা জানালা খোলা এক বিশাল হলঘর। হলঘরও জনশূন্য। অন্দর মহলে অনেক লোকের হাস্যোচ্ছ্বাস শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এদিকে কারো পাত্তা নেই। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবলো। অতঃপর ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই একটা বছর নয়েক বয়সের নাদুসনুদুস মেয়ে দহলীজে ছুটে এসে কি যেন তালাশ করতে লাগলো! সামনের দিকে চাইতেই সে আলী আশরাফকে দেখতে পেলো। দেখামাত্র, কে? কে ওখানে? বলে সে বারান্দায় ছুটে এলো। এসেই সে সওয়াল করলো, কে তুমি? এখানে কেন?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, আফজাল আলী বাড়ী আছে কি?

মেয়েটি রুষ্ট কণ্ঠে বললো, আছে। খুব ব্যস্ত আছে। কেন?

ঃ সেকি আজ উস্তাদের কাছে ফৌজী শিক্ষায় ছবক নিতে যাবে?

ঃ ফৌজী শিক্ষার সবক! কেন, ভাইয়া ওসব ফালতু কাজে যাবে কেন?

ঃ ফালতু কাজ?

ঃ বিলকুল ফালতু কাজ।

মেয়েটির ঠোঁট দু'টি উল্টে গেলো। আলী আশরাফ তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগলো, একটা সালারের ছেলের জন্যে ফৌজী শিক্ষা ফালতু কাজ হলে উমদা কাজ কোন্‌টা! মেয়েটির উক্তি শুনে আলী আশরাফ আগ্রহী হয়ে উঠলো। বললো, এটাকে ফালতু কাজ বলছো কেন? আমি তো বুঝলাম না। তুমি একটু বুঝিয়ে দিতে পারো?

এ কথায় মেয়েটা আর একটু সামনে এসে বললো, ফালতু নয়তো কি? যারা সেপাই হবে, তারাই ওসব তকলিফের কাজ করবে। ভাইয়া তো আর সেপাই হতে যাচ্ছে না!

ঃ তাই নাকি! ও তাহলে কি হবে?

ঃ সালারের বেটা সালার হবে। সেপাই হবে কোন্ দুঃখে?

ঃ লড়াই করতে না জানলে সালার হবে কি করে?

মেয়েটির চোখে মুখে অপরিসীম বিরক্তি ফুটে উঠলো। সে রুষ্ট কণ্ঠে বললো, আরে! এ কোন্ বুদ্দুরে! সালারের কাজ হুকুম দেয়া। ময়দানে নেমে হাতিয়ার হাতে লড়াই করা নয়। হাতিয়ার হাতে লড়াই করবে ছোটজাতের মানুষেরা। ঐ সব ছোটলোকের কাজ ভাইয়া করতে যাবে কেন?

মেয়েটা যে আফতাব খাঁর আলী আশরাফের এতে কোন সন্দেহই রইলো না। কিন্তু ভেবে সে হয়রান হতে লাগলো একটা সালার কন্যার লড়াই সম্পর্কে ধারণা দেখে। অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে থেকে আলী আশরাফ বললো, এসব কথা কে বলেছে তোমাকে?

ঃ ভাইয়াই আমাকে বলেছে। আর তা ছাড়া বলতে হবে কেন? আমার আব্বাই তো সালার। আব্বাতো শুধু হাতি ঘোড়ায় চড়ে দূরে থেকে হুকুম দেয়। সিপাইরা হাতিয়ার হাতে এগিয়ে গিয়ে মাথা কাটাকাটি করে। আব্বাকে ওসব করতে হয়? যত্তো সব!

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু আলী আশরাফ নাছোড়বান্দা। সে এক নতুন দুনিয়া দেখছে। একটা প্রকাণ্ড ইমারতের নীচে এক নম্বরের জায়গায় নম্বরহীন ইটের বিপুল সমারোহ দেখে সে তাজ্জব হয়ে গেছে! এর গভীরে কি না কি আরো আচানক বস্তু থাকতে পারে ভেবে সে জিদ্ ধরে বললো, এই যে, এই, শোনো শোনো, তোমার আব্বাও কি এসব কথা বলেন?

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, জানি না।

ঃ তাহলে আফজাল আলী কোন কোনদিন উস্তাদের কাছে লড়াই শিখতে যায় কেন?

ঃ আব্বা ছাড়ে না যে!

ঃ কেন?

ঃ কেন আবার। খানকাহ থেকে এসে ভাইয়া যে সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়! বস্তির বাচ্চাদের সাথে মেশে। সেইজন্যেই তো আব্বা উস্তাদের কাছে লড়াই শিখতে পাঠিয়ে ভাইয়াকে জব্দ করতে চায়। কিন্তু আব্বা জানেই না যে, ভাইয়া কোন অদ্না আদমীর এলাকাতেও যায় না।

ঃ তাকে শুধু জব্দ করার জন্যেই লড়াই শিখতে পাঠায়?

ঃ সেরেফ জব্দ করার জন্যে!

ঃ এসব কথা তোমার ভাইয়া কি তোমাকে বলেছে?

ঃ হ্যাঁ। ভাইয়াই আমাকে বলেছে। ভাইয়া তো আর বেয়াকুফ নয়, সব্বার সব চালাকি বোঝে।

ঃ ও, আচ্ছা।

এই আহম্মক মেয়েটার সাথে অধিক বাৎচিৎ সেরেফ বাতুলতা মনে করে আলী আশরাফ ঘুরে দাঁড়াতেই আফজাল এসে দহলীজে ঢুকলো। সামনের দিকে চেয়েই সে আওয়াজ দিলো, আরে আলী আশরাফ নাকি? তুমি কখন এলে?

আলী আশরাফ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো, আফজাল এসে বোনের পাশে দাঁড়িয়েছে। জওয়াবে সে বললো, অনেকক্ষণ। বাইরে কাউকে না দেখে ফিরেই যাচ্ছিলাম। এর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি ব্যস্ত আছো?

আলী আশরাফ মেয়েটির প্রতি ইঙ্গিত করলো। আফজাল আলী হেসে বললো, এ আমার ছোট বহিন। এর নাম আকলিমা বেগম।

ঃ আচ্ছা! তা খুবই ব্যস্ত আছো?

ঃ না, এমন আর ব্যস্ত কি! ছোট একটা অনুষ্ঠান আছে অন্দর মহলে। তাই নিয়ে

সবাই ব্যস্ত। আমার আর ব্যস্ততা কি?

আফজালের বোন আকলিমা ভাইকে সওয়াল করলো, এ কে ভাইয়া?

আফজাল আলী বললো, এর নাম আলী আশরাফ। আমাদের দোস্ত। আমরা এক সাথে পড়ি।

ঃ এ উস্তাদের কাছে লড়াই শিখতে যায়?

ঃ হররোজ যায়।

ঃ এর আব্বা বুঝি সেপাই?

ঃ হ্যাঁ, নাম করা সেপাই। লড়তে গিয়ে মারা গেছেন।

ঃ মারা গেছে? তাহলে আম্মার সাথে থাকে?

ঃ আম্মাও নেই। উনিও ইন্তেকাল করেছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে আকলিমা বেগম বললো, এ্যাঁ! এ তাহলে এতিম?

ঃ একদম এতিম!

ঃ তুমি এতিমের সাথে পড়ো?

আফজাল আলী নির্দ্বিধায় খেদ প্রকাশ করলো। বললো, না পড়ে উপায় কি? খানকাহ শরীফের উস্তাদেরা যে এতিমদেরও খানদানের সমান ইয্যত দেয়। জুদা করে পড়ায় না।

ঃ খানকাহ শরীফের সব এতিমই তোমার সাথে দোস্তি করতে আসে?

ঃ না, কেউ তা আসে না।

ঃ ও তাহলে এসেছে কেন?

ঃ ও হামেশাই আমার খবর নেয়। আব্বাও আমাকে ওর সাথে সাথে থাকার জন্যে বলেন।

ঃ কেন?

ঃ জানি না। তবে আব্বা বলেছেন, ও পড়াশুনায় খুব ভাল। ওর সাথে দোস্তি করলে দোষ নেই। সুলতানে আলারও নাকি ওর উপর মেহেরবানী আছে।

ঃ তা থাকগে। কত খানদান ঘরের ছেলে আছে! দোস্তি করলে তাদের সাথে করো। এতিমের সাথে দোস্তি করা দেখলে শাহিনেরা, বুলবুলেরা, তাহমিনারা বলবে কি? আমাদের ছোটলোক ভাববে না?

ঃ তা বোধ হয় ভাববে না। এতিম হলেও আলী আশরাফ গরীব নয়। তালেবে এলেম হিসাবেও ওর খুব নাম আছে। শুধু খানদানী আখলাকটাই ও শেখেনি। আলতু ফালতু সব কেসিমের ছেলেমেয়েদের সাথে মেশে। খানদানী আখলাকটা শিখলেই ও পুরোদস্তুর খানদান বনে যাবে। কেউ অদ্না বলতে পারবে না।

ঃ ও, তাই বলো। ঐ খানদানী আখলাকটা শেখার লালচেই ও তোমার

পেছনে ঘুরছে?

'বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া' এ উক্তির সাথে আলী আশরাফের পরিচয় ছিলো। বাপকা বেটি বলেও যে একটা কথা হতে পারে, আলী আশরাফের দীলে আজ এ খেয়ালটার পয়দা হলো। মেহমানকে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে রেখে তারই সামনে এমন ন্যক্কারজনক আলোচনা এরা করতে পারে দেখে এদের আদব-আখলাক সম্বন্ধে তার অন্তরে গভীর ঘৃণার উদ্রেক হলো। এদের বাপকে সে জানতো। ছেলেমেয়েদের মনোবৃত্তিও যে ঐ একই পর্যায়ের হবে, কোন উনিশ-বিশ হবে না, এটা তার কল্পনাতীত ছিলো। আর এক লহমা না দাঁড়িয়ে আলী আশরাফ সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে ধারালো কণ্ঠে বললো, লালচ কিছু থেকে থাকলে সেটা আছে তোমাদের আব্বার। খানদানীর নামে এই ধরনের ইতরামি শেখার তিল পরিমাণ ইশ্‌ক্‌ আলী আশরাফের নেই।

আফজাল আলীর মামুলী পিছু ডাক উপেক্ষা করে আলী আশরাফ তৎক্ষণাৎ ফটকের বাইরে বেরিয়ে গেলো।

* * *

লায়লা আকতারের সাথে আলী আশরাফের আরো কয়দিন ঐ একইভাবে দেখা হলো। কোনদিন সে অমনি করে লায়লা আকতারের লারকীর বোঝা এগিয়ে দিলো, কোনদিন বা লায়লা আকতার তার মদদ ছাড়াই একা একা বোঝা নিয়ে চলে গেলো। প্রতিদিন মকানে ফিরে আলী আশরাফ আব্দুল্লাহকে এ কাহিনী শোনাতো এবং লায়লার এই তকলিফের অবসান ঘটনোর এক দুর্বার ইচ্ছে প্রকাশ করতো।

আলী আশরাফের চাপে পড়ে শেখ আব্দুল্লাহ একদিন আলী আশরাফকে নিয়ে লায়লা আকতারের মকানে এসে হাজির হলো। দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আলী আশরাফ আওয়াজ দিলো, লায়লা আকতার আছো?

লায়লা আকতারের আম্মা লতিফা খাতুন আঙ্গিনাতেই ছিলেন। কণ্ঠস্বরটা একটা বালকের বুঝে তিনি দেউড়ির পর্দা তুলে বাইরে এসে বললেন, কে?

আলী আশরাফের সাথে আব্দুল্লাহকে দণ্ডায়মান দেখে তিনি চমকে উঠে বিদ্যুৎবেগে ভেতরে প্রবেশ করে দেউড়ির আড়ালে দাঁড়ালেন। ওখান থেকেই বললেন, কে তুমি বাবা? লাযলা আকতারকে তালাশ করছো কেন?

তাঁর উদ্দেশে আলী আশরাফ সালাম দিয়ে বললো, আপনিই কি লায়লা আকতারের আম্মা?

সালামের জবাব দিয়ে লতিফা খাতুন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমিই তার আম্মা। তুমি কে?

জওয়াব দিতে এবার আলী আশরাফের দেরী হলো। লতিফা খাতুনকে দেখে তারা

তখন তাজ্জব বনে গেছে! তাদের ধারণা ছিলো লায়লা আকতারের আম্মা একটা মামুলী আউরাত হবেন। বস্তির আর পাঁচটা আউরাত যেমন হয়। কিন্তু তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো– লায়লা আকতারের আম্মা বিলকুল একজন আলাদা মানুষ। যেমন তাঁর মুখের গঠন, তেমনই তাঁর গায়ের রং। পরনে তাঁর ছেঁড়া লেবাস হলেও, অভাব-অনটনে তাঁর সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে গেলেও, তাঁকে বস্তির একজন সাধারণ আউরাত বলে মনেই হলো না তাদের।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আলী আশরাফ একটু দেরীতে জওয়াব দিলো, আমার নাম আলী আশরাফ। আপনাদের এই বস্তির ওপারে ঐ বড় রাস্তার ধারে আমার মকান। লায়লা আকতার যে খানকাহ শরীফে পড়ে, আমিও সেই খানকাহ শরীফেই পড়ি।

লতিফা খাতুন বললেন, ও আচ্ছা। বেঁচে থাকো বাবা। তা তোমার সাথে উনি কে?

ঃ আমার চাচা। এঁর নাম শেখ আব্দুল্লাহ।

ঃ তা বাবা, আমি নিতান্তই গরীব মানুষ। আমার কোন বসার জায়গা নেই। সামনের ঐ সগীর ভাইয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে তোমরা মেহেরবানী করে বসো। লায়লা আকতার বাইরে গেছে। এক্ষুণি আসবে। এলেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঃ আমার চাচা আপনার সাথেই একটু কথা বলতে চান।

লতিফা খাতুন ইতস্ততঃ করে বললেন, আমার সাথেই কথা বলবেন? কি কথা?

আব্দুল্লাহ তার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললো, বহিন, আমার সাথে তো আপনার কোন পরিচয় নেই, আমিও আপনাদের চিনতাম না, এই আলী আশরাফের মুখে সব শুনেই যা চিনলাম। আলী আশরাফ আপনার বেটি লায়লা আকতারকে খুব ভালো করে চেনে। তারা প্রায়দিনই ঐ রাস্তা দিয়ে এক সাথে খানকাহ শরীফে পড়তে যায়। ওদের মধ্যে খুব মিল। আলী আশরাফের কাছে আপনাদের খবর পেয়ে একটা কথা বলতে এলাম।

ঃ কি কথা, বলুন।

ঃ আমাদের বিষয় বিত্ত সবই আলী আশরাফের। আলী আশরাফের আব্বা একজন নামকরা সালার ছিলেন। বছর কয়েক আগে লড়াইয়ের ময়দানে উনি শাহাদতবরণ করেছেন। আলী আশরাফের আম্মাও জীবিত নেই। আমি ও বাড়ীর পুরানো নওকর। এতিম আলী আশরাফের বিষয় সম্পত্তি পাহারা দিয়ে আছি মাত্র। তাই কথাটা ঠিক আমার নয়, আলী আশরাফেরই কথা।

ঃ আচ্ছা। সেই কথাটা কি তাই আগে বলুন

ঃ আলী আশরাফ লায়লা আকতারকে প্রায়দিনই বন-জঙ্গলে লাকরী কুড়াতে দেখে। ঐ মাসুম বাচ্চাকে এত মেহনত করতে হয় দেখে আলী আশরাফ আমার কাছে হররোজ আফসোস্ করে। তার এই তকলিফের আলী আশরাফ একটা ফয়সালা করতে চায়।

দেয়ালের ওপার থেকে লতিফা খাতুন বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, খোদ আল্লাহ তায়ালাই যার নসীবে তকলিফ লিখে রেখেছেন, ইনসান তার কি ফয়সালা করতে পারে, বলুন?

শেখ আব্দুল্লাহ বললো, আলী আশরাফের ইচ্ছা, লায়লা আকতার একদীলে পড়াশুনা করুক। তাকে আর যাতে করে লাকরী টানতে না হয় সে ব্যবস্থা আলী আশরাফই করবে।

লতিফা খাতুন গম্ভীর কণ্ঠে সওয়াল করলেন, ব্যবস্থা করবে মানে?

ঃ মানে, আল্লাহর রহমে আলী আশরাফের বিষয়বিত্ত ভালই আছে। তা থেকে সে লায়লা আকতারের জন্যে কিছু খরচ করার এযাযত চায়।

ঃ আর একটু খোলাসা করে বলুন।

ঃ খোলাসা মানে, আলী আশরাফ সেজন্যে আপনাদের কিছু অর্থ সাহায্য দিতে চায়। আপনি যদি মেহেরবানী করে তা গ্রহণ করেন, আমরা সবাই খুব খুশী হবো।

ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে লতিফা খাতুন বললেন, ভাই সাহেব, আমাদের তকলিফ দেখে আপনাদের দীলে যে রহম পয়দা হয়েছে, সেজন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনাদেরকেও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি আফসোসের সাথে জানাচ্ছি, আপনাদের এই মেহেরবানী কবুল করতে আমি বিলকুল অপারক। কারো কাছে হাত পাতার অভ্যাস আমার নেই।

শেখ আব্দুল্লাহ তড়িঘড়ি বললো, হাত পাতবেন কেন? আমরা তো ইচ্ছে করেই–

ঃ তা হোক। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছাড়া অন্যের কাছে অর্থ সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকার জিন্দেগী আমার খুবই না পছন্দ, বরং দোয়া করুন, যেন মেহনত করেই আমরা দিন গুজরান করতে পারি।

ঃ তা– মানে–

ঃ এইটেই আমার সাফ কথা ভাই সাহেব। এ নিয়ে আর দুসরা কোন কথা নেই। আপনারা মেহমান। মেহেরবানী করে সামনের ঐ সগীর ভাইয়ের বৈঠকখানায় বসুন। আমি নিতান্তই গরীব মানুষ! আমাকে আমার সাধ্যমতো মেহমানদারী করার মওকা দিন।

আর কিছু করার নেই দেখে শেখ আব্দুল্লাহ সবিনয়ে বললো, বহিন, আমরা খুবই ব্যস্ত আছি বলে আপনার এ দাওয়াত আজ আমরা কবুল করতে পারছি নে। আবার যদি আসি কোনদিন, সেদিন অবশ্যই আপনার দাওয়াত কবুল করে যাবো। আজ আমাদের বিদেয় হওয়ার এযাযত দিন।

ঃ আমার কথায় কি নাখোশ হলেন আপনারা?

শেখ আব্দুল্লাহ উৎসাহের সাথে বললো, নাখোশ হবো মানে? আপনার দীলের যে পাক পরিচয় পেলাম, তাতে গর্বে আমার বুকখানা দশ হাত ফুলে গেছে। এমন স্বনির্ভর মানুষে সারা জাহান ভরে যাক আল্লাহর কাছে এই আরজই করি।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ আপনাকে কিছু দিতে না পেরে আমরা যে পরিমাণ হতাশ হয়েছি, আপনার প্রতি তার চেয়ে দশগুণ অধিক শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমরা আসি বহিন?

ঃ আসুন।

লতিফা খাতুনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। আলী আশরাফকে সঙ্গে নিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ ধীরে ধীরে ওয়াপস্ চলে গেলো।

পরের দিন আলী আশরাফ লায়লা আকতারকে বনের ধারে দেখলো না। তারপরের দিনও না। তৃতীয় দিন আলী আশরাফ খানকাহ শরীফে গিয়ে লায়লা আকতারকে সওয়াল করলো, কি ব্যাপার! আর তুমি লাকরী কুড়াতে যাও না?

লায়লা আকতার দুঃখিত কণ্ঠে বললো, যাই। বনের ঐ দিকটাই যাই।

ঃ ওদিকটায় যাও কেন?

ঃ এদিকটায় আর আম্মা যেতে দেয় না।

ঃ কেন?

ঃ এদিকটায় গেলে তোমার সাথে দেখা হয় যে! আম্মা তোমার সাথে দেখা করতে নিষেধ করেছেন।

আলী আশরাফ আকাশ থেকে পড়লো। লায়লা আকতারের আম্মা তার উপর হঠাৎ গোস্বা হলেন কি কারণে, সে তার হদিস করতে পারলো না। তাই সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, নিষেধ করেছেন মানে? উনি নিষেধ করলেন কেন?

ঃ আমি জানি না। আম্মা কয়- আমরা কাঙাল মানুষ! কোন দৌলতমান্দ্ মানুষের সাথে কাঙাল মানুষের মেলামেশা ভালো নয়।

ঃ আমি দৌলতমান্দ্ মানুষ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কে বলেছে?

ঃ আম্মা। তোমার আব্বা নাকি মস্ত বড় লোক ছিলেন। তোমার নাকি এই এত্তো পরিমাণ দৌলত আছে!

লায়লা আকতার দুই হাত মেলে ধরে দেখালো। তার ভাব দেখে আলী আশরাফের বিস্ময়ের মধ্যেও হাসি পেলো। একটু নীরব থেকে সে আবার প্রশ্ন করলো, আমার সাথে কথা বলতেও কি তোমার আম্মা নিষেধ করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কি বলেছেন?

ঃ তোমার সাথে বেশী কথা বলা হবে না, বেশী মেলামেশা হবে না– এই।

আলী আশরাফ খামোশ হয়ে গেলো। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, ও আচ্ছা। তুমি যাও!

ঘরে ফিরে আলী আশরাফ আব্দুল্লাহকে সব কথা খুলে বললো। শুনে আব্দুল্লাহও কিছুক্ষণ খামোশ হয়ে রইলো। পরে উদাস কণ্ঠে বললো, আমাদের সংশ্রবই যখন

না-পছন্দ তাদের, তখন খামাকা আর ওদের কথা ভাবতে যাওয়া অর্থহীন। আল্লাহ ওদের সুখে রাখুন, এই দোয়া করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।

আলী আশরাফও ভেবে দেখলো, আব্দুল্লাহর কথাই ঠিক। তারাই যখন এড়িয়ে যেতে চায় তাকে, তখন তার আর গরজ কি তাদের কথা ভাবার। কাঙালের উপকার করার ইরাদা করলে দেশে তো কাঙালের অভাব নেই। সে কয়জনেরই বা কি উপকার করতে পারে!

এ প্রসঙ্গ হয়তো চাপাই পড়তো এইভাবে। কোনদিন আর এ নিয়ে হয়তো কোন কথাই উঠতো না। কিন্তু কয়দিন পরই হঠাৎ এর আবার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কয়দিন পরই সগীর বেপারী খুঁজতে খুঁজতে হাজির হলো আলী আশরাফের মকানে। রাস্তার উপরই বাড়ী। আব্দুল্লাহর সাথে আলী আশরাফ দহলিজেই ছিলো। সগীর বেপারী রাস্তা থেকে হাঁক দিলো, এটা কি আলী আশরাফের মকান? মানে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন যে সালার, তার ফরযন্দের মকান?

দহলিজের বাইরে এসে শেখ আব্দুল্লাহ বললো, জি হাঁ, তারই মকান। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

রাস্তা থেকে বাড়ীর উপর আসতে আসতে সগীর বেপারী বললো, আমি ঐ বস্তি থেকে আসছি। কয়দিন আগে আলী আশরাফের সাথে এই মকানের কে একজন লায়লা আকতারদের মকানে তশরীফ এনেছিলেন। কে তিনি বলতে পারেন?

শেখ আব্দুল্লাহ সোচ্চার কণ্ঠে বললো, আমি, আমিই গিয়েছিলাম।

ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

ঃ ওয়ালাইকুমুস্ সালাম। আপনি?

ঃ আমার নাম সগীর খাঁ। সবাই বলে সগীর বেপারী। লায়লা আকতার আর তার আম্মা আমার মকানের এক অংশেই থাকে।

ঃ তাই নাকি? আপনিই সেই লোক? আসুন, আসুন!

একহারা লম্বা সগীর খাঁ। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মজবুত দেহ আর মুখভরা সফেদ শ্মশ্রু। সগীর খাঁ দহলিজের দরজায় এসে পৌঁছলে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ আগে মোসাফেহা করলো। তারপর সগীর খাঁকে ভেতরে একটা কুরসীর কাছে এনে বললো, তশরীফ রাখুন।

সগীর খাঁ বসার উদ্যোগ করতেই আলী আশরাফ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো। সালাম নিয়ে সগীর খাঁ বললো, তুমিই কি–

তাজিমের সাথে আলী আশরাফ বললো, জি হাঁ। আমারই নাম আলী আশরাফ।

খোশ দীলে সগীর খাঁ বললো, মারহাবা মারহাবা! বসো বাবা।

সকলেই আসন গ্রহণ করার পর শেখ আব্দুল্লাহ বললো, এবার বলুন জনাব, কি খেদমত করতে পারি আমরা?

সগীর খাঁ বিনয়ের সাথে বললো, আপনারা আমাকে শরমিন্দা করবেন না। লায়লা আকতারের আম্মা লতিফা খাতুনের আচরণের জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

শেখ আব্দুল্লাহ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, মানে!

ঃ আঘাতের পর আঘাত পেয়ে লতিফার জিন্দেগীটা বরবাদ হয়ে গেছে। দিমাক তার ঠিক নেই। আজকেই সবেরে সব শুনলাম। আপনাদের মেহেরবানীর সেতো অবমাননা করেছেই, তার উপর আবার আলী আশরাফের সাথে লায়লা আকতারের মেলামেশা না-মঞ্জুর করে সে আর একটা অমার্জনীয় গোস্তাকি করে ফেলেছে। ভ্রান্ত এক জিদের উপর তার নিজের তো বটেই, সেই সাথে ঐ মাসুম বাচ্চাটার আখেরাত মেস্‌মার করার কি এক্তিয়ার আছে তার, বলুন?

ঃ তার মানে–

ঃ এক ক্ষমতাসীন বিত্তবান ইনসানের বেইনসাফীর সে বদলা নিতে চায়। কিন্তু সেজন্যে সে যে রাহা বেছে নিয়েছে তা তার আত্মহত্যারই সামিল। সে বেঁচে থাকতে চায়, মেয়েটাকে সেই বদলা নেয়ার হাতিয়াররূপে তৈরি করতে চায়, অথচ দুনিয়ার তামাম দৌলতমান্দ ইনসান থেকে নিজেকে জুদা করে রেখে মানবেতর জীবন যাপন করতে চায়। তার এই স্ববিরোধী খেয়ালকে মঞ্জুর করা যায় না। বেইনসাফীর বেদনায় আত্মহত্যা করা এক কথা আর বেইনসাফীর বিরুদ্ধে জেহাদ করা আর এক কথা। জেহাদের বেলায় অন্যের সহায়তা জরুর। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে সেই সহায়তা যখন আচানকভাবে দ্বারপ্রান্তে হাজির, তখন সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা যে কত বড় আহম্মকি, এটা কেউ না বুঝলে তার আখেরাত বলে আর থাকে কি?

আবেগে আর আফসোসে সগীর খাঁ কাঁপতে লাগলো। আলী আশরাফ আর আব্দুল্লাহ একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে দম বন্ধ করে সগীর খাঁর কথাগুলো শুনতে লাগলো। সগীর খাঁ থামলে শেখ আব্দুল্লাহ নড়ে চড়ে বললো, কিছুটা আঁচ করতে পারলেও আপনার বক্তব্য থেকে সঠিক কিছু উদ্ধার করতে পারছি নে। আর একটু খোরাসা করে বলুন।

একই রকম আবেগের সাথে সগীর খাঁ বললো, যে দরজ দীলের পরিচয় আপনারা দিয়েছিলেন, সেটাকে বহাল রাখার জন্যে আমি আর্জি পেশ করছি। ঐ হতভাগ্য মেয়েটাকে মানুষ করার দায়িত্ব আপনারা নিন এই আমার আরজ। আমি নিজেও একজন নেহাতই কাঙাল মানুষ। তা না হলে এ দায়িত্ব নিজেই আমি নিতাম। আল্লাহপাক আপনাদের অনেকই দিয়েছেন। তা থেকে সামান্য কিছু ব্যয় করলে একা দীনহীন এতিম অন্ধকারের ভয়াবহ আবর্ত থেকে নাজাত পেতে পারে।

আলী আশরাফ এতক্ষণে মুখ খুললো। বললো, লায়লা আকতারের আম্মা কি তা কবুল করবেন?

সগীর খাঁ বললো, আমার সাথে কথা বলার পরই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। আর

তা বুঝতে পারার পর থেকেই সে নিদারুণভাবে আফসোস্ করছে।

আলী আশরাফ পুনরায় প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, লায়লা আকতারের আব্বা কি ইন্তেকাল করেছেন?

ঃ না, তিনি জীবিতই আছেন।

ঃ জীবিত! কোথায় থাকেন?

ঃ বাংলা মুলুকে। আকতারেরা বাংলা মুলুকের লোক।

ঃ তাই নাকি? তা লায়লা আকতারের আব্বা বাংলা মুলুকে, আর এরা জৌনপুরে কেন?

ঃ সে এক দস্তানে দিক্‌দারী। অনেক কথা।

শেখ আব্দুল্লাহ উৎসাহিত হয়ে বললো, সেটা শুনতে পারি কি?

ঃ অবশ্যই।

সগীর খাঁ যে কাহিনী বিধৃত করলো, তা শুধু করুণই নয়, আশরাফ-উল-মুখলুকাতের নির্মম বিবেকহীনতার তা এক জ্বলন্ত সনদ ঃ

মুসলমানদের হুকুমাতকে ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে যে কয়টি পদার্থ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে আউরাত, শরাব আর অর্থই প্রধান। ক্ষমতার লালচ আর পদের লিপ্সা এই বিচ্যুতিরই স্বভাবধর্মী প্রজনন। শরাব আর আউরাত সর্ব প্রথম ঢুকছে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের হারেমে।

সেখান থেকেই ঘটেছে এর বিস্তার আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে হারামী আর গাদ্দারীর ভানুমতি খেল। বাংলার ইলিয়াসশাহী সাল্‌তানাতের আউয়াল ওয়াক্তের সংযম সময়োত্তীর্ণের সাথে সাথে ঢিলা হতে থাকে। প্রশাসনিক সতর্কতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা উদারতার মদিরায় নাজুক হয়ে পড়ে। মামুলী বাহবা আর মোসাহেবী তারিফের পিয়াস সুলতানদের দীলে ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠে। ইলিয়াসশাহী হুকুমাতের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার শাহর আমলে উমরাহদের দীল থেকে রাজদণ্ডের ভয় ভোরের শবনমের মতো ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হতে থাকে এবং শেষ অবধি ও পরবর্তীতে হুকুমাতের উলুল অমর সভাসদদের সাথে ইয়ার বন্ধুর কাছাকাছি এ পর্যায়ে নেমে আসেন। প্রশাসনিক উদারতার ছত্রছায়ায় নারীর প্রতি মোহ, শরাবের আকর্ষণ আর আমোদফুর্তির আনযাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একাধিক দারগ্রহণ ও স্ত্রী বর্জন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি ব্যাপক হারে প্রাদুর্ভাব ঘটে দীলরুবা, মেহ্‌বুবা, সোহেলী আর সেবা সঙ্গিনীর।

এই পরিস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ নেয় সুযোগ সন্ধানীরা। তারিফ আর বাহবার মাধ্যমে এক অদৃশ্যচক্র বাংলার এই হুকুমাতকে যাদুকরের বাঁশীর মতো কওমী অনুভূতি, ঈমান আর শৃঙ্খলা থেকে দূরে এক খতরনাক পরিবেশে টেনে আনে। এই বাঁশীর মনমোহনী সুরে মুগ্ধ হন সুলতানেরা, মুগ্ধ হয় কওমী গাদ্দারেরা। বহ্নিমুগ্ধ সামার

মতো তালকানা হয়ে আহম্মকেরা বেশুমার ঘুরপাক খেতে থাকে। আর বুদ্ধিমানেরা কায়দা করে এককে অন্যের উপর ঠেলে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দাঁত ভাঙ্গে। উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাদির পয়লা রাতে বিল্লি মারার মতো বহ্নিমুগ্ধ করার কাজে এই বুদ্ধিমানেরা তৎপর হয়ে উঠে। লায়লা আকতারের আব্বা আতিকুল্লাহ সাহেব এই শাদির পয়লা রাতে বিড়াল মারার এক শিকার।

যে কয়জন ঈমানদার ইনসান ইলিয়াস শাহী হুকুমাতের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন, লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে যাঁরা বাংলা মুলুকে মুসলমানদের আধিপত্য হেফাজত করার লক্ষ্যে জেহাদ করে গেছেন, প্রথম জীবনে লায়লা আকতারের আব্বা আতিকুল্লাহ ছিলেন সেই দলেরই মদদগার। কওমী আদর্শে উদ্বুদ্ধ আতিকুল্লাহ যখন পাণ্ডুয়ার সুলতানী দরবারে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিলো স্থির, ঈমান ছিলো দৃঢ়। কিন্তু কালক্রমে ভেঙ্গে যায় সে ঈমান, ভেস্তে যান তিনি নিজে।

আতিকুল্লাহর শ্বশুর হাজী আমানুল্লাহ ছিলেন ছত্রার জায়গীরদার। সহায়-সম্বলহীন ভবঘুরে আতিকুল্লাহর মধ্যে তিনি প্রতিভার এক উজ্জ্বল ছাপ দেখতে পান। অপুত্রক আমানুল্লাহ তাকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং এলেম হাসিলের সাথে তাকে রণবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। কালক্রমে এই আতিকুল্লাহর সাথেই তাঁর একমাত্র কন্যা লতিফা খাতুনের শাদি দেন। হাজী আমানুল্লাহ ছিলেন একজন পরহেজগার আদমী। একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ। শেষ জীবনে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। একমাত্র কন্যা লতিফা খাতুনের শাদি দেয়ার পর তিনি ইহলৌকিক ঝুটঝামেলা থেকে অবকাশ নেয়ার আনযাম করেন। সুলতান সিকান্দার শাহ জায়গীরদার আমানুল্লাহকে খুবই খাতির করতেন। আমানুল্লাহর সুপারিশক্রমেই সিকান্দার শাহ আমানুল্লাহর জামাতা আতিকুল্লাহকে ছত্রার জায়গীরদাররূপে বহাল করেন। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব জামাইয়ের হাতে দেয়ার পর বৃদ্ধ আমানুল্লাহ বাকী জীবন মক্কা শরীফে কাটিয়ে দেয়ার নিয়াতে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং কিছুদিন পর ওখানেই ইন্তেকাল করেন।

একজন তরুণ আমীররূপে সুলতানের দরবারে প্রবেশ করার পর আতিকুল্লাহ কয়েক বছর অত্যন্ত শক্ত হাতে ঈমান আর ইনসাফীর ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে জেহাদ করতে থাকেন। দরবারের স্বার্থান্বেষী মহল এতে আতংকিত হয়ে উঠে এবং ভবিষ্যতের বিপত্তি অংকুরেই বিনাশ করার ইরাদায়, ইয়ারের ছদ্মবেশে এই স্বার্থান্বেষী মহলের সদস্যেরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে থাকে। আহ্বানে আপ্যায়নে তাকে তারা কাছে টানতে থাকে। প্রথম প্রথম দু' একজন আমীরের মকান থেকে দাওয়াত আসা শুরু হয়। অতঃপর লাগাতার আসতেই থাকে দাওয়াত। আতিকুল্লাহর খোশনামে আর খোশামোদে তারা আচানক এতই মুখর হয়ে উঠে যে, আতিকুল্লাহ অচিরেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাদের আমন্ত্রণের ক্ষেত্রস্থল শুধু উমরাহদের সরাইখানা, এমন কি নাচ মহল পর্যন্ত তার বিস্তৃতি ঘটে। এটা লক্ষ্য করে লতিফা খাতুন পেরেশান হয়ে পড়েন এবং আতিকুল্লাহকে হুঁশিয়ার করার প্রাণপণ কোশেশ করেন।

কোশেশ করেন মুরুব্বীরা। কোশেশ করেন শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আতিকুল্লাহ পয়লা পয়লা এ ব্যাপারে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করলেও সস্তা বাহবা আর তোয়াজের তুফানে তার ঈমান আর মনোবল ক্রমে ক্রমেই কমজোর হয়ে পড়ে এবং অবশেষে সকলের সব নসিহৎ বেআমল করে মওজের ফোয়ারায় তিনি বেখবর হয়ে যান। শেষ অবধি হালতটা এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, শরাবখানা আর নাচমহল ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন উমদা জায়গা আছে, এ খেয়াল তাঁর দিমাগেই আর আসে না। ফলে স্ত্রী-পুত্র, ঘর-সংসার ফেলে তিনি শরাবখানা আর নাচ মহলেই রাত কাটাতে থাকেন। এ সময় পাণ্ডুয়ায় ফুলবানু নামে এক খুবসুরত দিল্লীওয়ালীর নাচমহলই সর্বাধিক জমজমাট হয়ে উঠে। মতলববাজ ইয়ারেরা আতিকুল্লাহকে তার কাছেই ভিড়িয়ে দেয়। অতঃপর তার মহলেই আতিকুল্লাহর রাত কাটতে থাকে। রাতের পর রাত। কালক্রমে ফুলবানুর প্রতি আতিকুল্লাহ এমন আসক্ত হয়ে পড়েন যে, দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও তাকে শাদি করার ইরাদায় তিনি দীওয়ানা হয়ে উঠেন।

সামান্য এক নাচনেওয়ালীর পক্ষে আমীর-উমারহের বেগম হওয়া কম কিসমতি নয়। মওকা পেয়ে ফুলবানুও সোচ্চার হয়ে উঠে। মহব্বতের নিখুঁত অভিনয় করে সে আতিকুল্লাহকে জানায় যে, আতিকুল্লাহর ইশকে সে নিজেও আত্মহারা। আতিকুল্লাহর অভাবে তার নিজরে জিন্দেগানীও বরবাদ হয়ে যাবে। তবে একটা মুশকিল যে, সতীনের ঘর করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আতিকুল্লাহর মহব্বত একাই সে দীলের মধ্যে পুরে রাখতে চায়। সে জান দিতে রাজী, কিন্তু এই মহব্বতের হিস্‌সা দুস্‌রা কাউকে দিতে সে বিলকুল নারাজ। অতএব, লতিফাকে তালাক দিয়ে বিদেয় করলে আতিকুল্লাহকে শাদি করতে সে একপায়ে খাড়া।

শরাবের নেশায় তখন আতিকুল্লাহ বুঁদ। ফুলবানুকে পাওয়ার জন্যে সে বিশ্ব দিতে রাজী। লতিফাকে তালাক দেয়া সে তুলনায় একেবারেই মামুলী হাদিয়া। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে তালাকনামা তৈরি করার হুকুম দিলেন। খবর পেয়ে লতিফা খাতুন উন্মাদিনীর মতো ফুলবানুর নাচমহলে ছুটে আসেন। আতিকুল্লাহ ও ফুলবানুর হাতে পায়ে ধরে তাঁর এই সর্বনাশ করা থেকে তাঁদের বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কারো দীলে কোন রহম পয়দা না হওয়ায় তিনি আতিকুল্লাহর দুই পা জড়িয়ে ধরে পুনঃপুনঃ মূর্ছা যেতে থাকেন। শেষ অবধি স্ত্রীর দাবি ত্যাগ করে তিনি বাঁদী হয়ে থাকার জন্যে মকানের এক কোণে ঠাঁই ভিক্ষে করেন এবং তাঁকে তালাক না দেয়ার জন্যে আতিকুল্লাহর পায়ে মাথা কুটতে থাকেন। কিন্তু আতিকুল্লাহর পাষাণ দীল কোন কিছুতেই গলে না। তিনি ফুলবানুকে শাদি করে মকানে এনে তোলেন এবং লতিফাকে তালাক দিয়ে ছয় মাসের বাচ্চা লায়লা আকতারসহ মকান থেকে তাড়িয়ে দেন। একমাত্র ছেলে ছয় বছরের আব্দুল লতিফ মায়ের সাথে যেতে চাইলে আতিকুল্লাহ তাকে টেনে এনে কুঠরীর মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখেন।

লায়লা আকতারকে বুকে নিয়ে লতিফা খাতুন বাপের বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু বাপের কোন বিষয়বিত্ত তখন আর ছিলো না। সবটুকুই তখন আতিকুল্লাহর নামে। আত্মীয়-স্বজনও তেমন কেউ না থাকায় ঘুরতে ঘুরতে লতিফা খাতুন বিহারের জৌনপুরে বসতকারী তাঁর ফুফাতো ভাই মোবারক আলীর মকানে এসে হাজির হন। মোবারক আলী জৌনপুরে তেজারতি করতেন। তার ব্যবসাও খুব জমজমাট। অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু স্বভাব তার কিপ্‌টের। আচানক এই বাড়তি বোঝা জুটে পড়ায় তিনি খুশী হতে পারলেন না। শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরেই উচ্চবাচ্য না করে খামোশ হয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁর বিবিটা বড় দাজ্জাল। প্রথম দিকে এ জঞ্জালকে সে মকানে স্থান দিতেই নারাজ ছিলো। শুধু দাসীবাদীর তামাম কাজ করে দেবে বলে লতিফা খাতুন একান্ত কাকুতি-মিনতি করায় সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়।

যেতে থাকে দিন। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা খায়-খাটুনী করে এবং গৃহকর্ত্রীর নিত্য নতুন জ্বালা যন্ত্রণা সয়ে লতিফা খাতুনের দিন গুজরান হতে থাকে। কিন্তু এটুকুও লতিফা খাতুনের নসীব বরদাস্ত করতে পারে না। মোবারক আলীর এক শ্যালক অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর এক ভাই থাকতো বাড়ীতে। একেবাড়েই খন্নাস্ আদমী। লতিফা খাতুনের খুবসুরত তার দুই চোখে নেশা ধরে। লতিফাকে বেহুরমতি করার বদ নিয়াত নিয়ে সে হামেশাই তাঁর চারপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। অত্যন্ত হুশিয়ারীর সাথে লতিফা খাতুন তাঁর মান-সম্ভ্রম হেফাজত করে চলতে থাকেন। ব্যাপারটা গৃহকর্ত্রীর কানে দিলে বারুদের ঘরে আগুন লাগে। তাঁর ফরিয়াদকে বেআমল করে গৃহকর্ত্রী তাঁকেই সগর্জনে শাসন করতে থাকে এবং তার ভাইকে সে শরীফ আর লতিফাকে কস্‌বী বলে আখ্যায়িত করে। ফলে লতিফা খাতুনের নিরাপত্তা আরো বেশী বিপন্ন হয়ে উঠে।

একদিন লতিফা খাতুন ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। এই সুযোগে খন্নাসটা লতিফা খাতুনের উপর জবরদস্তি হামলা চালায়। তাঁর ইজ্জতহানি করার লক্ষ্যে বদমায়েসটা তাঁকে সবলে জাপটে ধরে। ধস্তাধস্তি করে লতিফা খাতুন নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দৌড় দিলে খন্নাসটা পুনরায় তাঁর পেছনে ধাওয়া করে। নিরুপায় হয়ে লতিফা খাতুন বড় এটা বরতন ছুঁড়ে মারেন। বরতনের আঘাতে জানোয়ারটা বসে পড়ে। লতিফা খাতুন সেই ফাঁকে লায়লা আকতারকে তুলে নিয়ে রাজপথে ছুটে আসেন। কিন্তু খন্নাসটাও ক্ষান্ত হয় না। সেও রাজপথে ছুটে এসে লতিফাকে ধাওয়া করে। আত্মরক্ষার নিমিত্তে পুনঃপুনঃ আওয়াজ দিয়ে লতিফা খাতুন প্রাণপণে ছুটতে থাকেন। এই সময়ে সামনে আসে সগীর খাঁ।

ঘটনাটা আঁচ করেই সগীর খাঁ বদমায়েশটাকে ধরে ফেলে এবং দস্তুর মতো পিটুনি দিয়ে তাকে রাস্তার উপর শুইয়ে দেয়। অতঃপর লতিফার কোন স্থান-আশ্রয় নেই শুনে সে তাঁকে নিজ মকানে নিয়ে আসে। লতিফা খাতুন খানিকটা ইতস্ততঃ করলে সগীর খাঁন বলে, বহিন, এ দুনিয়ায় সব মানুষই জানোয়ার নয়। তুমি নিশ্চিন্তে আমার সাথে

চলে এসো। আমার মকানের এক অংশ তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো। সেখানে তুমি থাকবে আর মেহানত করে খাবে। সেই সাথে তোমাকে এ আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার মকানে তো দূরের কথা, কোন খন্নাস আদমীর হিম্মত নেই সগীর খাঁর মহল্লাতে একটা কদম রাখে।

সেই থেকেই লতিফা খাতুন সগীর খাঁর মকানের এক অংশে আছেন। সগীর খাঁ এ অংশটা মফুতই দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে লতিফা খাতুন একেবারেই নাছোড়বান্দা হওয়ায় কিছু ভাড়া সগীর খাঁকে কবুল করতেই হচ্ছে।

সগীর খাঁর কাহিনী শেষ হলে আলী আশরাফ বললো, তাজ্জব! আমাদের বাড়ীও বাংলা মুলুকে। আমার আব্বাও ঐ একই দরবারের সালার ছিলেন।

সগীর খাঁ বললো, তাই? তাহলে আতিকুল্লাহ সাহেবের সাথে নিশ্চয়ই তাঁর পরিচয় ছিলো।

শেখ আব্দুল্লাহ বললো, না, আতিকুল্লাহ নামে তখন কোন আমির পাণ্ডুয়ার শাহী দরবারে ছিলেন না। আমরা ওখান থেকে চলে আসার পরেই তাহলে উনি ওখানে ঢুকেছেন।

সগীর খাঁ বললেন, সে যা-ই হোক, এদিককার সব কথাই তো শুনলেন। এবার বলুন, ওদের এই মুসিবতের দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে ওদের জন্যে কিছু করতে আপনারা রাজী আছেন কিনা?

শেখ আব্দুল্লাহ এবার আশরাফের দিকে চাইলো। যার সংসার, ওয়াদাটা তার মুখ থেকেই আসুক – এই তার মনোবাঞ্ছা।

আব্দুল্লাহর ইরাদা ঠাহর করতে পেরে আলী আশরাফ সগীর খাঁকে বললো, আমাদের সামর্থ্য তো খুব বেশী নয়। তবু লায়লা আকতারের আম্মা যদি এযাযত দেন, তাদের আমরা আমাদের সাধ্যমত মদদ যোগাতে সব সময়ই রাজী।

সগীর খাঁ খোশ দীলে বললো, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে বাবা, তোমাদের মওকা মতো এসো একদিন এই গরীবের গরীবখানায়। প্রতিদিন বাদ আসর আমি আমার মকানেই থাকি। লায়লা আকতারের আম্মার সাথে সরাসরি কথা বলে যা করার তাই করবে।

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, জি, আচ্ছা।

পরের দিনই বাদ আসর আব্দুল্লাহ আর আলী আশরাফ সগীর খাঁর বৈঠকখানায় হাজির হলো। খবর পেয়েই সগীর খাঁ বেরিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে মোসাফেহা করে বললো, তশরীফ রাখুন।

তারা আসন গ্রহণ করতেই খবর পেয়ে পড়িমরি করে ছুটে এলো লায়লা আকতার এবং তার পেছনে লতিফা খাতুন। লতিফা খাতুন এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালেন। লায়লা আকতার খোশ দীলে আলী আশরাফকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলো।

আলাপের শুরুতেই লতিফা খাতুন বিগত দিনের ঘটনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন, ইনসানের বে-ইনসাফী সয়ে সয়ে দিমাগ আমার মিস্‌মার হয়ে গেছে। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ এখন আর তা তেমন ফারাক করতে পারি না। সগীর ভাইয়ের তফসীর শোনার পর আমি আমার আহম্মকিটা একিন করতে পেরেছি। আপনাদের কাছে মাফী চাওয়ার জবান আমার নেই।

শেখ আব্দুল্লাহ বললো, না, না। তাতে কি হয়েছে? আপনিতো কসুর কিছু করেন নি।

লতিফা খাতুন জোর দিয়ে বললেন, কসুর আমি করে ফেলেছি ঠিকই। নারাজ হয়ে আপনারা আমার মেহমানদারিও গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু যখন আমাদের প্রতি রহম আপনাদের আছে, তখন জিয়াদা কিছু বলার নেই। এই এতিমটাকে মানুষ করার ব্যাপারে আপনারা মেহেরবানী করে যা কিছু করবেন, আমাদের জন্যে তাই অশেষ নিয়ামত।

সগীর খাঁর হাতে কিছু নগদ অর্থ দিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ বললো, বহিন, লায়লা আকতারকে এরপর থেকে সেরেফ এলেম হাসিল করা ছাড়া অন্য কাজে লাগাবেন না। ও যা কামাই করতো সেটা পুষিয়ে দেয়ার জন্যে সগীর ভাইয়ের হাতে সামান্য কিছু দিয়ে গেলাম। এর পর যখন যা জরুরত হয় সেদিকে নজর আমাদের থাকবে। লায়লা আকতারকে আপনি আপনার মনের মতো করে মানুষ করে তুলুন।

অর্থগুলো হাতে নিয়ে সগীর খাঁ তাজ্জব বনে গেলো। কিছু মদদ এরা দেবে– এই ধারণা ছিলো তার। এতটা যে দেবে, সে তা কল্পনাও করেনি। তাই সে বিহ্‌বল কণ্ঠে বললো, সামান্য কিছু কি বলছেন ভাই সাহেব? এ দিয়ে তো এদের মা বেটির দু' তিন বছর রাজার হালে চলে যাবে।

শেখ আব্দুল্লাহ আপত্তি করে বললো, না ভাই সাহেব, এ অর্থ সামান্যই। এরা সেরেফ দু'টি মানুষ বলেই আপানার এমন খেয়াল হচ্ছে। একটা বড় সংসারে এ অর্থ দু' তিন মাসের বাজার খরচেই লাগে। তা যাক, সে কথা। এরপর লায়লা আকতারের এলেম হাসিলের ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে কিনা তা বলুন। মক্তবের বাইরে আলদা কোন উস্তাদ যদি ওর জন্যে নিয়োগ করতে চান, তাও আপনারা করে ফেলবেন। খরচের জন্যে চিন্তা করতে যাবেন না। ওটুকুর এযাযতও মেহেরবানী করে আমাদের দিতে হবে।

সগীর খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বললে, আরে না, না। বাড়তি উস্তাদের জরুরতই হবে না। লায়লা আকতার একজন চোখা তালেবে এলেম। অন্য কোন খায়-খাটুনি না করে যদি ও একদীলে এলেম হাসিলের মওকা পায়, ওকে ঠেকায় কে?

লতিফা খাতুন এই প্রেক্ষিতে বললেন, সগীর ভাইয়ের কথার সাথে আমিও একমত। এটুকু হলেই আমরা ধন্য। তবে আমার মনের মতো করে মানুষ করার কথা উঠলে

আমার আলাদা একটু বলার আছে।

আব্দুল্লাহ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললো, বলুন - বলুন।

লতিফা খাতুন বললেন, শুনলে হয়তো হাসবেন আপনারা। কিন্তু লায়লা আকতারকে মানুষ করা নিয়ে আমার ধ্যান-ধারণা অনেকখানি অন্যরকম।

ফের শেখ আব্দুল্লাহ বললো, জি, বলুন।

ঃ কিতাবী বিদ্যার সাথে লায়লা আকতার যুদ্ধবিদ্যাও শিখুক, এই আমার উম্মিদ। হয়তো এটার আনযাম করার সাধ্য আমার হবে না, তবু এটা আমার দীর্ঘদিনের খাহেশ।

ঃ মা'শা আল্লাহ্!

ঃ আমার আব্বার বিষয়-বিত্ত যে যালিম জবর দখল করে আছে, আমার আব্বার ধন-দৌলত দিয়ে মওজের ফোয়ারা ছুটিয়ে চলেছে, তার হাত থেকে সে সম্পদ আমি ছিনিয়ে নিতে চাই। ছেলের দ্বারা আমার এ উম্মিদ পূরণ হবে কিনা জানি না, তবে মেয়েটাকে আমি এমনইভাবে তৈয়ার করতে চাই। কিন্তু সকলের সব খাহেশতো পূরণ হবার নয়।

হতাশার ক্ষীণ একটা আওয়াজ লতিফা খাতুনের কণ্ঠে স্পষ্টভাবে বেজে উঠলো। আব্দুল্লাহ তা লক্ষ্য করে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, কেন নয়?

ঃ ছেলে হলে কথা ছিল না। কিন্তু লায়লা আকতার মেয়েছেলে। তার জন্যে আলাদা উস্তাদ চাই, আলাদা পরিবেশ চাই। একমাত্র আমির-উমরাহ্‌রাই পারেন সে ব্যবস্থা করতে। আমার মতো মিস্‌কীনের পক্ষে এ ধরনের খোয়াব্ দেখাও না-জায়েজ।

আলী আশরাফ এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার সে বললো, এ আর এমন কি শক্ত ব্যাপার? খানকাহ থেকে ফিরে এসে লায়লা আকতার হররোজ আমার এই আব্দুল্লাহ চাচার কাছে এলেই তো লা-খরচা সব রকম ফৌজী শিক্ষা পেতে পারে। তীরন্দাজী, নেজাবাজী, ঘোরসোয়ারী আর তলোয়ারে আমার এই চাচার মতো দখল এখানকার অনেক জবরদস্ত সালারেরও নেই।

আশার উদীপ্ত আলোকে লতিফা খাতুনের মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, সে কি! ভাই সাহেবও তাহলে একজন ফৌজী লোক?

শেখ আব্দুল্লাহ হেসে বললো, না বহিন, তেমন কোন তক্‌মাধারী যোদ্ধা আমি নই। তবে মশ্‌হুর এক ফৌজীলোকের নওকর যখন, তখন ও বিদ্যায় অল্প বিস্তর তালিম থাকা চাই বৈ কি!

লতিফা খাতুন বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে ভাইসাহেব যদি মেহেরবানী করে মেয়েটার জন্যে একটু তকলিফ করতে–

তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ বললো, আরে না - না। এতে আর

তকলিফ দেখছেন কোথায়? এতো আমার সখের কাজ। আপনার এখানে জায়গা আর সরঞ্জামাদি থাকলে আমিই আসতাম হররোজ। তা যখন নেই, মকান তো আমাদের এই নিকটেই। লায়লা আকতার ওখানে সময় করে যেতে পারলে আমার সামান্য যা জানা আছে সেগুলোতে ওকে আমি খোশ দীলে তালিম দেবো। এ কাজে আমার আনন্দ বাড়বে বৈ কমবে না।

লতিফা খাতুন একটু প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হায়াত দারাজ করুন। আমার এই অসম্ভব উম্মিদ যে পূরণ হবে কোনদিন এমন কোন বিশ্বাসই আমার ছিলো না, এ জন্যে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

* * *

লায়লা আকতার প্রতিদিন ফৌজী শিক্ষায় ছবক নেয় আলী আশরাফের মকানে। শেখ আব্দুল্লাহ পালা করে তাকে তীরধনুক, তলোয়ারে আর বর্শা ছোঁড়ায় ছবক দেয়। শেখ আব্দুল্লাহ ব্যস্ত থাকলে আলী আশরাফ তালিম দেয় লায়লাকে। সকাল বেলা খানকাহ শরীফে কেতাবী এলেম আর বিকেল বেলা আলী আশরাফের মকানে ফৌজী এলেম হাসিল করাই এখন লায়লা আকতারের একমাত্র কাজ।

দিন যায় দিন আসে। দিনে দিনে লায়লা আকতার ফৌজী শিক্ষায় পোক্ত হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে তীরধনুকে তার হাত সবিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিতে থাকে। এখন সে আলী আশরাফের সাথে পাল্লা দিয়েই তীর ছোঁড়ে। নিশানাবাজীর জন্যে তারা এখন হামেশাই খোলা ময়দানে বা বনের ধারে যায় এবং তীর ছুঁড়ে নিশানা ঠিক করে। ঘোড় সওয়ারে তালিম নেয়ার ইরাদায় লায়লা আকতার এখন মাঝে মাঝেই আলী আশরাফের পেছনে উঠে বসে এবং এক ঘোড়ায় চড়ে দুইজন এক সাথে ছোটে। তালিম নেয়া ছাড়াও ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে লায়লা আকতার এখন কৌতুক বোধ করে। আগের মতো কামড়ানোর ভয় করে না।

একদিন লায়লা আকতারকে পেছনে নিয়ে আলী আশরাফ এমনিভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই অকাস্মাৎ সামনে পড়লেন আফতাব খাঁ। তিনিও ঘোড়া ছুটিয়ে একই পথে আসছিলেন। দুই দিক থেকে দুই ঘোড়া একেবারে মুখোমুখী হতেই দুই সওয়ারই ঘোড়ার লাগাম সজোরে টেনে ধরলেন। সশব্দে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া দুটি মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেলো। আফতাব খাঁ গরম হয়ে উঠলেন। মুখ তুলে শক্ত কিছু বদজবান আওড়াতে গিয়ে আলী আশরাফকে দেখে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। কিন্তু আলী আশলাফের পেছনে লায়লা আকতারকে দেখে তার মেজাজ ফের বিগ্‌ড়ে গেলো। আফতাব খাঁকে দেখামাত্র আলী আশরাফ হাত তুলে সালাম দিলো। সালাম নিয়ে আফতাব খাঁ নাখোশ কণ্ঠে বললেন, তোমাকে জাপটে ধরে বসে ওটা কে? তোমার বহিন?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, জি না। এর নাম লায়লা আকতার।

ঃ লায়লা আকতার!

ঃ জি হ্যাঁ। আমার কাছে ঘোড়সোওয়ারী শিখছে।

ঃ কোন আমীরের বেটি?

ঃ হ্যাঁ। এর আব্বাও একজন মস্ত বড় আমীর।

ঃ কোন মুলুকের আমীর? জৌনপুরের?

ঃ না। বাংলা মুলুকের।

ঃ বাংলা মুলুকের আমীর এখানে এলো কবে?

ঃ আমীর এখানে আসে নি। এরাই এখানে থাকে।

ঃ এখানে থাকে! কোথায়?

ঃ ঐ বস্তিতে।

ঃ বস্তিতে? কোন্ ইমারাত ওদের?

আফতাব খাঁর চোখে মুখে বিদ্রূপের অভিব্যক্তি উপ্‌চে পড়তে লাগলো। সেটা আন্দাজ করতে পেরেও আলী আশরাফ সাদা দীলে বললো, জি না। ওখানে কোন ইমারত নেই। সগীর চাচার একখানা চালাঘর ভাড়া করে এরা ওখানে থাকে।

আফতাব খাঁ হো হো করে হেসে উঠলেন। তিরছা নজরে চেয়ে বিদ্রূপ করে বললেন, মারহাবা, মারহাবা! তাই বলো – বস্তি বাজারের আমীর। আর ওটা সেই বস্তি বাজারের শেহ্‌জাদী।

সোজা নজরে চেয়ে আলী আশরাফ বললো, জি।

আফতাব খাঁ এবার বিষ ঢালতে লাগলেন। বললেন, নীচু তব্‌কায় পয়দা যারা, তাদের খাস্‌লত এই রকমই হয়। আতরের মধ্যে ডোবালেও তাদের গায়ের নোংরা গন্ধ যায় না। একটা সালারের আওলাদ হয়ে একটা বস্তির মেয়েকে ঘোড়ায় তুলে নিয়েছো?

আলী আশরাফ স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলো, কেন, এতে কসুর হয়েছে কিছু?

ঃ কসুর হয়েছে কিনা সেটা অনুভব করতে পারতে, যদি খানদানী আদব আখলাকের সাথে কিছু পরিচয় তোমার থাকতো। মস্ত বড় মওকা পাওয়া সত্ত্বেও সেটা তো আর আয়ত্তে আনতে পারলে না। এ জিন্দেগীতে আর পারবেও না।

আলী আশরাফ এবার মজবুত কণ্ঠে সওয়াল করলো, আপনি কি বলতে চান?

ঃ বলার আর আছে কি? এত করে সাধলাম, আমার ছেলেমেয়েদের সাথে চলাফেরা করো– আখেরে কাজ দেবে। কিন্তু ঐ যে কথায় বলে, কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না। আমার সে নসিহতের কোন আমল না দিয়ে এই বস্তি-বাজারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাতামাতি করছো?

ঃ তা – মানে –

ঃ করবেই তো। বাপটা একটা সালার থাকলে কি হবে? পদ পেলেই তো আর

কারো বংশটা খানদান হয়ে যায় না! ওটা একদম আলাদা ব্যাপার।!জওয়াবে আলী আশরাফ জোরদার কণ্ঠে বললো, আপনার ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করার বহুৎ কোশেশ আমি করেছি। কিন্তু ইনসানকে যারা ইয্যত দিতে জানে না, খানদানী আখলাকের নামে বেধড়ক বেত্তমিজী আর ইতরামী করতে যারা এতটুকু শরমিন্দা হয় না – ঐ কেসিমের ভদ্রসন্তানের চেয়ে এই বস্তি-বাজারের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশী শরীফ, আর এদের আদব-আখলাক হাজার গুণে বেহতর।

আফতাব খাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বললেন, আমার ছেলেমেয়েদের চেয়েও এই বস্তির মেয়ে বেশী শরীফ? বেশী আদবের?

ঃ বললামই তো, অনেক বেশী আদবের। এত কাছে থেকে এটা শুনতে আপনার ভুল হওয়ারতো কথা নয়?

ঃ খামোশ! তুমি আমাকে অপমান করছো?

ঃ যদি তাই মনে করেন, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কারণ আপনি আমার গোটা বংশের উপর হাত রেখেছেন। এতে যদি আমি মনে করি আপনি আমাকে অপমান করেছেন, তাহলে আপনারই বা কি বলার থাকে বলুন?

ঃ বটে! কি বলতে চাও খোলাসা করে বলো!

ঃ এর বেশী বলতে কিছু চাইনে। তবু যদি বলতে বলেন, তাহলে আমি বলবো, আপনার এ খেয়াল কেমন করে হলো যে, আপনারা মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন লোক বাদে তামাম এই জৌনপুরে আর কোন খানদান বা শরীফ বংশ নেই? আমার আব্বা আপনার চেয়েও একজন উচ্চস্তরের সালার হওয়া সত্ত্বেও খানদান হতে পারেন নি, এটা আপনি বলতে পারেন কি করে?

ঃ পারি এই কারণেই যে, আমার বাড়ীও বাংলা মুলুকে এবং তাকে আমি আগে থেকেই চিনি। খানদানী বংশের চাল-চলন তার মধ্যে থকলে বাংলা মুলুকের হুকুমাতের সে যখন এক প্রভাবশালী আমীর তখন আমার মতো খানদান ঘরের ব্যক্তির ভাত হয়না বাংলা মুলুকে? এই জৌনপুরে আসতে হয়? খানদান ঘরের চাল-চলন তার মধ্যে থাকলে মামুলী ঘরের লোকজনদের দোস্ত বলে ডেকে নেয়, আর আমার দিকে নজর তুলেও চায় না?

অতীত আক্রোশে আফতাব খাঁ ফুলতে লাগলেন। আলী আশরাফ আরো অধিক শানদার কণ্ঠে বললো, আপনার মকানে আমি গিয়েছি আর আপনার ছেমেয়েদের চাল-চলন আমি দেখেছি। খানদান বংশের চাল-চলনের অর্থ যদি আপনার বংশের চাল-চলন হয়, তাহলে অমন চাল-চলন আমার আব্বার মধ্যে না থাকার জন্যে আমি গর্ববোধ করছি এবং সেজন্যে আমার মরহুম আব্বাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি!

আর এক লহমা না দাঁড়িয়ে অশ্বের লাগাম টেনে আলী আশরাফ তার গতিপথে ছুটে গেলো। অপমানে ও ক্রোধে হতবুদ্ধি আফতাব খাঁ হাতে ধরা লাগামটা হাতের মধ্যে পিষতে লাগলেন।

* * *

আলী আশরাফের এই আচরণ আফতাব খাঁ এত সহজে বরদাস্ত করে যেতেন না। যাহোক একটা হৈ চৈ কিছু বাধাতেনই। কিন্তু বিশেষ একটা মতলব আছে বলেই একটা নাবালকের এই ঔদ্ধত্য তিনি বরদাস্ত করে গেলেন।

বাড়ী ফিরে সদর ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই তিনি দেখলেন, তাঁর ছেলেমেয়ে এক কাঙালী বৃদ্ধাকে অকথ্য জবানে গালিগালাজ করছে। বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে বৃদ্ধাটি মাঝ আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করছে। তার কোন কথায় কান না দিয়ে ছেলেমেয়ে দুইজন সমানে বৃদ্ধার দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে আর কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়াচ্ছে।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে আফতাব খাঁ দ্রুত পদে এগিয়ে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তামাম অঙ্গ হিম হয়ে গেলো। ইট-পাটকেলের আঘাতে বৃদ্ধাটির কপাল ও মাথার নানা স্থান কেটে গেছে এবং ক্ষত বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা লহু ঝরে পড়ছে। তার চেয়েও যা কল্পনাতীত, তা হলো– এই বৃদ্ধাটিই আফতাব খাঁর গর্ভধারিণী আম্মা!

বাংলা মুলুক থেকে জৌনপুরে আসার সময় আফতাব খাঁ শুধু বিবিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। মাতাপিতা ভাইবেরাদর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলেই বাংলা মুলুকে থেকে যায়। আফতাব খাঁর সাংসারিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিলো না। অতি সাধারণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আফতাব খাঁর ফৌজী জীবন শুরু হয়। জৌনপুর ফৌজে এসে যোগদানের পর কোন কৃতিত্বের জন্যে নয়, বাঁকা পথ ধরে আফতাব খাঁ দিনে দিনে সালার পর্যন্ত উঠেছেন। এখানে এসে প্রথম প্রথম মাতাপিতাকে কিছু কিছু আর্থিক মদদ দিতেন। কিন্তু সালার হওয়ার পর নয়া খানদানীর জৌলুসে আফতাব খাঁর দুই নয়ন ধেঁধে যায়। দেশ-ভূঁইয়ের কথা তিনি বেমালুম ভুলে যান। বিগত আট দশ বছর ধরে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন কারো সাথেই তিনি আর কোন সম্পর্কই রাখেন নি। জৌনপুরে আসার পরই তিনি মস্ত বড় খানদান ঘরের সন্তানরূপে নিজেকে জাহির করেন এবং সেই খানদানী পরিচয়টা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকায় পিতাকে কোনদিনই জৌনপুরে আনেন নি বা আসার জন্যে কাউকে এযাযতও দেননি। নিজের সঠিক ঠিকানাটাও সেই কারণে তিনি বরাবরই গোপন করে গেছেন। ইদানীং আফতাব খাঁর ওয়ালেদ ইন্তেকাল করায় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বিষয়-আশয় যৎকিঞ্চিৎ যা ছিলো সবই আত্মসাৎ করে বিমাতাকে বিতাড়িত করেছে। অন্নের জন্যে আফতাব খাঁর বৃদ্ধা জননী অনেক দ্বারে ঘুরেছেন এবং পুত্রের কাছে অনেক পয়গাম পাঠিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হয়নি। ঠিকানা সঠিক না হওয়ায় কোন পয়গামও পুত্রের কাছে পৌঁছেনি। অবশেষে জঠরজ্বালা সহ্য করতে না পেরে লোকজনের পরামর্শে এই বৃদ্ধা আউরাতটি ব্যবসায়ীদের কাফেলার সাথে জৌনপুরের উদ্দেশে রওনা হন এবং ব্যবসায়ীদেরই একজন তাঁকে আফতাব খাঁর মকান পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

আফতাব খাঁকে দেখে বৃদ্ধাটি তাঁকে চেনার কোশেশ করলেন এবং চিনতে পেরেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। অদূরে দণ্ডায়মান আফতাব খাঁর পুত্র-কন্যা বৃদ্ধাটিকে কাঁদতে দেখে অট্টহাসি হাসতে লাগলো এবং হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো। আফতাব খাঁ তাদের ধমক দিয়ে বললেন, খামোশ্!

অতঃপর আশেপাশে অন্য কেউ আছে কিনা এক নজরে দেখে নিয়ে বৃদ্ধাটিকে ধরে আফতাব খাঁ অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন। তা দেখে ছেলেমেয়েরা পুনরায় হৈ হৈ করে উঠলো। পিতাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আকলিমা বেগম বললো, ছিঃ! ছিঃ! আব্বু, ওতো একটা মিসকিন। ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? লোকে দেখে ফেললে আমাদের আর কেউ ইয্যত দেবে না।

আবতাব খাঁর জবান তখন হারিয়ে গেছে। তালাশ করে দুস্রা শব্দ না পেয়ে ফের তিনি বললেন, খামোশ্!

পরের দিন আফতাব খাঁ ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে দহলীজে বসলেন। ঐ কাঙালীটা আফতাব খাঁর আম্মা শুনে ছেলেমেয়েরা যারপরনেই নাখোশ। তার চেয়েও বেশী নাখোশ তাঁকে এই মকানেই স্থান দেয়ায়। শীগগির তাঁকে বাংলা মুলুকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন– এই ওয়াদাই আফতাব খাঁকে স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলের কাছে করতে হলো। তাছাড়া নিজেও তিনি এ নিয়ে কম বিব্রত ছিলেন না। কথাবার্তায় আদবে-আখলাকে গ্রামের সাদাসিধে আচরণ ছাড়া বৃদ্ধার মধ্যে আফতাব খাঁর তথাকথিত খানদানী আখলাকের আদ্যাক্ষরও ছিলো না। আফতাব খাঁর কাছে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কথায় কথায় আফতাব খাঁ তার ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করলেন, আলী আশরাফ এখানে কখনও এসেছিলো?

পুত্র আফজাল আলী বললো, হ্যাঁ, একদিন এসেছিলো।

ঃ সেরেফ একদিন?

ঃ আগেও নাকি বার কয়েক এসেছিলো, কিন্তু সে খবর আমরা কেউ জানিনে।

কন্যা আকলিমা বেগম ভাইকে সওয়াল করলো, আলী আশরাফ! কোন আলী আশরাফ ভাইয়া? ঐ এতিমটা?

ঃ হ্যাঁ। অলিগলির বালবাচ্চাদের সাথে যে দোস্তিগিরি করে বেড়ায়, সেই উজবুকটা।

আফতাব খাঁ এসব কথায় কান না দিয়ে পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, তার সাথে ফৌজী শিক্ষা নিতে যাবে, তোমাকে আমি এই নসিহৎ করেছিলাম। তুমি তা যাও নি কেন?

জওয়াবে আফজাল আলী বলরো, ও কখন আসে কখন যায় সে খবর জানলে তো?

ঃ একবার যখন জানলে, তখন যাও নি কেন?

ঃ কেমন করে যাবো? সে তো আমার কোন কথায় পাত্তা না দিয়ে গোস্বা করে বেরিয়ে গেলো!

ঃ কিভাবে কথা বলেছিলে তার সাথে?

ভাইয়া কিছু বলার আগেই আকলিমা বেগম ফস্ করে জওয়াব দিলো, কিভাবে আবার? একটা নীচু তব্‌কার মামুলী আদমীর সাথে যেভাবে বাৎচিৎ করতে হয়, সেইভাবে। খানদানী চালচলন কি আমরা জানি না?

ঃ তার মানে, তাকে কোন খাতিরই করে নি তোমরা?

আকলিমা এবার আকাশ থেকে পড়লো। বললো, খাতির! একটা এতিম মিসকীনকে খাতির করবো আমরা? আব্বু, তোমার নজরটা আজকাল খুব নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার হুঁশিয়ার হওয়ার দরকার।

আফতাব খাঁ কন্যার দিকে গরম নজরে তাকালেন। বললেন, আলী আশরাফ মিসকীন, এ কথা কে বললে তোমাকে?

আকলিমা বেগম তেজের সাথে জওয়াব দিলো, বলতে হবে কেন? একে তো একটা সিপাইয়ের বেটা, তাতে আবার এতিম। ও মিসকীন নয়তো আমীর? ঘর ভরা ধনদৌলত?

আফতাব খাঁ সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ, ঘরা ভরা ধনদৌলত। ওর এতো ধনদৌলত আছে যা তোমার এই আব্বারও নেই।

আকলিমা বেগম বিশ্বাস করতে না পেরে খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আব্বুর সব কথাতেই ঠাট্টা!

ঃ মানে?

আকলিমা বেগম এবার গোস্বাভরে উত্তর দিলো, আমাদের চেয়েও ওর ধনদৌলত বেশী?

ঃ শুধু আমাদের চেয়েই নয়, এই জৌনপুরের অনেক আমীর-উমরাহর চেয়েও ও অনেক বেশী ধনী।

পিতার মনমানসিকতা নিয়ে থোরাই পরোয়া ছিলো আকলিমার। সে ঠোঁট উল্টিয়ে বললো, তা হোক গে বেশী ধনী। ওর কম ধনদৌলত অনেক ছোটলোকদের ঘরেও আছে। তাই না ভাইয়া?

ভাইয়া কোন জবাব দেয়ার আগেই আকলিমা আবার বললো, আমাদের মতো উঁচু তব্‌কার ইয্‌যত যার নেই, তার ধনদৌলতের দাম কি!

ক্ষোভে গোস্বায় আফতাব খাঁ গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর জওয়াবে কি বলবেন কিছুক্ষণ তা ঠাহর করতে পারলেন না। বোনকে সমর্থন দিয়ে আফজাল আলী এই ফাঁকে বললো, আকলিমা ঠিক কথাই বলেছে। আলী আশরাফের ধনদৌলত যতই থাক, আমাদের মতো খানদান তো সে নয়? বিলকুল একটা মামুলী ছেলে। তাকে আমরা খাতির করতে যাবো?

উৎসাহ পেয়ে বহিন আবার বললো, খাতির না ছাই! কত খানদান ঘরের ছেলেমেয়েরাই আমাদের খাতির করতে দিশে পায় না, আর আমরা যাবো ঐ

এতিমটাকে খাতির করতে? দায় পড়েছে!

আফতাব খাঁ আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, বটে!

পিতার গতিক দেখে আকলিমার খুব রাগ হলো। সে অভিমান ভরে বললো, আব্বু, তোমার দিমাগটা কি বিলকুল বিগ্‌ড়ে গেছে? কোথায় আমরা আর কোথায় ও। খানদান ঘরের ছেলেমেয়েরা যে ইয্‌যত দেয় আমাদের তার এক কণাও আলী আশরাফ পায়?

আফতাব খাঁ দাঁতের উপর দাঁত পিষে বললেন, জি হাঁ পায়। তার চেয়েও হাজার গুণে বেশী পায়। তোমাদেরকে ইয্‌যত দেয় কিছু বুরবক ছেলেমেয়েরা। আর আলী আশরাফকে ইয্‌যত দেয় জৌনপুরের খোদ সুলতানে আলা। তিনি তোমাদের ঠুকেন?

আফজাল আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সুলতানে আলা! তিনি আলী আশরাফকে সরাসরি চেনেন?

ঃ শুধু চেনেনই নয়, ছেলের মতো ভালবাসেন। আর তোমার বাপের চেয়েও তাকে বেশী ইয্‌যত দেন।

একই রকম বিস্ময়ের সাথে আকলিমা বেগম বললো, সুলতানে আলা ইয্‌যত দেন ঐ এতিমটাকে? কেন আব্বু?

ঃ তার বাপের জন্যে। তার বাপ আমার চেয়েও উঁচু দরের সালার ছিলেন।

ঃ সালার না সেপাই?

ঃ সালার–সালার। সুলতানে আলার খুব পেয়ারের সালার।

অবাক হয়ে দুই ভাইবোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। হতভম্ব কণ্ঠে আকলিমা বেগম প্রশ্ন করলো, তাহলে আলী আশরাফও উঁচু তব্‌কার মানুষ– মানে, খানদান ঘরের ছেলে?

ঃ জবরদস্ত খানদান ঘরের ছেলে।

আফজাল আলী বললো, তাহলে ও ছোটলোকদের বালবাচ্চার সাথে মেশে কেন?

ঃ তা মিশলেও সবাই তাকে বেশী শরীফ মনে করেন এবং অনেক বেশী ইজ্জত দেন।

এই দুই ভাইবোনের কাছে আলী আশরাফকে খাতির না করার একটি মাত্র অন্তরায় – সে খানদান ঘরের ছেলে নয়। সেও একটা খানদান ঘরের ছেলে শুনে এই দুইয়ের দীলে আলাদা কেসিমের প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। আকরিমা বেগম অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললো, তো সে কথা আগে বলোনি কেন? আমরাও তাহলে খাতির করতাম তাকে। আঙ্গিনায় দাঁড় করিয়ে না রেখে সেদিন তাকে ডেকে এনে দহলিজে বসাতাম?

ঃ এখন থেকে বসাবে। আলী আশরাফের সাথে খাতির জমাতে পারলে, তার মুহব্বত আদায় করতে পারলে অনেক লাভ আছে আখেরে।

আফজাল আলী বললো, লাভও আছে? কি লাভ?

ঃ অনেক লাভ! আলী আশরাফ আমাদের মুহব্বত করে জানলে সুলতানের নেকনজর আমার উপরও পড়বে। আর তাতে আমি আরো উপরে উঠে যাবো – আরো বড় আসন পাবো।

আফজাল আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো, বলেন কি! এই রকম ব্যাপার?

ঃ হ্যাঁ। আলী আশরাফের মতো একজন তুখোড় আর দৌলতমান্দ্ ছেলেকে আত্মীয় বা ইয়ার করতে পারলে তোমাদের আখেরাতটাও মজবুত হয়ে যাবে।

এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য নাবালক দুই বালক-বালিকা বুঝলো না। তারা শুধু বুঝলো যে, আলী আশরাফকে খাতির করা দরকার।

* * *

দিন দুইয়েক পরই ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে আফতাব খাঁ আলী আশরাফের মকানে অকস্মাৎ তশরীফ আনলেন। মোকসুদ হাসিলের উদ্দেশ্যে আফতাব খাঁ এবার তাঁর চাল বদল করলেন। পয়লা পয়লা ভেবেছিলেন, ভয়-ভীতি-শাসন আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মাধ্যমেই হাত করবেন আশরাফকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলেন– আলী আশরাফ শেরের বাচ্চা শের– কোন বুযদীল ভেড়ার বাচ্চা নয়। এ চালে তাকে কাত করা যাবে না। কাজেই মুখের বিষ উগ্‌ড়ে ফেলে মধু পুরলেন সেখানে। যেভাবেই হোক, আলী আশরাফকে পাকড়াতেই হবে তাঁকে। আলী আশরাফের মাধ্যমে সুলতানের নেকনজর পাওয়াটাই একমাত্র উম্মিদ নয় আবতাব খাঁর। তাকে জামাই করার খাহেশও দীলে তাঁর দুর্বার। নেহাতই খোশনসীব ছাড়া এমন হিম্মতদার আর বিত্তশালী জামাই পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আলী আশরাফ এতিম। অথচ তার আব্বাও অনেক রেখে গেছেন, সুলতানও অঢেল তাকে দিয়েছেন। এমন ছেলেকে জামাই করতে পারলে ঐ প্রভূত সম্পদ পক্ষান্তরে তাঁর হাতেই পড়বে। এ লোভ সম্বরণ করার হিম্মত আফতাব খাঁর নেই।

তিনি যখন আলী আশরাফের মকানে এসে হাজির হলেন, তখন আলী আশরাফের দহলিজটা ফাঁকা। সহিস কোরবান আলী কয়দিন ধরে অসুস্থ। নওকরদের একজন তার জন্যে দাওয়াই আনতে গেছে। অন্যজন ঝিয়ের পেছনে রান্নার যোগান দিচ্ছে। আলী আশরাফ ভেতর আঙ্গিনায় লায়লা আকতারকে তলোয়ার চালানো শেখাচ্ছে। শেখ আব্দুল্লাহ বসে বসে কিছুক্ষণ তা দেখে এবং লায়লা আকতারের জোরদার তারিফ করে ঘোড়াগুলোকে দানা দিতে গেছে।

আফতাব খাঁ দহলিজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাইলেন। কাউকে কোথাও না দেখে কি করবেন তা ভাবতেই ঘোড়াগুলোকে দানা দিয়ে অপরিচ্ছন্ন লেবাসে শেখ আব্দুল্লাহ বাইরের আঙ্গিনায় এলো। ছেলেমেয়ে সহকারে জৌলুসদার লেবাসের ফৌজী লোক দেখে শেখ আব্দুল্লাহ খানিকটা হকচকিয়ে গেলো। লেবাস পাল্টিয়ে আসার আর ফুরসুত নেই দেখে সে ঐ ভাবেই এগিয়ে এসে মোসাফেহা

করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো। একটা অদনা আদমীর এহেন দুঃসাহস দেখে আফতাব খাঁ বিরক্ত বোধ করলেন। বাড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে আফতাব খাঁ তাঁর হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে নাখোশ কণ্ঠে সওয়াল করলেন, তুমি কে?

খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে শেখ আব্দুল্লাহ জওয়াব দিলো, জি, আমি এ মকানের নওকর।

নাক-চোখ কুঞ্চিত করে আফতাব খাঁ ফের সওয়াল করলেন, কতদিন ধরে আছো এখানে?

ঃ তা বহুত দিন হবে।

ঃ এমন একটা পরিবারে এতদিন ধরে আছো তবু আদবটা শেখো নি?

কি জওয়াব দেবে ঠিক করতে না পেরে শেখ আব্দুল্লাহ বললো, জি?

ঃ তোমার মুনিব কোথায়?

ঃ ভেতরেই আছে।

ঃ আছে কি? আছেন।

ঃ জি।

ঃ ডাকো তাকে।

ঃ তা ডাকছি। আপনারা মেহেরবানী করে এসে দহলিজে তশরীফ রাখুন।

সামনের দিকে ইঙ্গিত করে শেখ আব্দুল্লাহ রওনা হলো। খানিকটা ইতস্ততঃ করার পর আব্দুল্লাহকে অনুসরণ করেই ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে আফতাব খাঁ দহলীজে এলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। শেখ আব্দুল্লাহ বিনীত কণ্ঠে বললো, জনাবের পরিচয়টা মেহেরবানী করে জানালে–

আফতাব খাঁ রুষ্ট হলেন। বললেন, সেটা তোমার জানার জরুরত নেই। তোমার মনিবকে আগে এত্তেলা দাও।

ঃ জি– আচ্ছা।

শেখ আব্দুল্লাহ পা বাড়াতেই রান্নাঘরের নওকরকে দহলিজের দিকে আসতে দেখে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, এই শোনো। আলী আশরাফকে জলদি দহলিজে আসতে বলো।

নওকরটি অন্দরে গিয়ে কিনা কি পয়গাম দিলো। সাংঘাতিক কোন নাখোশ খবর মনে করে আলী আশরাফ ও লায়লা আকতার তলোয়ার হাতে দহলীজে ছুটে এলো। তাদের গা থেকে দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ছে।

আফতাব খাঁ আর তাঁর ছেলেমেয়েরা এদের এ অবস্থায় দেখে তাজ্জব বনে গেলো! আফতাব খাঁ খেয়াল করে দেখলেন, এই মেয়েই সেই মেয়ে যাকে সেদিন আলী আশরাফের পেছনে একই ঘোড়ায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। পরনে তার সালোয়ারের উপর লম্বা একটা কামিজ। ঘাড় পেঁচিয়ে ভাঁজ করা দোপাট্টা বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে ঝোলানো। সালোয়ার, কামিজ ও দোপাট্টার উপর দিয়ে আর একখানা ভাঁজ করা

দোপাট্টায় কোমরখানা বাঁধা। মাথার চুল উপরে তোলা। এক ফালি সফেদ বস্ত্রখন্ডে মুখমন্ডল বাদে গোটা মাথা আবৃত। আট ন' বছরের এই ছোট্ট বালিকা বীরাঙ্গনার বেশে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। হাতে তার নাঙ্গা তলোয়ার।

দহলিজে ছুটে এসে আলী আশরাফ হয়রান হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। মুহূর্তখানেক পরে উপবিষ্ট আফতাব খাঁদের দেখে সে সালাম দিয়ে মোসাফেহা করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো। আফতাব খাঁ বাল-বাচ্চা নিয়ে তার দহলিজে উপস্থিত দেখে ভেবে সে আর একদফা হয়রান হলো। আফতাব খাঁ হাত বাড়িয়ে মোসাফেহা করতে করতে বললেন, কি করছিলে এতক্ষণ?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, তলোয়ারের কসরত করছিলাম।

ঃ এ মেয়েটিও কি তাই করছিলো?

ঃ জি, হ্যাঁ।

আফতাব খাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো। তাঁর ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ তাজ্জব হয়ে সব কিছু অবলোকন করছিলো। এবার আকলিমা বেগম তার ওয়ালেদকে প্রশ্ন করলো, এ মেয়েটা কে আব্বু? ওর বহিন?

তাচ্ছিল্যের সাথে আফতাব খাঁ বললেন, আরে না। ঐ বস্তির একটা মামুলী লেড়কী।

ঃ বস্তির লেড়কী এখানে!

আকলিমার চোখে বিস্ময়! আফতাব খাঁ জওয়াব দেয়ার আগেই এবার আফজাল আলী সওয়াল করলো, একটা বস্তির লেড়কী সামনে এনে আলী আশরাফ লাড়াইয়ের কস্‌রত করে? খানদান ঘরের কোন কাউকে পায় না?

মওকা পেয়ে আফতাব খাঁ বললেন, আশেপাশে তো খানদান কেউ নেই।

তোমাদের এত করে বললাম আলী আশরাফের সাথে ফৌজী শিক্ষা করো। তোমরা তো আমল দিলেনা তাতে। এখন থেকে তোমরা যদি তাকে সঙ্গ দাও, তাহলে ঐসব বস্তির কোন ছেলে মেয়েকে পাত্তা দেয়ার তার আর কোন প্রয়োজনই পড়বে না – না কি বলো আশরাফ?

সমর্থনের জন্যে তিনি আশরাফের দিকে চাইলেন। লায়লা আকতার এ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অন্দরের দিকে চলে গেল। আশরাফ কোন সমর্থন না দিয়ে নাখোশ দীলে দাঁড়িয়ে রইলো। আকলিমা বেগম বললো, কে ওকে তালিম দেয়? ঐ আশরাফ? ভাইয়া ঐ আশরাফের কাছে তালিম নিতে আসবে?

আফতাব খাঁ বললেন, শুধু তোমার ভাইয়া নয়, এখন থেকে তুমিও আসবে।

এরপর তিনি আশরাফকে বললেন, তোমার এই মকানে কে তোমাদের ফৌজী শিক্ষার তালিম দেন? এখানে তোমাদের উস্তাদ কে?

আলী আশরাফ ধীর কণ্ঠে বললো, আমার আব্দুল্লাহ চাচা। আফতাব খাঁ লাফিয়ে

উঠলেন, অবাক হয়ে বললেন, এ্যাঁ! তোমার চাচা! সেকি! তোমার কোন চাচা আছে নাকি?

ঃ জি , আছেন। তিনিই আমার ওয়ালী আর এই ফৌজী শিক্ষার তিনিই আমার পয়লা উস্তাদ।

ঃ সে কি! ডাকো তাঁকে। তাঁকে আমার ছালাম দাও।

ঃ উনি তো এখানেই আছেন।ঐ তো আমার চাচা!

আলী আশরাফ আব্দুল্লাহকে দেখিয়ে দিলো। ছেলেমেয়ে সহকারে আফতাব খাঁ বেয়াকুফ বনে গেলেন। অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন, তোমার চাচা মানে? ওতো শুনলাম নওকর!

আলী আশরাফ শরমিন্দা হয়ে বললো, ছিঃ! ও কথা বলবেন না। উনি আমার মুরুব্বী।

আফতাব খাঁ জোর দিয়ে বললেন, ও নিজেই তো বললো – ও তোমাদের নওকর?

ঃ নওকর হলেও আব্বার নওকর। আমার নওকর নন। উনি আমার উস্তাদ।

আফতাব খাঁ ভেবে হয়রান হতে লাগলেন। তুচ্ছ একজন নওকর ফৌজী শিক্ষার উস্তাদ! কি তাজ্জব কথা! বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, উনি তাহলে ফৌজী লোক? মানে উনি একজন যোদ্ধা?

ঃ মস্ত বড় যোদ্ধা!

ঃ তাহলে কোন ফৌজে যোগ না দিয়ে উনি মকানে নকরী করেন কেন?

ঃ ঠিক নকরী নয়, উনি আমার আব্বার রিস্তেদার। তাঁর সঙ্গী। অনেক আগে থেকেই উনি এ বাড়ীর সবকিছু দেখাশুনা করেন।

ঃ ও, তাই বলো!

এবার আফতাব খাঁ উঠে গিয়ে আব্দুল্লাহর সাথে মোসাফেহা করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বুঝে দেখলেন, এদের চালচলনই এই রকম। এখানে কট্টর খানদানী মতবাদ নিয়ে থাকলে মোকসুদ হাসিল হবে না। দিন এলে এসব আবর্জনা অনায়াসেই সাফা করা যাবে।

আব্দুল্লাহর সাথে মোসাফেহা করতে করতে আফতাব খাঁ হাসি মুখে বললেন, তা ভাই সাহেব, কিছু মনে করবেন না। পয়চান করার গোলমালে দুটো বদজবান বলেছি।

শেখ আব্দুল্লাহ সাদা দীলের মানুষ। এতেই সে খুশী হয়ে বললো, না - না, তাতে কি আছে? এবার আপনার পরিচয়টা পেলে –

ঃ ও, আমি? আমি এই জৌনপুরের একজন বিশিষ্ট সালার। সুলতানে আলা আমাকে সবার চেয়ে জিয়াদা ইয্যত দেন।

ঃ মারহাবা! মারহাবা!

ঃ এই আলী আশরাফের আব্বার সাথেও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। উনি আমার দোস্ত্ ছিলেন।

ঃ তাই নাকি! এতো তাহলে মস্তবড় খোশ খবর।

ঃ হ্যাঁ, খোশ খবর তো বটেই। তাই ভাবলাম দোস্ত্লোকের ঘর সংসারের খোঁজ খবর নেয়াটা একটা ফরজ কাজ। আলী আশরাফকে আগে থেকেই চিনতাম। দেখাও ওর সাথে মাঝে মধ্যে হয়। ওর ভালাইয়ের জন্যেই দু' একটা কটুকথা বলে থাকি বটে, কিন্তু দীল থেকে ওকে তো আর কম মুহব্বত করিনে! এতদিন ফুরসুত পাইনি। আজ ভাবলাম, যাই, একটু দেখা সাক্ষাৎ করে আসি।

আলী আশরাফ এই লোকটার চরিত্র দেখে একের পর এক অবাকই হয়ে চলেছে। আজ আবার এ কোন্ মূর্তি তার। তা ঠাহর করতে না পেরে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। শেখ আব্দুল্লাহ এঁর স্বরূপ আগে কখনও দেখেনি। তাই সে গদগদ হয়ে বললো, আপনার অশেষ মেহেরবানী। ও একটা এতিম। আপনার মতো মুরুব্বীদের নেক নজর ওর জন্যে বিশেষ একটা রহমত।

ঃ আমার নেক নজর হামেশাই ওর উপর আছে। সেই সাথে ওর ভালাই-এর জন্যে আমার কিছু নসিহৎও আছে। এত বড় খানদান ঘরের সন্তান ও। কিছু উঁচু নীচু বাছ বিচার করে চলাটা ওর উচিত।

ঃ তা - মানে –

ঃ আমার ছেলেমেয়েরা এখন থেকে এখানেই ফৌজী শিক্ষায় তালিম নিতে আসবে। এদের সাথেই আলী আশরাফ ঘনিষ্ঠতা করুক, চলাফেরা করুক, এই আমার নসিহৎ। ওসব ছোটজাতের সংস্রব ওকে আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে।

আব্দুল্লাহ কি জওয়াব দেবে ভাবছিলো। আফতাব খাঁ ফের বললো, এবার বলুন, একটু তকলিফ করে আমার ছেলেমেয়েদের আপনি তালিম দিতে রাজী আছেন কিনা?

ঃ জরুর, জরুর। এতে আর তকলিফ কি? আপনি এদের পাঠিয়ে দেবেন। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ঃ আর একটা কথা আছে তাহলে। আমার ছেলেমেয়েদের কিন্তু ইয্যত জ্ঞানটা একটু বেশী। আলী আশরাফ ছাড়া ঐ বস্তির বালবাচ্চাদের সাথে মিশিয়ে যেন তালিম দেবেন না তাদের!

শেখ আবদুল্লাহ এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললো, জি আচ্ছা, জি আচ্ছা।

অতঃপর সে মেহমানদারিতে মনোনিবেশ করলো।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতামাতার চাপে পড়ে পরের দিন থেকেই আফজাল আলী ও আকলিমা বেগম আব্দুল্লাহর কাছে তালিম নিতে আসতে লাগলো। তালিম নিতে

তাদের যতখানি আগ্রহ তার চেয়ে শত গুণে বেশী আগ্রহ লেবাস দেখিয়ে বেড়ানোতে আর খোশগল্প ও খেলাধূলায় কাল কাটিয়ে দিতে। পয়লা পয়লা শেখ আব্দুল্লাহ এদের পেছনে চরম কোশেশ করলো। কিন্তু এদের একান্ত অনাগ্রহের দরুন শেষ অবধি সে খামোশ হতে বাধ্য হলো। লায়লা আকতার এলে তাকে লা-পাত্তা করার জন্যে এরা আব্দুল্লাহর কাছে ছুটে আসতো। আব্দুল্লাহ এদের আলাদা করে নিয়ে তালিম দেয়া শুরু করতো। কিন্তু এরাই আবার রণভঙ্গ দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে পড়তো।

লায়লা আকতারকে তালিম দিতো আলী আশরাফ নিজে। উস্তাদ বুরহানউদ্দীনের কাছে সে যেসব কৌশল শিখতো তার প্রতিটারই কিছু-কিঞ্চিৎ লায়লা আকতারকে শেখাতো। নিজেদের খন্নাসপনার কারণে আফতাব খাঁর ছেলেমেয়েরা আলী আশরাফের কোনদিনই আপন হতে পারেনি। এর মধ্যে আফতাব খাঁ কয়েকবার আলী আশরাফকে তাঁর মকান পর্যন্ত টেনেছেন। কিন্তু দীলের দরদ না থাকায় বাহ্যিক দরদ দিয়ে আলী আশরাফের মতো ছেলের দীলে দাগ কাটতে পারেন নি।

তিন

দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস করে একে একে আট ন'টি বছর অতিবাহিত হলো। লায়লা আকতার এখন পুরোপুরি বালেগা। তার খুবসুরত এখন জৌনপুরের যে কোন আউরাতের ঈর্ষার বস্তু হয়েছে। সে আর এখন আলী আশরাফের সামনাসামনি আসেনা। দেয়াল-পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে। চালচলনে আর কথাবার্তায় উভয়েই এখন অত্যন্ত সংযমী হয়ে উঠেছে। বিশেষ জরুরী ছাড়া কেউ কারো সংস্পর্শে খুব একটা আসে না।

আলী আশরাফ ইতিমধ্যেই খানকাহ শরীফের সর্বোচ্চ এলেম হাসিল করে ফেলেছে। হাসিল করেছে উস্তাদ বুরহানউদ্দীন খান সাহেবের তামাম ফৌজী কৌশল। রণবিদ্যায় আরো এলেম হাসিল করার দুর্বার তার খাহেশ। একথা সে শুভাকাঙ্ক্ষী ময়মুরুব্বীর কাছে জানান দিয়ে রেখেছে।

আলী আশরাফের হাতে এখন অনন্ত অবসর। সময় যেন তার আর কাটেনা। এমনই সময় একদিন উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব আলী আশরাফকে তলব করলেন। আশরাফ এসে খানকাহ শরীফে পৌঁছলে নিয়ামতুল্লাহ সাহেব তাকে মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেবের খাশ কামরায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন নবাগত সুফী

সাহেব উপবিষ্ট ছিলেন। আলী আশরাফ কামরায় ঢুকে সবার সাথে মোসাফাহা করলো। বলখী সাহেবকে আজ অপেক্ষাকৃত আনমনা দেখাচ্ছিলো। মোসাফেহার পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আলী আশরাফ, তোমাকে আজ আমি একটা জরুরী কাজের জন্যে ডেকেছি।

আলী আশরাফ মুখ তুলে বললো, হুকুম করুন হুজুর!

নবাগত সুফী সাহেবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলখী সাহেব বললেন, ইনি এই জৌনপুরেরই বিখ্যাত এক আলেম, বুজুর্গ আর পরহেজগার ব্যক্তি। এতদিন ইনি পাণ্ডুয়ার শায়খ আলাউল হক সাহেবের খানকাহ মোবারকে ছিলেন। শায়খ আলাউল হক সাহেবের পুত্র হযরত নূর কুতুব-ই-আলমের ইনি সহপাঠী। এঁর নাম মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী। এখন থেকে ইনিই এই খানকাহ শরীফ দেখাশুনা করবেন।

আলী আশরাফ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আর আপনি?

বলখী সাহেব বললেন, আমার হুজুর হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী সাহেব আমাকে বিহারের মনের শরীফে তলব করেছেন। আমাকে ওখানকার খানকাহ শরীফের দায়িত্ব নিতে হবে।

ঃ এখন থেকে তাহলে আপনি বিহারেই থাকবেন?

ঃ হ্যাঁ। তুমি ফৌজী শিক্ষার জন্যে বিহারে যাবার ইরাদার কথা বলেছিলে, এইটেই সেই মওকা। ওখানকার নামকরা তামাম ফৌজী উস্তাদ আমার পরিচিত। আমাদের সাথে ওখানে কিছুদিন থাকলে তোমার সে ইরাদা সহজেই হাসিল হতে পারে।

ঃ হুজুর!

ঃ আজ আমি অবশ্য আমার নিজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। ওখানকার সবকিছু গুছিয়ে-গাচিয়ে নেয়ার জন্যে তোমার মদদ আমার প্রয়োজন। তুমি ইচ্ছে করলে কয়দিন পরই ফিরে আসতে পারো।

আলী আশরাফ উৎসাহের সাথে বললো, না, এ মওকা আমি বরবাদ হতে দেবো না। আপনার সাথে বিহারেই আমি যাবো এবং আপনার সাথে ওখানেই থেকে ফৌজী এলেম হাসিল করবো। হুকুম করুন, কবে নাগাদ রওনা হতে হবে?

ঃ হাতে মোটেই সময় নেই। আমি আগামীকালই রওনা হবো। তোমার যদি একান্ত তকলিফ না হয়, উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের সাথে তুমি আগামী পরশুই চলে এসো। তোমার আসতে দেরী করলে আমাকে বহুত পেরেশান হতে হবে। প্রাথমিক কাজগুলো সামাল দিতে তোমাদের মদদ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ঃ আমি তৈয়ার হুজুর।

ঃ তোমার খুব তকলিফ হবে না তো? তা হলে আমি আলাদা ব্যবস্থা –

ঃ না হুজুর। আমার কোনই তকলিফ হবো না। ইনশা আল্লাহ আমি আগামী পরশুই রওনা হবো।

ঘরে ফিরে আলী আশরাফ তার ইরাদার কথা আব্দুল্লাহকে জানালো এবং একদিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো। সংসারের দায়-দায়িত্ব আব্দুল্লাহর হাতেই ছিল। এখনও তার হাতেই রইলো। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আলী আশরাফ লায়লা আকতারের মকানে এসে হাজির হলো। তার ইরাদার কথা শুনে লায়লা আকতারের আম্মা পেরেশান হয়ে পড়লেন। তাঁকে সমঝিয়ে নিতে আলী আশরাফকে অনেকখানি বেগ পেতে হলো।

পর্দার আড়ালে দণ্ডায়মান লায়লা আকতার এই খবর শুনে খামোশ হয়ে গেলো। প্রথমদিকে সে কোন কথাই বললো না। বিদায়ের মুহূর্তে সে কান্নাভেজা কণ্ঠে কোনমতে বললো, কতদিন ওখানে থাকবেন?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, খুব সম্ভব বছর খানেক। তবে মওকা পেলেই মাঝে মধ্যে চলে আসবো।

আবার কিছুক্ষণ লায়লা আকতার নীরব। অতঃপর বললো, আল্লাহতায়ালা আপনাকে হেফাজত করুন!

এরপর আর কোন কথাই পর্দার ওপার থেকে এলো না। কান্নায় লায়লা আকতারের কণ্ঠ তখন একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। বিহারে যাবার আনন্দে আলী আশরাফের দীল এযাবত সপ্তমার্গে ছিলো। এবার সেটা সড়াৎ করে কয়েক মার্গ নীচে নেমে এলো।

* * *

এক বছরের জায়গায় আলী আশরাফের দুই বছর লেগে গেলো। সেরেফ বিহারেই সে থাকেনি। ফৌজী শিক্ষার তাকিদে তাকে আরো অনেক দূরে থাতে হয়েছে। ফলে এই দুই বছরের মধ্যে সে একবারও জৌনপুরে ফিরে আসার ফুরসৎ করতে পারেনি। ফৌজী শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা হাসিল করে দুই বছর পর সে যখন জৌনপুরে কায়েমীভাবে ফিরে এলো, তখন এদিককার অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।

তার নিজের মকানে একজন নওকর বদল হওয়া ছাড়া তেমন কোন বিপর্যয় ঘটেনি। কিন্তু বিপর্যয় এসেছে লায়লা আকতারের মকানে। বৃদ্ধ সগীর খাঁ ইন্তেকাল করেছেন। তার চেয়েও মর্মান্তিক, লায়লা আকতার আর তার আম্মাকে লুটেরারা লুটে নিয়ে গেছে। আলী আশরাফ সেখানে গিয়ে দেখলো খাঁ খাঁ করছে খালি বাড়ী। শেখ আব্দুল্লাহ সখেদে জানালো, সগীর খাঁর মৃত্যুর পর লুটেরাদের উৎপাত দিন দিন বেড়ে যায়। হঠাৎ এক সাঁঝ রাতে আঁধি উঠে। বেপরোয়া ধূলোর ঝড় বইতে থাকে। সেই ফাঁকে একদল লুটেরা এসে লায়লা আকতারদের মকানে হামলা চালায়। সেই সময় আসে পাশের কোন মকানে জোয়ান কেউ উপস্থিত ছিল না। মেয়েছেলেরা ভয়েই কেউ বেরোয়নি।

অনেকক্ষণ লুটপাটের পর গোলমাল থেমে গেলে সবাই এসে দেখে ঘরের জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে, নেই শুধু লায়লা আকতার আর তার আম্মা। খবর পেয়েই আব্দুল্লাহরা ছুটে যায়। সবাই মিলে চতুর্দিকে পঁই পঁই তালাশ করে এবং তার পর পর কয়েকদিন জৌনপুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তল্লাশি চালায়। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

আলী আশরাফের সামনে তামাম দুনিয়াটা একদিনেই অর্থহীন হয়ে গেল। এতিম আলী আশরাফের জিন্দেগীর আকর্ষণ বিক্ষিপ্ত। তার বাল্যকাল কেটেছে শেখ আব্দুল্লাহর আদর সোহাগকে অবলম্বন করে। তার কৈশোর কেটেছে শুভাকাঙ্খী ও শিক্ষকদের তারিফ আর স্নেহপ্রীতিকে ঘিরে। যৌবনের পদধ্বনির আগেই তার জীবনে এসে জুটেছে লায়লা আকতার। আলী আশরাফের পরবর্তী জিন্দেগীর তামাম আকর্ষণ লায়লা আকতারের মধ্যেই দিনে দিনে গড়ে তুলেছে আখেরী মনযিল। সেই লায়লা আকতারের অভাবে আজ তার জিন্দেগীটা হালভাঙ্গা কিস্তির মতোই তালকানা হয়ে গেছে ঃ তার শিক্ষা-দীক্ষা পরিশ্রম অর্থহীন হয়ে গেছে। মাওলানা বলখী সাহেব বিহারে– উস্তাদ নিয়ামতুল্লাহও সেখানে – সগীর খাঁ মৃত – লায়লা আকতার অপহৃতা। গোটা জৌনপুরটাই এই দুই বছরে অপর হয়ে গেছে!

কয়েকদিন উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করার পর আলী আশরাফ ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলো। সে আর এখন বেরোয়ই না ঘর থেকে। ফৌজী শিক্ষায় তার অসাধারণ কৃতিত্বের খবর পেয়ে জৌনপুরে সুলতান খাজা জাহান তাকে তারিফ করে সনদ পাঠিয়ে দিলেন। জৌনপুরের ফৌজে এক উঁচু পদে তাকে নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে আলী আশরাফ তা সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রেখে দিলো। ধরা বাঁধা জীবন এখন অসহ্য তার কাছে। জীবনের ছকেঢালা আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার উম্মিদে তার দীল এখন হামেশাই উন্মুখ।

বাংলা মুলুক এই সময় এই মুক্তির পয়গামসহ হাতছানি দিলো আশরাফকে। বাংলা মুলুকে মুসলমানদের হুকুমাতের এখন চরম দুর্দিন। এ দুর্দিন একদিনে আসেনি। লক্ষ্মণ সেনের হাত থেকে বাংলা মুলুকের আধিপত্য মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকেই বাংলার হিন্দুকুল নিদারুণ অন্তর্দাহে দগ্ধিভূত হচ্ছিলো। এটাকে এরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। অনন্যোপায় হয়ে তারা মাথা গুঁজে থেকেছে। অনেক হিন্দু ব্যক্তি সুলতানের অধীনে নকরী গ্রহণ করেছে। প্রথম দিকে এদের অনেকেই নিষ্ঠার সাথে মুসলমান হুকুমাতের খেদমতও করেছে। কিন্তু দিনে দিনে যতই তারা উচ্চপদে গেছে, তাদের মনে অতীত বেদনা ততই প্রকট হয়ে উঠেছে। বদলা নেয়ার খেয়াল ততই দানা বেঁধে উঠেছে।

এতে আবার ইন্ধনও এসে জুটেছে। মুসলমান আমীর-উমরাহের স্বার্থপরতা, গাদ্দারী আর হীনমন্যতা এদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছে। সামান্যতম স্বার্থহানির রোষে অনেক পদস্থ মুসলমান আমীর, উমরাহ আর সালারেরা মুসলমানদের হুকুমাত নিয়ে

সওদাবাজি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কওমের ইয্যত আর আজাদ-ভুমির প্রতি তাদের দীলে কিছুমাত্র অনুকম্পা না থাকায় তারা হিন্দুদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং পক্ষান্তরে হিন্দুদের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাণ্ডুয়ার বর্তমান সুলতানের দরবার এখন এমনই এক ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। সুলতানের উদারতা, হেরেমের ষড়যন্ত্র আর উমারাহ্দের গাদ্দারীর কারণে পাণ্ডুয়ার মুসলমান হুকুমাতের অস্তিত্ব এখন চরম হুকমির সম্মুখীন। সুলতান হাজী ইলিয়াস শাহের আমলে ও তদীয় পুত্র সিকান্দার শাহর শাসনের প্রথম দিকে যে সমস্ত হিন্দু অমাত্য একান্ত বাধ্যগত থেকে হুকুমাতের খেদমত করে গেছে দিনে দিনে উচ্চপদ পেয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহর আমলে এখন তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এদের পুরভাগে আছেন দরবারের বিশিষ্ট উমরাহ রাজা গণেশ। ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ পাণ্ডুয়ার দরবারে উমরাহ হয়ে ঢোকার পর থেকেই তাল ঠুকেছিলেন। ক্রমে ক্রমে অধিক ক্ষমতা পেয়ে এবং হেরেম ও দরবারের বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে তিনি নেপথ্য থেকে দিনে দিনে জাল বিছিয়ে গেছেন। সে জাল এখন গুটিয়ে নেয়ার পালা। উচ্চপদস্থ হিন্দু উমরাহ পর্দার আড়ালে থেকে ইদানীং তাদের তৎপরতা অত্যন্ত জোরদার করে তুলেছে। স্বার্থপর ও বেয়াকুফ মুসলমান উমরাহদের তারা কাজে লাগিয়ে নিজেদের করণীয় তাদের দিয়েই হাসিল করে নিচ্ছে। মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেব হিন্দু কর্মচারীদের ব্যাপক হারে উচ্চপদ না দেয়ার ব্যাপারে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে পুনঃপুন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু স্বভাবগত উদারতায় গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তা উপেক্ষা করে গেছেন। কবিতা-সাহিত্য আর আসর-মজলীসের মাধ্যমে সস্তা বাহবা কুড়ানোর নেশায় তিনি এখন দিওয়ানা হয়ে আছেন।

ক'দিন আগে মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেব একখানা খত পেলেন। পাণ্ডুয়ার এই দুর্দিন লক্ষ্য করে হযরত নূর-কুতুব-ই-আলম বলখী সাহেবকে দুঃখ করে এই সুদীর্ঘ খত লিখেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পাণ্ডুয়ায় ঈমানদার ফৌজের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। যে কয়জন মুসলমান উমরাহ এই পতনোন্মুখ হুকুমাতকে ধরে রাখার কোশেশ করছেন, উপযুক্ত ফৌজী মদদ না পাওয়ায় তাঁরা সুবিধে করতে পারছেন না। সবচেয়ে আরো যা আফসোসের তা হলো সুলতানের অনিচ্ছা আর উদাসীনতার দরুন বাইরের কোন মুসলমান হুকুমাত থেকে মদদ আসা সম্ভবপর হচ্ছে না। এদিকে আবার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শাহজাদা শাহাবউদ্দীন আজম শাহর সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ দীর্ঘদিন যাবত এক আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। ফয়সালা করার জন্যে হযরত নূর কুতুব-ই-আলম যথেষ্ট তদবির করছেন। কামিয়াব হবেন কিনা, তা তিনি জানেন না। হযরত নূর কুতুব-ই-আলম অনুরূপ একটি খত জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহানকেও লিখেছেন।

খত পড়ে কি জানি কি ভেবে বলখী সাহেব আলী আশরাফকে তলব দিলেন। তলব পেয়ে আলী আশরাফ বিহারে এসে হাজির হলে বলখী সাহেব বাংলা মুলুকের অবস্থা

সবিস্তারে তার কাছে বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আলী আশরাফ, ব্যক্তিগত উন্নতি আর সুখ-শান্তি হাসিলের চেয়ে কওমের ইয্যত আর স্বদেশের আজাদী হেফাজত করা ঢের ঢের বড় কাজ। তোমার স্বদেশ বাংলা মুলুকের মুসলমান হুকুমাত এখন চরম সংকটের সম্মুখীন। আমি আশা করবো, তোমার অর্জিত বিদ্যা তুমি কওম ও স্বদেশের খেদমতে প্রয়োগ করবে।

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, হযরত, ওখানকার যা পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন আপনি, তাতে একা আমি কতটুকু কি করতে পারি?

ঃ তা অবশ্য ঠিক, তবু তোমার যতখানি সাধ্য, দেশ আর কওমের খেদমতে তোমার তা করা উচিত। এতে কামিয়াব তুমি হও না হও, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আলী আশরাফ বললো, জৌনপুরের সুলতানে আলা তাঁর ফৌজে যোগ দেয়ার দাওয়াত আগেই আমাকে দিয়ে রেখেছেন। এটা আমি উপেক্ষা করি কি করে? তাঁর কাছে আমার এ জিন্দেগীর ঋণ তো বড় কম নয়?

ঃ একথাও সত্যি। কিন্তু সুলতান নিজে তাঁর সে মত পরিবর্তন করেছেন। বাংলা মুলুকের খবর তিনিও পেয়েছেন যেহেতু পাণ্ডুয়ার সুলতান তাঁর দোস্ত লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন উপদেশ বা মদদ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পাণ্ডুয়ার সুলতান নিচ্ছেন না, সেহেতু সুলতান খাজা জাহানের ইচ্ছা, তুমি পাণ্ডুয়ার ফৌজে গিয়ে যোগ দাও এবং কওমী হুকুমাত ও স্বদেশের জন্যে যথাসাধ্য করো।

একটা স্বাভাবিক অভিমানে আলী আশরাফের দীল ভারাক্রান্ত হলো। সে দুঃখ করে বললো, স্বদেশের খেদমত আমার আব্বাও তো করেছিলেন। জিন্দেগীভর করতে তা চেয়েও ছিলেন। কিন্তু তার সাদা দীলে দাগা দিয়ে যে স্বদেশ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, সে স্বদেশের জন্যে কি কর্তব্য থাকতে পারে আমার?

বলখী সাহেব আশরাফের চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, এইখানেই ভুল তোমার। স্বদেশ তোমার আব্বাকে পরিত্যাগ করেনি। তাঁকে দেশছাড়া করেছে এক স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত। সেই চক্রান্তই এখন তোমার স্বদেশের আজাদীও বিপন্ন করে তুলেছে। এমন একটা চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদ করা যোগ্যপিতার যোগ্য সন্তানের পক্ষে শুধু কর্তব্যই নয়, তার জন্যে ফর্‌য্‌!

আলী আশরাফ খামোশ্ হয়ে গেল। হতবুদ্ধি অবস্থায় সে বললো, হুজুর!

বলখী সাহেব তাঁর বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে বললেন, তোমার আব্বার প্রতি অবিচার যারা করেছে, তার বদলা তুমি নেবে না? কওমের আখেরাত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের মোকাবেলা করবে না?

আলী আমরাফের শিরায় শিরায় আগুন ধরে গেলো। তার বর্তমান মানসিক অবস্থার

প্রেক্ষিতে এমন কাজই কাম্য ছিলো তার। এমন একটা কাজই সে অনুসন্ধান করছিলো। তার উপর এই কাজটা তার একান্ত কর্তব্য বলে উপলব্ধি করায় আলী আশরাফ শির উঁচু করে স্ফীতবক্ষে বললো, হুজুর, আমি তৈয়ার!

* * *

জৌনপুরে ফিরে এসে আব্দুল্লাহকে একথা বলতেই শেখ আব্দুল্লাহ উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো। বললো, আল্ হামদুলিল্লাহ। বেটা, এতদিনে একটা কাজের মতো কাজে তুমি লাগছো। আমার দীলে এ আকাঙক্ষা দীর্ঘদিন ধরে মাথা কুটে মরছে। ফৌজী বিদ্যায় যতই তুমি পারদর্শী হচ্ছিলে, আল্লাহ তায়ালার কাছে ততই আমি এন্‌তার আরজ করে গেছি। বলেছি, আল্লাহ! আলী আশরাফের পিতার সাথে দুশমনি যারা করেছে আলী আশরাফের তলোয়ার যেন সবার আগে তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে! আল্লাহ তায়ালা আমার সে আবেদন মনযুর করেছেন।

শেখ আব্দুল্লাহর উৎসাহ দেখে আলী আশরাফের দীল খুশীতে ভরে উঠলো। তার আশংকা ছিল, শেখ আব্দুল্লাহ তার ইরাদার কথা শুনে ভয়ানক নাখোশ হবে এবং তার যাত্রাপথে বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু উল্টো তার উল্লাস দেখে আলী আশরাফ বিহ্বল কণ্ঠে বললো, চাচা!

ঃ তুমি যাও বেটা! আমি প্রাণ ঢেলে দোয়া করছি।

আলী আশরাফের ওয়ালেদ আলী আসগার সাহেব যে পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের অবিচারের জন্যে পাণ্ডুয়া ছেড়ে জৌনপুরে আসেন- এটুকুই আলী আশরাফ জানতো। তার ওয়ালেদ পাণ্ডুয়ার কি খেদমত করেছিলেন, বা সেই চক্রান্তের স্বরূপ কি ছিল– এসবের কোন কিছুই সে জানতো না। সেই হুকুমাতের খেদমতে এবং সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেহাদে যাত্রা করার আগে আলী আশরাফ এসব বিষয় বিস্তারিত জানার তাকিদ বোধ করলো।

সে আব্দুল্লাহকে বললো, আচ্ছা চাচা, তুমিতো সব সময়ই আব্বার সাথে ছিলে। পাণ্ডুয়ার খেদমতে তিনি কি শ্রম দিয়েছেন, কি পরিস্থিতিতে পড়ে তিনি পাণ্ডুয়া ছেড়ে এসেছেন – এর সবই তো তুমি জানো?

শেখ আব্দুল্লাহর দুই চোখ দপ-দপ করে জ্বলে উঠলো। বললো, জানি মানে? আমি খুঁটিনাটি তামাম খবর জানি। আমার তখন কাঁচা বয়স। তোমার আব্বা যখন সুলতান সিকান্দার শাহর বাহিনীতে যোগ দেন তখন ঐ কাহিনীতেই আমিও তাঁর সাথে কাজ করি। সব আমার দেখা, সব আমার জানা।

ঃ তুমি কি সে সব কথা শোনতে পারো আমাকে?

ঃ পারি। তবে সে এক মস্ত বড় দস্তান। বলতে অনেক সময় লাগবে।

ঃ তবু আমি শুনতে চাই।

ঃ বেশ। আজ বাদ-এশা তুমি তোমার ঘরে থেকো। নিরিবিলিতে সব কথা বলবো।

এশার নামাযের পর শেখ আব্দুল্লাহ যে কাহিনী বর্ণনা করে শুনালো, তা বাংলার ইলিয়াস শাহী সাল্‌তানাতের একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে তেমনই নেক্কারীর ইতিহাস ঃ

ঈসায়ী ১৩৫৮ সনের আর ক'দিন মাত্র বাকী। সুলতান হাজী ইলিয়াস শাহের ইন্তেকালের পর তদীয়পুত্র সিকান্দার শাহ পাণ্ডুয়ার তক্‌তে উপবিষ্ট। আমির উমরাহদের নিয়ে সুলতান সিকান্দার শাহ খোশ আলাপে রত ছিলেন। এমন সময় দূত এসে এক অত্যন্ত নাখোশ খবর পেশ করলো। সে সরাসরি মসনদের সামনে এসে কুর্নিশ করে বললো, খোদাবন্দ, আমার বড় বদনসীব যে, এক ভয়ানক দুঃসংবাদ আমাকে হুজুরের কাছে পেশ করতে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে খোশ আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সুলতান সিকান্দার শাহ দূতের উপর তীর্যক নজর ফেলে সওয়াল করলেন, দুঃসংবাদ! বলো কি সে দুঃসংবাদ?

দূত বললো, দিল্লীর সুলতান ফিরুয শাহ তোঘলক এক বিপুল বাহিনী নিয়ে বাংলা মুলুকের দিকে আবার এগিয়ে আসছেন।

ঃ বাংলা মুলুকের দিকে!

ঃ তাঁর লক্ষ্য পাণ্ডুয়া।

ঃ পাণ্ডুয়া!

সুলতানের মুখমণ্ডল দুশ্চিন্তার কালো পর্দায় আবৃত হলো। সভাসদদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। দরবারটা তামামই থম থম করতে লাগলো। সুলতান ফের প্রশ্ন করলেন, তোমার খবর সম্বন্ধে তুমি কি নিশ্চিত?

দূত বললো, বিলকুল নিশ্চিত জাঁহাপনা! দিল্লীর বাহিনী কুশী নদী পার হয়েছে। তারা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

ঃ তাদের সৈন্য সংখ্যা কত?

ঃ সীমান্ত এলাকার গুপ্তচরের একটা দল দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে এইমাত্র ফিরেছে। তাদের শুমার মতে সুলতান ফিরুয শাহর সাথে আছে সত্তর হাজার অশ্বারোহী ফৌজ, চারশত উপরে হস্তির এক বাহিনী এবং লাখের অধিক পদাতিক সৈন্য।

সুলতান সিকান্দার শাহ নীরব হয়ে গেলেন। আমীর-উমরাহ-সালাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। পাণ্ডুয়ার শক্তি এই বিপুল বাহিনীর সামনে খড়- কুটার চেয়েও অসহায়। কারো মুখে কথা নেই। যেন জবান ফুরিয়ে গেছে সকলের। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সুলতান সভাসদদের প্রশ্ন করলেন, এবার বলুন, কি আমাদের কর্তব্য?

সৈন্যাধক্ষ মধু খাঁ বললেন, কালবিলম্ব না করে আমাদের এখনই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়া উচিত। ফিরুয শাহর গতি, পথের মধ্যেই রোধ করা উচিত।

প্রবীণ সালার আব্দুল আজিজ বললেন, তাহলে আর আমাদের একটা সিপাইও পাণ্ডুয়ায় জিন্দা ফিরে আসবে না।

তরুণ উমরাহ রাজা গণেশ এর প্রতিবাদ করে বললেন, দিল্লীর ফৌজ নির্বিবাদে পাণ্ডুয়ায় এসে পৌঁছলেই কি জিন্দা থাকবে কেউ?

আব্দুল আজিজ বললেন, সেটা বিতর্কিত ব্যাপার। কিন্তু সীমিত শক্তি নিয়ে দিল্লীর ঐ বিশাল বাহিনীর সামনে খোলা ময়দানে দাঁড়ানোর অর্থই আত্মহত্যা। যে মওকা না পেয়ে দিল্লীর সুলতান পয়লা এসে আমাদের বাগে আনতে পারেন নি– ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন, সেই মওকা সেধে আমরা দিতে পারিনে তাঁকে।

উজির মিয়া মোস্তাক বললেন, আমার বিশ্বাস, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার ইরাদায় তিনি এবার আসছেন না। কাজেই আমাদের চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনা দরকার।

সুলতান বললেন, অর্থাৎ?

মিয়া মোস্তাক বললেন, উপযুক্ত সওগাত আর সেলামী নিয়ে গিয়ে সুলতানকে অনুরোধ করলে তিনি হয়তো পথ থেকে ফিরে যেতেও পারেন।

সুলতান সিকান্দার শাহর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। ঠিক এই সময়ে দিল্লীর দূত হয়বত খাঁকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন, সহকারী সালার আলী আসগর। সুলতানকে কুর্নিশ করে তিনি মিয়া মোস্তাককে বললেন, তার অর্থ বাংলার আযাদী বিকিয়ে দেয়া। এই যদি ইরাদা হয় সকলের, তাহলে সেরেফ আফসোস করা ছাড়া বলার কিছু নেই।

মিয়া মোস্তাক বললেন, কি বলতে চান আপনি?

আলী আসগার বললেন, দিল্লীর সুলতান সওগাত চান না, কর চান। সেই মর্মেই পত্র দিয়ে দূত প্রেরণ করেছেন।

আলী আসগার হয়বত খাঁর দিকে ইঙ্গিত করলেন। সুলতান সেদিকে তীক্ষ্ণ নজরে চাইতেই হয়বত খাঁ কুর্নিশ করে বিনীত কণ্ঠে বললেন, জি হাঁ হুজুর। আমার সুলতানে আলা পাণ্ডুয়ার হুজুরে আলাকে জানিয়েছেন, বার্ষিক কর প্রদান সাপেক্ষে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি আর পাণ্ডুয়া আক্রমণ করবেন না অকারণে স্বজাতির রক্ত ঝরাতে তিনি চান না। এই সেই খত –

হয়বত খাঁ পত্রখানা বাড়িয়ে ধরলেন। সুলতান সিকান্দার শাহর দুই চোখে তামাম দুনিয়ার আগুন এসে জমা হলো। তবু তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন, সে বিবেচনা তাঁর থাকলে তাঁকে পথ থেকেই ফিরে যেতে বলো। কর যদি দিতে হয় মহাপরাক্রম মরহুম হাজী ইলিয়াস শাহের আওলাদ সে কর তলোয়ারের মুখেই দেবে। তুমি তোমার খত নিয়ে যেতে পারো।

কুর্নিশ করে হয়বত খাঁ বেরিয়ে গেলেন। দরবারটা আবার নীরব হয়ে গেলো। নিজেকে সংযত করতে সুলতানের সময় লাগলো। এরপর সুলতান আলী আসগারকে প্রশ্ন করলেন, আলী আসগার দিল্লীর ফৌজের অবস্থান সম্পর্কে তোমার কোন

ধারণা আছে?

জওয়াবে আলী আসগার বললো, জি আছে জাঁহাপনা! দিল্লীর ফৌজ এখন কুশী নদীর এপারে। পূর্বের পথ পরিহার করে এবার তারা সোজা আসার চেষ্টা করছে। সঙ্গে আছেন সোনার গাঁয়ের ভূতপূর্ব অধিপতি ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের জামাতা জাফর খাঁ। তিনিই তাঁদের পথ দেখিয়ে আনছেন।

সুলতান স্বগতোক্তি করলেন, বটে!

আলী আসগার বললেন, শ্বশুরের হৃতরাজ পুনরুদ্ধারের ইরাদায় তিনি দিল্লীর সুলতানের শরণাপন্ন হয়েছেন।

সুলতান মাথা তুলে আলী আসগারের মুখের দিকে তাকালেন। এক নজরে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি কি মনে করো তার প্রতি মেহেরবানী করেই সুলতান ফিরুয শাহ এই অভিযানে নেমেছেন?

ঃ এক তিলও না। সোনার গাঁয়ের অধিপতি থাকাকালীন তাঁর শ্বশুর ফখরউদ্দীন মোবারক শাহও দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সে কথা এত সহজে দিল্লীর হুকুমাত ভুলবে না। আসলে জাফর খাঁকে সঙ্গে নিয়েছেন হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ইরাদায়, কোন মুহব্বত বা মেহেরবানীর টানে নয়। আমার যা ধারণা, তাতে ফিরুয শাহর এই অভিযানের অন্তর্নিহিত কারণ প্রথমবারের ব্যর্থতার গ্লানি তিনি হজম করতে পারছেন না।

সুলতানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি প্রসন্ন দীলে বললেন, তোমার এই বুদ্ধিমত্তার জন্যে তুমি তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

অতঃপর সুলতান মিয়া মোস্তাকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, উজির মিয়া মোস্তাক সাহেব কি যেন বলছিলেন?

মিয়া মোস্তাক জওয়াব দেয়ার আগেই দরবারের এককোণ থেকে তরুণ সৈনিক সহদেব রায় বললেন, গোস্তাকি মাফ হয় হুজুর! সে কথা এখন অর্থহীন।

এই তরুণের বাচালতায় সুলতান সিকান্দারের কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। তবু শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কেন?

এবার জওয়াব দিলেন মিয়া মোস্তাক। বললেন, জনাব তো দিল্লীর দূতকে চরম কথা শুনিয়েই দিয়েছেন। এরপর সে প্রসঙ্গ টেনে আর লাভ কি?

এবারও সুলতানের মুখমন্ডলে নাখোশের অবিব্যক্তি ঝিলিক দিয়ে গেলো। তিনি এবারও শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি কি ভুল করেছি তাহলে?

ঃ ঠিক ভুল না হলেও কাজ বোধ হয় পাণ্ডুয়ার সর্বস্তরের মানুষের জন্যে কল্যাণকর হলো না।

সুলতান এবার পুরোপুরি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীর কণ্ঠে

বললেন, আর একটু খোলাসা করে বলুন।

সুলতানের এই গম্ভীরতার তোয়াক্কা না করে মিয়া মোস্তাক বললেন, যেভাবেই হোক, দিল্লীর সুলতানকে নিবৃত্ত করা না গেলে পাণ্ডুয়ার বিপর্যয় কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। হয়তো শেষ অবধি সেই রাহাই বেছে নিতে হবে আমাদের। মাঝখান থেকে কিছু বেকসুর মানুষকে অযথা জান দিতে হবে।

সালার আব্দুল আজিজ বললেন, তার অর্থ পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকা। এই জীবনই কি চাই আমাদের?

উজির সাহেব এ কথায় গোস্বা হলেন। বললেন, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থাও মেনে নিতে হয়। মানুষের জীবনের দাম এ দুনিয়ায় সবকিছুর চেয়েই ঢের ঢের বেশী।

তামাম সভাসদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুলতান ধীর অথচ সবল কণ্ঠে বললেন, এ প্রেক্ষিতে আপনাদের অভিমতটা কি? সকলের স্বাধীন মত জানতে চাই।

সভাসদদের অনেকেই বললেন, অপ্রিয় হলেও উজির মিয়া মোস্তাক সাহেবের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে দিল্লীর ফৌজকে ফিরিয়ে দিলেও চলতো। এরপর স্বাধীন-অধীন থাকার প্রসঙ্গটা আমরা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে দেখতাম। মরহুম সুলতান একবার তাদের কোনমতে ঠেকিয়ে রেখে গেছেন বলেই বার বার বাহুবলে তাদের আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবো, এমন কোন নিশ্চয়তাই আমাদের সামনে নেই।

সুলতানের দৃষ্টি এবার আলী আসগারের উপর এসে থেমে গেলো। তিনি স্থির কণ্ঠে বললেন, আলী আসগারের অভিমত কি?

আলী আসগার বললেন, আলমপনা, আমার আফসোস্, আমি এঁদের কারো সাথে একমত হতে পারছিনে।

ঃ কি রকম?

ঃ শৃগারের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা আমার কাছে বহুত গুণে বেহতর।

ঃ এটাতো সস্তা বাহবার এক গালভরা বুলি! তোমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা কি?

ঃ ঐ বুলিই আমার কাছে শাশ্বত আর আমার রক্ত মাংসের সাথে একান্তভাবে সম্পৃক্ত জনাব!

ঃ অর্থাৎ?

ঃ গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা! স্বদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার আগে আমি আমার ইস্তফা পত্র দাখিল করতে চাই।

ঃ আলী আসগার!

ঃ কোমরের অসি কোমরেই খাপবদ্ধ রেখে প্রতিপক্ষের শক্তির ভয়ে দাসখত লিখে

দেয়ার কোন ফৌজী শিক্ষা আলী আসগার পায়নি।

সুলতানের মুখমণ্ডল সূর্যোদীপ্ত প্রভাতের মতো উদ্ভাসিত হলে উঠলো। তিনি দরাজকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, সাব্বাস!

অতঃপর সবাইকে লক্ষ্য করে সুলতান সিকান্দার শাহ বললেন, আমিও আপনাদের সাথে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সভা এখানেই শেষ। আপনারা যান, সত্বর একডালা দূর্গকে সুদৃঢ় করুন।

রাজা গণেশ বললেন, একডালা?

ঃ হ্যাঁ একডালা। সামনাসামনি লড়াইয়ে আমরা যাবো না। আমার মরহুম আব্বাজানের পন্থাই আমি অবলম্বন করবো। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন আর অস্ত্রশস্ত্র-রসদ নিয়ে সবাই আমরা ওখানে গিয়েই অবস্থান নেবো আর ওখান থেকেই লড়বো। পাণ্ডুয়ার আযাদীকে একডালা দুর্গের চেয়ে অধিক হেফাজাত আর কেউ দিতে পারবে না।

সালার আব্দুল আজিজ বললেন, হুজুরের এ সিদ্ধান্তকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মিয়া মোস্তাক বললেন, কিন্তু দিল্লীর ফৌজ যদি বছরের পর বছর ধরে আমাদের ঘিরে বসে থাকেন?

আলী আসগার বললেন, অসম্ভব। বর্ষার ভয়ংকর রূপ দেখলে, আর মশককুলের এন্তার তৎপরতা শুরু হলে, দিল্লীর বাহিনী আতংকগ্রস্ত হয়ে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। গতবারে দিল্লীর সুলতান দয়া করে পাণ্ডুয়া ছেড়ে যান নি। বন্যা ও মশার আতংকে পলায়নরত সেপাইদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি বলেই তিনি ওয়াপস যেতে বাধ্য হন।

মিয়া মোস্তাক বললেন, এবার তো ব্যতিক্রম ঘটতে পারে?

আলী আসগার বললেন, ব্যতিক্রম যদি ঘটেই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তা-ভাবনা তখন করা যাবে। এখন তা নিয়ে হয়রান হওয়া মানেই অনর্থক জটিলতা বাড়িয়ে তোলা।

সুলতান ফের আলী আসগারের তারিফ করে বললেন, মারহাবা!

দরবার শেষ হলো। সভাসদদের সকলেই বেরিয়ে যেতে লাগলেন। মিয়া মোস্তাককে একা পেয়ে রাজা গণেশ বললেন, আপনার মতো একজন পদস্থ উজিরকে একটা সেপাই যদি এইভাবে বেইয্যত করে, তাহলে তা বরদাস্ত করা যায় কি করে বলুন?

মিয়া মোস্তাক বললেন, বেশ কিছুদিন ধরেই এটা আমি লক্ষ্য করছি। ব্যাটার বড় বাড় বেড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে আগে চলছে। এগুলোকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়, মিয়া মোস্তাক তা জানে।

ঃ হ্যাঁ। এ ব্যাপারে সকলেরই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। ঘাড়ের উপর চড়ে বসার আগেই এটাকে পায়ের নীচে দাবিয়ে দেয়া দরকার।

রাজা গণেশকে একা পেয়ে সহদেব রায় বললেন, মধু খাঁর মতো এমন একজন তুখোড় রণবিদ খোলা ময়দানে দিল্লীর ফওজের সামনা-সামনি দাঁড়ানোর মতো এমন একটা মারাত্মক প্রস্তাব কেমন করে রাখলেন? ব্যাপারটা বুঝলাম না তো দাদা?

রাজা গণেশ বললেন, মূর্খ! ষাড়ের শত্রু বাঘে মারলে লোকসানটা কোথায়?

* * *

পাণ্ডুয়ার পাশেই একডালা দুর্গ। দুর্গের তিনদিকে থৈ থৈ পানি। নদীর মতো গভীর করে তিনদিকে পরিখা কাটা। এক দিকে বন। দুর্ভেদ্য আর বিশাল।

এই সুরক্ষিত একডালা দুর্গে এসে সপরিবারে আশ্রয় নিলেন সুলতান সিকান্দার শাহ। সঙ্গে রইলো সেনা-সৈন্য, পাত্র-মিত্র ও তাদের পরিবার-পরিজন। আর রইলো পর্যাপ্ত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র। পাণ্ডুয়া শহরের সাধারণ নাগরিকদের কিছুদিনের জন্যে স্থানান্তরে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

বিনা বাধায় দিল্লীর ফৌজ পাণ্ডুয়ায় এসে পৌঁছলো। জনশূন্য শহরে বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়ে তারা দুর্গের দিকে ধাবিত হলো এবং পরিখার অপর পাড়ে এসে সমবেত হলো। পরিখার এপার থেকে পাণ্ডুয়ার ফেওজ তীর-ধনুকের সাহায্যে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ তীর ধনুকের লড়াই চললো। কিন্তু দিল্লীর ফৌজ সংখ্যায় অনেক গুণে বেশী হওয়ায় সেদিক থেকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ হতে লাগলো। পাণ্ডুয়ার ক্ষুদ্রাকার বাহিনী বিশাল বাহিনীর এই শরবৃষ্টির বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। তারা ফিরে এসে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলো।

কাদামাটির দুর্গ। অত্যন্ত চওড়া ও অনেক উঁচু তার আবেষ্টনী দেয়াল। দেয়ালের মাথার উপর ঘন ঘন বাংকার জাতীয় খুপরী। খুপরীর মধ্যে তীরন্দাজ ও বল্লমধারী সেপাইরা মোতায়েন। দুশমনকে দেখামাত্র অদৃশ্য থেকে তীর বল্লম ছুঁড়ে মারার সুচারু ব্যবস্থা রেখে খুপ্‌রীগুলো তৈরি করা। এ অবস্থায় বাইরে থেকে হামলাকারীদের বিপদ পদে পদে। কখন কোন্‌দিক থেকে তীর-বল্লম-নেজা এসে ঘায়েল করবে তাদের, সে ব্যাপারে তারা একেবারেই অনিশ্চিত। অপরপক্ষে খুপরীর মধ্যে অবস্থিত পাণ্ডুয়ার সেপাইরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফৌজ নিয়ে ফিরোজ শাহ কয়েকদিন পরিখার ওপারেই তাঁবু গেড়ে রইলেন। পরে পরিখার উপর পুল তৈরি করে সেনা সৈন্য পার করলেন। হাতি ঘোড়াগুলোকে সাঁতরিয়ে পার করানো হলো। এপাড়ে এসে দিল্লীর ফৌজ দুর্গের উপর বার বার হামলা চালাতে লাগলো। কিন্তু প্রতিবারেই অনেক প্রাণ খেসারত দিয়ে তাদের পিছু হটতে হলো। হাতি নিয়ে হামলা করেও তারা কামিয়াব হতে পারলো না। অতর্কিত ও অব্যর্থ বর্শার আঘাতে প্রাণ দিলো অনেক মাহুত, আহত হলো অনেক হাতি। দুর্গের চারদিকেই খুপ্‌রী। চারদিকেই সশস্ত্র সেপাই। এদের একখানা অস্ত্রও অপচয়ে যাচ্ছে না। বাগের মধ্যে এলে একঘায়েই এক একজনকে ধরাশায়ী করছে। তীর-ধনুক, নেজা-বল্লম আর ঢাল-তলোয়ারের লড়াই। কাজেই পাণ্ডুয়ার ফৌজ দিল্লীর

ফৌজের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় হলেও অবস্থানের গুণে তারা এখন দুর্জেয়।

পয়লা বারের মতো ফিরুয শাহ তোঘলক এবারও প্রমাদ গুণলেন। পাণ্ডুয়ার ফৌজকে দুর্গের বাইরে না পেলে বা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতেনা গারলে পাণ্ডুয়া অভিযান তাঁর এবারেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। দিনের পর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। বর্ষা মৌসুম আসন্ন। তাঁবুর ভেতর দিল্লীর সুলতান ছটফট করতে লাগলেন। পুরোপুরি বর্ষার নামার আগেই তাঁর সোপাইদের বাংলা থেকে সরিয়ে নিতে না পারলে কমপক্ষে অর্ধেকটাকে বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হবে। গতানুগতিক আক্রমনের ফল হচ্ছে না দেখে, তিনি কৌশল অবলম্বনের কথা চিন্তা-ভাবনা করলেন।

একদিন তিনি তাঁর তামাম সালারদের তলব দিলেন। সালাররা এসে হাজির হলে তিনি সখেদে বললেন, আর কতদিন এইভাবে কাটাতে হবে আমাদের? এতগুলো হাতি থাকতে তুচ্ছ ঐ মাটির দেয়াল এতদিনেও ভাঙ্গতে তোমরা পারলে না?

সালার হিসামুদ্দীন বললেন, জাঁহাপানা, কোশেশ তো কিছু কম করছিনে আমরা। কিন্তু দেয়ালের পাশে হাতিগুলোকে ভেড়ানোই যাচ্ছে না। অদৃশ্য হাত থেকে বৃষ্টি মতো নেজা, বল্লম আর তীর ছুটে আসছে।

ফিরুয শাহ বললেন, এক জায়গায় কামিয়াব হতে না পারলে দুস্‌রা জায়গায় হামলা চালিয়ে দেখো। এতবড় বেষ্টনীর সব জায়গাতেই সমানভাবে ফৌজের অবস্থান নাও থাকতে পারে?

শাহজাদা ফতে খাঁ বললেন, সব জায়গারই একই অবস্থা, আব্বাহুজুর! সিপাহসালার তাতার খাঁ, মালিক দিলবর, আমি আর এই হিসামউদ্দীন সাহেব – আমরা এমন জায়গা রাখিনি যেখানে হামলা চালানো হয় নি। কিন্তু তামাম জায়গায় পাণ্ডুয়ার ফৌজ সমপরিমাণে মোতায়েন।

হিসামউদ্দীন বললেন, অর্থাৎ তারা তাদের তামাম ফৌজ ঐ দেয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছে। কয়েক লহমার জন্যেও কোন ফাঁকা জায়গা পেতাম যদি, হস্তি বাহিনী চালিয়ে ঐ মাটির দেয়াল মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারতাম!

ফিরুয শাহ তোঘলক বললেন, সব লড়াই-ই শুধু বল দিয়ে জেতা যায় না, কলা-কৌশলেও অনেক লাড়ায়ে জিততে হয়। ছল-চাতুরির আশ্রয়ও রণের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য নয়। কৌশলের আশ্রয় নাও। ফাঁকা জায়গা না থাকলে একটা জায়গা ফাঁকা করে ফেলো।

শাহজাদা ফতে খাঁ বললেন, কিভাবে?

ঃ পাণ্ডুয়ার দরবারে যারা আছে, সবাই তারা আসমানী পুরুষ নয়। গাদ্দারও অনেক পাবে সেখানে। দিমাগটা এবার এইদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে পাত্তা লাগাও তাদের সাথে। মোটা ইনাম আর অর্থের লোভ দেখাও। ভরাট জায়গা ওরাই নিজ গরজে ফাঁকা করে দেবে।

সেইদিকেই দিমাগ ঘোরালেন দিল্লীর সালারেরা। পাণ্ডুয়ার গাদ্দারদের হদিস নিতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই একাধিক গাদ্দারের তালিকা তাঁদের হাতে এসে পৌঁছলো। এবার তাঁরা গাদ্দারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের রাহা খুঁজতে লাগলেন।

* * *

বৃষ্টিভরা মেঘ নীল আকাশে আনাগোনা করছে। অল্প দিনেই ঢল নামবে। ঢল নামলেই বর্ষা। এতদিনও দিল্লীর ফৌজ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পারায় একডালা দুর্গের মধ্যে খোশ প্রবাহ বইতে লাগলো। রাজা গণেশকে সামনে পেয়ে সহদেব রায় হাসিমুখে বললেন, রাজা সাহেব, শেষ অবধি বোধ হয় জিতেই গেলাম আমরা। পরিখার ধারে বসে বসে মশা মারা ছাড়া দিল্লীর ফৌজের আর কোন তৎপরতাই নেই।

দু'জনেরই কাঁচা বয়স। রস করেই কথাটা সহদেব রায় বললেন। কিন্তু বয়সের তুলনায় গণেশ অনেক বুদ্ধিমান। সহদেব রায়ের দিকে কড়া নজরে তাকিয়ে তিনি বললেন, বুঝতেই যখন পারছো সবই, তখন কাজকামগুলো বেয়াকুফের মতো করছো কেন?

সহদেব রায় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। রাজা গণেশ বললেন, সামনে এবার অনেকেরই অনেক উত্থান-পতন ঘটবে। মূর্খের মতো খুপ্‌রীর মধ্যেই গাধা-খাটুনি না খেটে সুলতানের সামনে এসে দৌড় ঝাঁপ কিছু করো। নজরে না পড়লে দিনরাত গরুর মতো খেটেও কোন ফায়দা নেই।

মিয়া মোস্তাককে দেখে রাজা গনেশ আদাব দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার! উজিরে আযমকে ইদানীং একটু বেশী খুশী মনে হচ্ছে?

মিয়া মোস্তাক খোশ দীলে বললেন, বিপদটা বোধ হয় কেটেই গেলো, হে রাজা! সুলতানে আলার যে সত্যিই দূরদর্শিতা আছে, এ কথা স্বীকার আমাদের করতেই হবে।

ঃ ঠিক বুঝলাম না।

ঃ মুখোমুখী লড়াইয়ের চেয়ে একডালা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়ার জিদ সুলতানই ধরেছিলেন। আমরা তো বরং অন্য কথা বলেছি। এখন দেখছি, তাঁর পরিকল্পনাই ঠিক।

ঃ তাই এত খুশী দেখাচ্ছে আপনাকে?

ঃ ব্যাপারটা তো খুশীরই বটে!

ঃ কিন্তু উজির সাহেব, বেল পাকলে কাকের কি?

উজির সাহেব এ কথায় সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন, মানে?

ঃ মানে, এর ফায়দাটা তো পুরোপুরি আলী আসগারই লুটবে। আমার আপনার খুশী হওয়ার ফাঁকটা কেথায় এখানে?

ঃ আলী আসগারই ফায়দা লুটবে?

ঃ লুটবে না? সুলতানের মতকে সমর্থন দিয়ে সে তখনই অনেক বাহবা কুড়িয়েছে। এখন আবার দিনরাত সে সমানে সবার উপর খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। কাউকে এক লহমার জন্যেও পাশ ফিরাতে দিচ্ছে না। যেন সে-ই এই দুর্গের একমাত্র মুহাফিজ! সুলতানও আলী আসগারকেই তাঁর ডান হাত বানিয়েছেন। হামেশা তার সাথেই শলাপরামর্শ করছেন। এ যুদ্ধে জয় হলে আলী আসগারের হবে না তো, আমার আপনার হবে?

মিয়া মোস্তাক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বয়সটা কম হলেও কথাটা তো ঠিক ধরেছেন। খামাকাই আমরা ছাইয়ের দড়ি পাকাচ্ছি!

ঃ ব্যাপারটা এবার বলুন!

সারার নজিবুল্লাহকে এক পাশে পেয়ে মিয়া মোস্তাক বললেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে জাঁদরেল সালার নজিবুল্লাহ সাহেবের কোন মতামত পাচ্ছিনে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন?

সালার নজিবুল্লাহ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, এইভাবে আর কিছুদিন গেলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। তবে –

ঃ তবে?

ঃ আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। সবই তো বুঝতে পারছেন।

ঃ তবু আমাদের মধ্যে বোঝার কোন ফাঁক থাকলে চলবে না। আপনার অভিমতটা পরিষ্কারভাবে বলুন।

ঃ পরিষ্কার মানে, এ জয় নিয়ে উৎফুল্ল হওয়ার মতো তেমন কোন কারণ নজরে আমার পড়ছে না।

ঃ কেন - কেন?

ঃ আমরা তো এ লড়াইয়ে সামনের কাতারের লোক নই। সামনের কাতারের লোক হলেন খান আসকান, আলী আসগার, আব্দুল আজিজ, হাসান মাহমুদ এঁরা। সুলতানের কাছে এঁদের ইযযত দিন দিন বাড়ছে। এ লড়াইয়ে বিজয় যদি আসেই, তাহলে সে কৃতিত্বের কতটুকু হিস্‌সা পাবো আমরা?

ঃ তাজ্জব! আপনার দীলেও তাহলে ঐ একই প্রশ্ন?

ঃ শুধু আমার একার দীলেই নয়, নবীন-প্রবীণ সবার সাথেই কথা হয়েছে আমার। রাজা গণেশ, আতাহার বেগ, মাখন লাল, কাশিম খাঁ, সহদেব রায় সবারই দীলে এখন এই একটাই আফসোস্‌!

ঃ হুঁ!

ঃ অবশ্য ভুল আমাদেরও আছে। আমরা যদি সকলেই আগাগোড়া তৎপর থাকতাম, তাহলে পরিস্থিতি এ কিসিমের হতো না। ছেলে-ছোকড়াদের কথা শুনে কি বুঝলেন আপনারা – আমাদের কাউকেই তৎপর হতে দিলেন না। ভাবলেন, সুলতানকে শিক্ষা

দেবেন একটা। এখন সে শিক্ষাটা ঘুরে এসে আমাদের ভাগেই পড়লো।

ঃ সবাইতো ঠিকই ছিলো। কিন্তু ঐ ব্যাটা আলী আসগার যে এতটা মরিয়া হয়ে এই লড়াইয়ের পেছনে খাটবে, তা কি কেউ সোচ্ করতে পেরেছি!

উভয়েই চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন।

কয়দিন পরই হঠাৎ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীর এক দূত দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করলো। সন্ধির শর্তগুলোর একটাও মেনে নেয়ার উপযুক্ত ছিলো না। তবু এ প্রস্তাব নিয়ে দূত এলো দুর্গের ভেতর এবং সুলতান সিকান্দার শাহর অস্বীকারোক্তি শুনে আবার সে বেরিয়ে গেলো দূর্গ থেকে। সন্ধির প্রস্তাব ব্যর্থ হলো। কিন্তু দূতের এই দুর্গের মধ্যে আগমনটা আদৌ ব্যর্থ হলো না। এই দূতের মারফত মিয়া মোস্তক পত্র পেলেন ফিরুয শাহ তোঘলকের।

কয়েক দণ্ডের জন্যে দুর্গের দেয়ালের যে কোন অংশের তৎপরতা বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ফিরুয শাহ। বিনিময়ে মিয়া মোস্তাককে এবং তাঁর পক্ষের লোক জনদের অভাবনীয় ইনামের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সেই সাথে জানিয়েছেন, পাণ্ডুয়া জয়ের পর পাণ্ডুয়ার হর্তাকর্তা তাদেরই তিনি বানিয়ে যাবেন। সিকান্দার শাহর গোলামী করার বদলে পাণ্ডুয়ার মালিক হবেন তারাই।

পত্র পেয়ে মিয়া মোস্তাক আকাশের চাঁদ পেলেন হাতে। সঙ্গে সঙ্গে স্বগোত্রীয় সাবুদদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন। ফিরুয শাহর প্রস্তাব সকলেই লুফে নিলো। এত বড় খোশ কিস্‌মতি তাদের অপেক্ষায় আছে দেখে সকলেই আনন্দে আত্মহারা হলো। ব্যাটা আলী আসগার! খাড়াও এবার!

দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে দেয়ালের খুপ্‌রীর মধ্যে যে সব সেপাই পড়ছিলো, সবাই তোরা এদের লোক। স্থির হলো, ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে ওখানকার তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হবে। সময়টাও নির্ধারণ করা হলো এবং খবরটা দিল্লীর শিবিরে পৌঁছে দেয়া হলো।

যথাসময়ে দিল্লীর ফৌজ একডালা দুর্গটাকে আর একবার ঘিরে ফেললো। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে ধাবিত হলো হস্তিবাহিনীর সাথে দিল্লীর ফৌজের বিরাট এক অংশ। সবারই মূল লক্ষ্য উত্তর-পশ্চিম কোণ। নামকা-ওয়াস্তে দুর্গের চারদিকে ঘিরে ফেলাটা যুদ্ধের একটা কৌশল। পাণ্ডুয়ার বাহিনীকে চারদিকেই ব্যস্ত রাখা, যাতে করে তারা উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে নজর রাখার ফুরসুত করতে না পারে।

কথা মাফিক কাজ হলো। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে তীর-বল্লম কিছুই নিক্ষিপ্ত হলো না। বাধা না পেয়ে হস্তিবাহিনী বিপুল বেগে দেয়ালের কাছে চলে এলো। দলে দলে হাতি এবার দেয়ালের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগলো। শতাধিক হাতির সমবেত ধাক্কায় দেয়ালের এক জায়গায় ফাটল ধরলো এবং একটু পরই এক অংশ সশব্দে ভূপতিত হলো। প্রশস্ত ফটকের মতো প্রায় বিশ ত্রিশ হাত ফাঁকা বেরিয়ে এলো। দুর্গের মধ্যে প্রবেশের পথ তৈরি হলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মহা-কোলাহল। আতংকে দুর্গবাসীরা আর্তনাদ করে উঠে বিপুল হৈ-হুল্লোড় জুড়ে দিলো। সুলতান সিকান্দর শাহ দুর্গের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা মঞ্চের উপর বসে লড়াইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে দেখছিলেন। দেয়ালের একাংশ অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়তে দেখে মস্তকে তাঁর বজ্রপাত হলো। তিনি দেখলেন, ঐ ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে দিল্লীর অসংখ্য সেপাই হাতি-ঘোড়াসহ দুর্গের মধ্যে ঢোকার জন্যে মার মার শব্দে এগিয়ে আসছে। তিনি বুঝলেন– লড়াই এখানেই খতম! খতম এই পাণ্ডুয়ার আযাদী! খতম তাঁর জিন্দেগীর যাবতীয় লেনাদেনা!

এমন সময় কোথায় থেকে উল্কার মতো ছুটে এলেন আলী আসগার। সঙ্গে তার একদল বিশ্বস্ত সেপাই ও বিশ্বস্ত সঙ্গী শেখ আব্দুল্লাহ! আলী আসগারের নযর তামাম দিকেই ছিল। এই উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে অকস্মাৎ তৎপরতা বন্ধ দেখেই আলী আসগার বুঝেছিলেন– শুরু হয়েছে গাদ্দারী এবং একটা এমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে এদিকে। এটা আঁচ করেই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সেপাইদের একত্র করে নিয়ে এই দিকেই আসছিলেন। তিনি এসে হাজির হওয়ার আগেই ভেঙ্গে পড়লো দেয়াল।

কাল বিলম্ব না করে তিনি তার সেপাইদের এক অংশকে দুই পার্শ্বের শূন্য খুপরীগুলোতে তুলে দিয়ে হাঁক দিলেন, ভাইসব, হয় জান দেবে, নয় আযাদী হেফাজত করবে। এছাড়া আর তৃতীয় কোন রাহা খোলা নেই আমাদের সামনে। হয় শহীদ– নয় গাজী! আল্লাহু আকবার!

তার সেপাইদের বাকী অংশকে নিয়ে আলী আস্‌গার রুখে দাঁড়ালো দুর্গের মধ্যে প্রবেশ-উন্মুখ দিল্লী ফৌজের সামনে। তাদের চেয়ে দুশমনেরা প্রায় পঞ্চাশ গুণে বেশী। সঙ্গে তাদের হাতি। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও দুশমনের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো আলী আসগার। শুরু হলো ঢাল তলোয়ার আর বল্লমের লড়াই। খুপ্‌রী থেকে ছুটতে লাগলো নেজা বল্লম তীর।

বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়তে লড়তে আলী আসগার ক্রমেই কমজোর হয়ে পড়তে লাগলেন। হস্তি বাহিনী হাঁকিয়ে দিল্লীর ফৌজ ক্রমেই ভেতরের দিকে এগুতে লাগলো। হাতির সামনে আলী আসগার অসহায় হয়ে পড়লেন। দিশেহারা হয়ে তিনি হাঁক দিলেন, শেখ আব্দুল্লাহ, বল্লম!

শেখ আব্দুল্লাহ বল্লম যোগান দিতে লাগলো। আলী আসগার সামনের একটা হাতির চোখ নিশানা করে সবলে বল্লম ছুঁড়ে মারলেন। হাতিটার চোখের মধ্যে বল্লমটা ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা চিৎকার দিয়ে পেছনের দিকে ছুটলো এবং উন্মত্ত হয়ে অন্যান্য হাতির মধ্যে এলোপাতাড়ি দৌড়াতে লাগলো। এরপর আলী আসগার আর একটা হাতির চোখে বল্লম মারলেন। তারপর আর একটার। সেই সাথে হাঁক দিলেন, ভাইসব, হাতি ঠেকাও! সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকেও অনেকগুলো হাতির চোখে তীর বল্লম ঢুকে গেল। এক পলকেই শুরু হলো প্রলয় কাণ্ড। আহত হাতিগুলো উন্মত্ত হয়ে এক

সাথে এমন এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগলো যে, দিল্লীর ফৌজের মধ্যে এক অভাবনীয় বিপর্যয় নেমে এলো। তারা আর হাতির দল বাগে রাখতে পারলো না তামাম হাতি এক সাথে আতংকগ্রস্ত হয়ে এলোপাতাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে দেয়াল থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গেল এবং একইভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। দিল্লীর ফৌজ অনেকেই এই উন্মত্ত হস্তিকুলের পায়ের তলে পড়ে নিষ্পেষিত হলো।

শুরু হলো তলোয়ারের লড়াই। আঘাতে জর্জরিত আলী আসগার আর সঙ্গীরা জান বাজি রেখে দিল্লী ফৌজের অগ্রগতি রোধ করে রইলো। উপর থেকে ঝরতে লাগলো তীর। অব্যর্থ তীর-বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য দুশমনকে ধরাশায়ী করে ফেললো। ভাঙ্গনের আশে পাশে দুশমনদের লাশ স্তূপীকৃত হতে লাগলো। শেষ অবধি হস্তিবাহিনীর বিপর্যয়ে বিশৃঙ্খল ও হতাশাগ্রস্ত দিল্লীর ফৌজ এই অদৃশ্য আঘাতের মাঝে আর টিকিতে পারলো না। অগণিত লাশ পশ্চাতে ফেলে রেখে অবশিষ্ট সেপাই পালিয়ে গেলো।

মঞ্চের উপর বসে দম বন্ধ করে সুলতান সিকান্দার শাহ আলী আসগার আর তার সঙ্গীদের এই অপূর্ব বীরত্ব অবলোকন করছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আলী আসগারকে এগিয়ে যেতে দেখে প্রথমে চিৎকার দিয়ে তাকে বাঁধা দিয়ে চেয়েছিলেন। কিন্তু একেবারেই দিশেহারা থাকায় তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে কোন আওয়াজ বেরোয় নি। এবার তিনি আত্মহারা হয়ে মঞ্চ থেকে ছুটে এলেন এবং রক্তাক্ত আলী আসগারকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে আওয়াজ দিলেন, সাব্বাস, শের কা বাচ্চা!

রক্তাক্ত শরীর নিয়েই আলী আসগার দুর্গের কর্মক্ষম তামাম লোক ডেকে রাতারাতি ভাঙ্গা দেয়াল পুনর্নির্মাণ করলেন। অতঃপর বিশ্রাম নিতে গেলেন।

মস্ত বড় মওকা পাওয়া সত্ত্বেও কামিয়াব হতে না পেরে দিল্লীর সুলতান খামোশ হয়ে গেলেন। আর দু'এক বার ব্যর্থ চেষ্টা করতেই বর্ষা এসে হাযির হলো। নিরুপায় হয়ে আবার তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। এবারের শর্তগুলো নিতান্তই মামুলী ছিল। দীর্ঘদিন দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সুলতান সিকান্দার শাহও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি তাই এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। এই নাম-কা-ওয়াস্তে সন্ধি নামায় স্বাক্ষর করে দিল্লীর সুলতান ফিরুয শাহ তোঘলক ছাউনি তুললেন এবং ফৌজ নিয়ে তড়িঘড়ি বাংলা ছেড়ে দিলীর দিকে ছুটলেন।

কয়েক হপ্তা ধরে পাণ্ডুয়ায় এই বিজয়ের খোশ উৎসব চললো। আলী আসগারকে সুলতান সবার সামনে সগৌরবে তুলে ধরলেন। এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুলতান তাঁকে সহকারী সালার থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সালারের পদে অধিষ্ঠিত করলেন। আলী আসগারের সঙ্গীদের মাঝেও মোটা মোটা ইনাম বিতরণ করা হলো ও পদোন্নতি ঘটলো। হামেশাই মুখের সামনে দৌড়ঝাঁপের ফজিলতে রাজা গণেশও জার্‌রা উপরের দিকে উঠলেন।

কিন্তু এই একজনের– তাও আবার জার্‌রা উপরে উঠায় রাজা গণেশ আর সঙ্গীরা

কেউ খুশী হতে পারলো না। মিয়া মোস্তাক, নজীবুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট উমরাহ আর সালারগণ, তাঁদের চেয়েও আলী আসগারের ইয্যত অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গুমরে গুমরে মরতে লাগলো। আলী আসগার এদের বুকের কাঁটা হয়ে রইলেন।

* * *

গড়িয়ে চললো দিন। যতদিন যেতে লাগলো পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের জটিলতা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দরবারের ষড়যন্ত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হলো হেরেমেও। সুলতান সিকান্দার শাহর দুই বেগম। প্রথমা বেগমের সন্তান সংখ্যা সতের। দ্বিতীয় বেগমের সন্তান মাত্র একটি।

বড় বেগমের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র শাহাবউদ্দীন আজম শাহ ছাড়া বাদবাকী সবাই ছিলেন অযোগ্য ও অপদার্থ। শাহাবউদ্দীন আজম শাহও মোটামুটি চলনসই ছাড়া বিশেষ কোন গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না। তাঁর একটিমাত্র বড় গুণ, তিনি ছিলেন সাদাসিধে। ছোট বেগমের সন্তান শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ছিলেন সব দিয়ে যোগ্য ও সর্বগুণে গুণান্বিত। বচপন থেকেই তামাম ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা আর আদব-আখলাকের প্রশংসা দেশবাসীর মুখে মুখে ফিরতো। স্বাভাবিক কারণেই মসনদের উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর দাবীই অগ্রগণ্য হওয়ায় এবং সুলতানের তরফ থেকে সেই আভাষই স্পষ্ট হয়ে উঠায় বড় বেগমের দীলে দাউ দাউ করে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠলো। এই দাহের তীব্র তাড়নায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি দিনরাত মতলব আঁটতে লাগলেন।

প্রথম দিকে শাহজাদা গিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে তিনি ছোট বড় নানা কিসিমের ফরিয়াদ সুলতানের কাছে পেশ করতে লাগলেন। সুলতান এর কোনটাতেই তেমন কোন গুরুত্ব না দেয়ায় বা আমলে না আনায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করার ইরাদায় মওকা খুঁজতে লাগলেন।

মোটা ইনামের বিনিময়ে গিয়াসউদ্দীনকে জহর পান করানোর জন্যে বড় বেগমের হেরেমের এক বাঁদীকে সম্মত করালেন। বিমাতার এই খন্নাসপনা সত্ত্বেও তদীয়পুত্র শাহাবউদ্দীন আজম শাহের সাথে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর অনেকখানি সদ্ভাব ছিল। হামেশাই গিয়াসউদ্দীন শাহাবউদ্দীনের কক্ষে গল্প করতে আসতেন। একদিন শাহবউদ্দীন নিজ কক্ষে ছিলেন না। গিয়াসউদ্দীন এসে তাঁকে না দেখে ফিরে যাবার সময় সেই বাঁদীটা এসে হাজির হলো। সে গিয়াসউদ্দীনকে তাজিমের সাথে কুর্নিশ করে বললো, আপনি তশরীফ রাখুন আলীজা। আমি শাহজাদাকে এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি।

শাহাবউদ্দীনের সাথে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর একটু বেশী দরকার ছিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় তিনি শাহাবউদ্দীনের বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শরবতের গ্লাস নিয়ে সেই বাঁদীটা ফের হাজির হলো। গ্লাসটা

বাড়িয়ে ধরে বললো, আপনি শরবতটা পান করে একটু আরাম করুন আলীজা। শাহজাদাকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। এক্ষুণি উনি এসে যাবেন।

শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন এই সময় একটা কিতাবের উপর নজর বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় বললেন, রাখো ওখানে, খাচ্ছি।

একটু ইতস্তত করে বাঁদীটা ফের বললো, এই গরীব আউরাতের উপর আলীজা কি নাখোশ আছেন?

কিতাবে নজর রেখেই গিয়াসউদ্দীন বললেন, কেন, কেন?

ঃ আলীজাকে অনেকখানি পেরেশান দেখাচ্ছে, তবু আলীজা সরবত পানে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না!

কিতাব থেকে নজর তুলে শাহজাদা হেসে বললেন, আরে, না–না। নাখোশ হবো কেন? রাখো ওখানে খাচ্ছি।

এরপর আর পীড়াপীড়ি করলে শাহজাদার দীলে সন্দেহ পয়দা হবে ভেবে সরবতের গ্লাসটা পাশেই ঢেকে রেখে বাঁদীটা বেরিয়ে গেলো।

কিতাবটা ছিল মূল্যবান। শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ অত্যন্ত সাহিত্য রসিক ছিলেন। চোখ বুলাতে গিয়ে তিনি গভীরভাবে কিতাবের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সরবত পানের কথা তাঁর আর খেয়ালেই রইলো না। অনেক্ষণ পর জরুরী এক কাজের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি কক্ষ থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

বড় বেগমের এক অল্প বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র এই সময়ে এই কক্ষে এলো। রেকাবে ঢাকা সরবত দেখে ভাবলো শাহাবউদ্দীনের শরবত। শাহাবুদ্দীন সরবতটা না খেয়েই বেরিয়ে গেছে। এই ভেবে সে ঢকঢক করে সরবতটুকু খেয়ে ফেললো। এই সরবতের সাথে তীব্র জহর মেশানো ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া শুরু হলো। তার চীৎকারে হেরেমের লোকজন এসে জড়ো হলো। গ্লাসের প্রতি ইঙ্গিত করে সরবত পানের ব্যাপারে দু'একটা কথা বলতেই শুরু হলো গোঙানী। হেকিম ডাকার কোন মওকা কাউকে না দিয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো।

দুশমনের বদলে ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত হওয়ায় বড় বেগম আরো অধিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সুলতানের কাছে ফরিয়াদ এনে বললেন, শাহাজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহই এই খুনী। সবাই জানে ঘটনার কিছু আগে গিয়াসউদ্দীনই ঐ কামরায় এসেছিল। মসনদ প্রাপ্তির রাহা খোলাসা করার উন্মিদে সে শাহাব উদ্দীনকে হত্যা করার মতলব নিয়েছিলো। শাহাব উদ্দীনকে হত্যা করার জন্যেই ঐ জহর মেশানো শরবত ঐ কক্ষে রেখে গিয়েছিলো।

সুলতান বললেন, এতে করেই তো ফয়সালা হয়ে যায় না যে, গিয়াসউদ্দীনই ঐ শরবত রেখে গিয়েছিল। আরো প্রমান চাই।

বড় বেগম বললেন, প্রমান? প্রমান এই বাঁদী। এর কাছেই সে সরবত পানের খাহেশ প্রকাশ করে। বাঁদী তাকে শরবত দিয়ে এলে সে শরবতে বিষ মিশিয়ে রেখে চলে যায়।

শাহাজাদা গিয়াসউদ্দীনকে তলব দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন, এই বাঁদীই সেধে তাঁকে শরবত খাওয়াতে আসে এবং তাঁর খোশ-নসীব যে, বেখেয়ালে শরবতটা না খেয়েই তিনি চলে যান।

শাহজাদা গিয়াসউদ্দীনের প্রতি বড় বেগমের ঈর্ষার কথা সিকান্দার শাহ জানতেন। গিয়াসউদ্দীনের এই কথা শুনে তাঁর দীলে নানা কিসিমের প্রশ্ন দেখা দিলো। উপযুক্ত প্রমানের অভাবে তিনি ফরিয়াদটি নাকচ করে দিলেন।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সচ্চরিত্রের দরুণ সালার আলী আসগার তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহও তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন। বিপদে মুসিবতে গিয়াসউদ্দীন তাঁর কাছেই ছুটে আসতেন এবং নির্দেশ নসিহৎ নিতেন। এই ঘটনার পর গিয়াসউদ্দীন তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত হুঁশিয়ার থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আমি যতদূর অবগত আছি তাতে বড় বেগম সাহেবা তোমার বিনাশ না হওয়া পরিতৃপ্ত হবেন না। পদে পদে তোমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

এরপরও বড় বেগম আরো হরেক রকম ফরিয়াদ হরেক জনকে দিয়ে সুলতানের কাছে আনতে থাকেন। আলী আসগারের সুপারিশে সুলতান সব রকমের ফরিয়াদই নাকচ করে দিতে থাকেন। মসনদের মোহে গিয়াসউদ্দীন খোদ সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন বলেও একদিন নালিশ আনেন বড় বেগম। তার জওয়াবে সুলতান বলেন, সে কর্তব্যপরায়ন, যোগ্য ও দক্ষ সন্তান। সে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান। সে যদি মনে করে পিতার প্রাণনাশ করা উচিত, করবে। এ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

শুনে বড় বেগম খামোশ হয়ে গেলেন।

নিজ মগজের জোরে কামিয়াব হতে না পেরে বড় বেগম সভাসদদের মদদ চাইলেন। এখানে বড় বেগমকে বেশী বেগ পেতে হলো না। চাওয়ামাত্র পেয়ে গেলেন সভাসদদের মদদ। আলী আসগারের প্রতি গিয়াসউদ্দীনের বিপুল টান লক্ষ্য করে রাজা গণেশ, মিয়া মোস্তাক, সহদেব রায় ও নজীবুল্লাহর দল এই এন্তেজারেই ছিলেন। এক ডাকে তাঁরা গিয়ে মদদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তবে তাঁরা একজনও জাহির হতে এলেন না বাতেনে থেকে গুটি চালতে লাগলেন। আলী আসগারের দীলে কোন মতলব ছিল না। সৎজনকে সাহায্য করার কর্তব্যবোধই তিনি প্রকাশ্যভাবে গিয়াসউদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে চললেন।

হপ্তার পর হপ্তা অতিবাহিত হতে লাগলো। বড় বেগম তাঁর মন্‌যীলের দিকে এক কদমও এগিয়ে যেতে পারলেন না। পরবর্তী গোপন বৈঠকে পর্দার ওপার থেকে বড়

বেগম আফসোস্ করে বললেন, রাজা সাহেব, শুনি আপনার মগজ নাকি বড় শানদার! আপনার মতো তুখোড় লোকের মেহেরবানী পাওয়ার পরও আর কতদিন আমাকে এই দুশ্চিন্তার আগুনে দগ্ধ হতে হবে? জিন্দেগী ভর?

গণেশ বললেন, আম্মা হুজুর!

বেগম বললেন, একটি নয়, দুইটি নয়, সতেরটি সন্তানের আমি জননী! আমি যাবো জাহান্নামে, আর এক সন্তানের মা হয়ে গিয়াসউদ্দীনের আম্মা করবে আমার উপর খবরদারি?

ঃ তা – মানে –

ঃ সে হবে সুলতানের আম্মা। আর আমি হবো তার আজ্ঞাবাহী বাঁদী?

মিয়া মোস্তাক বললেন, কি করবেন হুজুরাইন! শাহজাদা গিয়াসউদ্দীনের যোগ্যতা নিয়ে খোদ সুলতান যেখানে সোচ্চার, সেখানে আপনার ছেলেদের সুলতান হওয়ার সম্ভাবনা তো বড় একটা দেখা যায় না।

ঃ দেখা যায় না বলেই তো আপনাদের ডাকা। সহজেই যদি কাজ হতো বা আমার সন্তানের সুলতান হওয়ার সম্ভাবনাই স্পষ্ট দেখা যেতো, তাহলে আর আপনাদের ডাকতে যাবো কেন? পথ একটা বের করুন।

রাজা গণেশ বললেন, পথ তো ঐ একটাই। গিয়াসউদ্দীন না থাকলে আপনার ছেলেই সুলতান। আর নিজের ছেলে মসনদ পেলে আপনিই হবেন সুলতান মাতা আর দণ্ডমুণ্ডের মালেকা।

বড় বেগম আরো বেশী ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন, এ কথা তো একজন নাবালকও বোঝে। আপনার মতো লোককে এই তফসীর শোনার জন্যে ডেকেছি? আপদটা কি ভাবে সাফ করতে পারি, সেই রাহা বাতলান।

রাজা গণেশ বললেন, আম্মাহুজুর, গুপ্ত হত্যা ছাড়া আর দুস্‌রা কোন রাহা নেই। কিন্তু –

ঃ কিন্তু কি?

ঃ সুলতানের সে দুই নয়নের মণি। তালাশ করলে গুপ্ত হত্যার রাহা একটা বেরুবেই। কিন্তু সুলতান জীবিত থাকতে তাকে হত্যা করলে,কারো আমাদের রেহাই নেই?

ঃ তাহলে?

ঃ সুলতানকেও খুন করতে হয় তাহলে।

বেগম সাহেবা চিন্তামগ্ন হলেন। চিন্তা করে দেখলেন, সুলতান জীবিত থাকলে তাঁর ছেলের সুলতান হওয়ার তিল পরিমাণ আশাও নেই। গিয়াসউদ্দীনকে মসনদে বসাবেন তিনি। তাঁর ছেলেকে মসনদে বসাতে হলে সুলতানকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া সত্যি সত্যিই আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই তিনি পরক্ষণেই মাথা তুলে বললেন, তাতেও আমি

রাজী। এবার বলুন, কিভাবে তা সম্ভব?

মিয়া মোস্তাক বললেন, এ দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কোন কাজ নেই। সব হলো ইরাদা – মানে দীলের আগ্রহ। নিজে না পারেন আপনার কোন বিশ্বাসী লোককে রাজী করান। সুলতান তাঁর নিজ কক্ষে যখন ঘুমিয়ে থাকেন, তখন যে কেউ একখানা তলোয়ার চালিয়ে দিলেই ব্যস্! কেল্লা ফতে! কাক পক্ষীতেও এর হদিস করতে পারবে না।

রাজা গণেশ বললেন, কার এ কাজ – এ প্রশ্ন যখন উঠবে, কায়দা করে গিয়াসউদ্দীনের ঘাড়ে অপরাধটা চাপিয়ে দিতে পারলেই চুকে যাবে ল্যাঠা। গিয়াসউদ্দীনকে ঘিরে মসনদের ব্যাপারে এখন যে হৈ চৈ চলছে, তাতে তারই এ কাজ ছাড়া অন্য রকম চিন্তাই আর কারো মগজে আসবে না।

ঃ মানে?

ঃ তখন সবাই বুঝবে, বাপের গড়িমসি দেখেই এ কাজ সে করেছে।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর আপনার যে কোন এক ছেলেকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে পিতৃহত্যার অপরাধে গিয়াসউদ্দীনকে কয়েদ করে প্রাণদণ্ড দিলেই সব ইল্লত সাফ!

বেগম সাহেবা খুশী হয়ে নসিহৎদাতাদের মোবারকবাদ জানিয়ে বিদেয় করলেন।

রাজা গণেশকে আড়ালে ডেকে মিয়া মোস্তাক বললেন, রাজা সাহেব, কাজটাতো ঠিক করলাম আমরা?

রাজা গণেশ বললেন, বিলকুল ঠিক। এইখানেই খেল্‌টা একটু না খেলালে আলী আসগারের ভবিষ্যৎটা ফর্সা করা যাবে না। আর আলী আসগারকে ফাঁসিয়ে দিতে না পারলে আমাদের সবার ভবিষ্যৎ বিলকুল ঝরঝরে।

ঃ তাহলে সে খেল্‌টা কি?

ঃ সাথে থাকুন আর দেখুন।

ঃ কিন্তু আমাদের পক্ষ জিততে যদি না পারে?

ঃ এইখানেই নাবালকের মত কথা বললেন উজির সাহেব। আমাদের পক্ষ বলে কোন পক্ষই নেই এ খেলায়। যে পক্ষ জিতবে সেই পক্ষই আমাদের। আর সেইভাবেই খেল্‌তে হবে খেল্‌টা।

অতঃপর রাজা গণেশ তার পরিকল্পনাটা মিয়া মোস্তাককে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

গুপ্ত হত্যার দিন, সময় ও ঘাতক ঠিক করা হলো। সব কিছুরই ব্যবস্থা করে এসে রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাক খেল্ শুরু করলেন। পুতুল নাচের খেল্। সুতো রইলো খেলোয়ারদের আঙ্গুলেই। কিন্তু খেলোয়ার রইলেন কালো পর্দার পেছনে। কেউ জানলো না, কেউ বুঝলো না কে নাচাচ্ছে পুতুলগুলো!

পয়গাম এলো শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর কাছে – বড় নাখোশ খবর! মসনদের লোভে বড় বেগম সাহেবা দীওয়ানা হয়ে উঠেছেন। আজকেই রাত কাঁটায় কাঁটায় দ্বিপ্রহরের সময় কিছু দুর্ধর্ষ লোক দিয়ে তিনি সুলতানকে তাঁর শয়ন কক্ষে হত্যা করাবেন। এরপর আপনার আর আলী আসগারের পালা। হুঁশিয়ার!

অনুরূপ খবর এলো আলী আসগারের কাছেও। তাঁদের বিশ্বাসী এক লোককে আগে থেকেই অর্থ দিয়ে খরিদ করা ছিলো। সে-ই এসে ঐ একই পয়গাম আলী আসগারকে দিয়ে অন্তর্ধান হলো।

খবর পেলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহও, হুঁশিয়ার জাঁহাপনা, আজকেই রাত দ্বিপ্রহরে শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আর সালার আলী আসগারের নির্দেশে এক গুপ্তঘাতক আপনাকে আপনার শয়ন কক্ষে হত্যা করতে আসছে। খোদ শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন ও আলী আসগার দুজনই ঘাতককে হেফাজত করার লক্ষ্যে সেখানে হাজির থাকবেন।

অর্থ খেয়ে একাধিক গুপ্তাচর এই একই খবর সুলতানের কানে দিলো। সুলতান সিকান্দার শাহ তাজ্জব বনে গেলেন? গিয়াসউদ্দীন খুন করবে তাঁকে! আর আলী আসগার তার মদদদাতা? তিনি কিছুতেই এটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। ঘটনা কি জানার জন্যে তিনিও এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন, রাত্রিকালে তিনি তার শয়নকক্ষ খুলে রাখলেন। একটা লম্বা বালিশ এনে বিছানার উপর মানুষের আকারে শোয়ালেন। এরপর সেটা চাদর মুড়ি দিয়ে রাখলেন। যেন সুলতানই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তারপর তিনি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাশের কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং দুই কক্ষের মাঝখানের দেয়ালে জাফরী দিয়ে সব ঘটনা দেখতে লাগলেন। প্রসাদ রক্ষী বাহিনীকেও এত্তেলা দিয়ে রাখলেন যাতে করে ইঙ্গিত দেয়ার সাথে সাথেই তারা আদেশ পালনে আসতে পারে।

গড়িয়ে চললো রাত। পয়গাম পেয়ে শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন ও আলী আসগার কেউ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। সুলতানকে বাঁচানোর জন্যে তারাও সন্তর্পণে এসে আশে পাশেই লুকিয়ে রইলেন। যথাসময়ে তাঁরা সুলতানকে হেফাজত করার উম্মিদে সুলতানের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁদের উন্মুক্ত তরবারি।

পাশের কক্ষ থেকে সুলতান সিকান্দার শাহ গিয়াসউদ্দিন ও আলী আসগারকে ঐ অবস্থায় তাঁর কক্ষে ঢুকতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! ঘটনা তাহলে এক বিন্দু মিথ্যা নয়? এঁরাই তাঁকে হত্যা করতে চায়? একজন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র আর অন্যজন তাঁর একান্ত বিশ্বাসী বন্ধুপ্রতীম ব্যক্তি! এ দুনিয়ায় স্নেহ-মমতা আর বিশ্বাসের কোন মূল্যই নেই? তিনি ক্ষোভে দুঃখে বলে উঠলেন, সাব্বাস!

আওয়াজ পেয়েই আলী আসগার আর গিয়াসউদ্দীন সজাগ হয়ে সেই আওয়াজের দিকে এগুলেন। সুলতানের শয্যাটা তাঁদের আড়ালে পড়ে গেল। ঠিক এই সময়েই বড়

বেগমের নিয়োজিত সেই ঘাতক পা টিপে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং এক ঝলক এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে না দেখে শয্যায় শায়িত বালিশের উদরে ক্ষিপ্র হস্তে কয়েকবার তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। পাশের কক্ষ থেকে সুলতান এটিও সঠিকভাবে লক্ষ্য করলেন। প্রাপ্ত পয়গামটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। উন্মাদের মতো অট্টহাসি হেসে উঠলেন এবং করতালির মাধ্যমে অপেক্ষমাণ বাহিনীকে তলব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র ফৌজ এসে কামরাটা ঘিরে ফেললো। ফৌজের একটা অংশ কক্ষের মধ্যে ঢুকার উপক্রম করতেই সুলতান তাদের থামিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন।

গিয়াসউদ্দীন আর আলী আসগার ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই সিকান্দার শাহ বললেন, আমাকে হত্যা করার এত খাহেশ তোমাদের? এত স্নেহ-মমতা আর বিশ্বাসের এই প্রতিদান?

ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করেতে পেরে গিয়াসউদ্দীন আর আলী আসগার সুলতানকে সব ঘটনা খুলে বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুলতান আর কিছুই বুঝতে চাইলেন না। তাঁদের সব যুক্তি–সব ব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি তাঁদের তামাম আরজ উপেক্ষা করে সুলতান ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললেন, আমি ইচ্ছা করলে এখনই তোমাদের হত্যা করতে পারতাম কিংবা প্রকাশ্য দরবারে তোমাদের এই জঘন্য অপরাধের বিচার করে তোমাদের প্রাণদণ্ড দিতে পারতাম। কিন্তু তোমাদের একজন আমার একান্ত স্নেহভাজন পুত্র, অন্যজন আমার এককালের পরম উপকারী বন্ধু– শুধু এই খাতিরেই তোমাদের আমি প্রাণদণ্ড দিলাম না বা কয়েদ করে বেইয্যত করলাম না। এরপর তেমাদের কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না এবং তোমাদের মুখ দেখতেও আর চাইনে।

কথা বলার আর কোন মওকা এদের না দিয়ে সুলতান সিকান্দার শাহ মোতায়েন সিপাইদের বললেন, এদের হাতিয়ার নিয়ে নাও, আর এদেরকে সসম্মানে বাইরে নিয়ে গিয়ে বিদায় করে দাও।

* * *

শেখ আব্দুল্লাহর কাহিনী যখন শেষ হলো তখন ফজরের আযান আসন্ন। শেখ আব্দুল্লাহ বললো, এরপর তোমার আব্বা আর একদিনও পাণ্ডুয়ায় থাকেন নি। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দিয়ে পরের দিন সকালেই ইস্তফাপত্র দাখিল করে নিজ মকানে চলে যান। এর কিছুদিন পরই জৌনপুর ফৌজে এসে যোগ দেন। পরবর্তী ঘটনা সবই তো তুমি শুনেছো।

আলী আশরাফ মসগুল হয়ে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনেলো। এবার সে প্রশ্ন করলো, আর শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ?

শেখ আব্দুল্লাহ বললো, তিনি এখন পাণ্ডুয়ার সুলতান। বেকসুর হওয়া সত্ত্বেও পিতার

স্নেহ-বিশ্বাস হারিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হন। পরবর্তী খবর, বিমাতার চক্রান্তের কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করে পাণ্ডুয়া দখল করেন।

ঃ সুলতান সিকান্দার শাহ কি নিহত হন?

ঃ শুনেছি, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ পিতাকে শুধু বন্দী করতে চেয়েছিলেন। হত্যা করতে চাননি। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য চক্রান্তের ফলে সিকান্দার শাহকে এই লড়াইয়েই গিয়াসউদ্দীনের অজ্ঞাতে কে বা কারা হত্য করে।

ঃ কে বা কারা!

ঃ এই চক্রান্তকারীরাই। পাণ্ডুয়ায় চক্রান্তকারী দলতো এই একটাই।

ঃ আজও ওরা বেঁচে আছে?

ঃ আছে। অনেকেই বেঁচে আছে। কিছু পুরাতন ঝরে পড়েছে, কিছু নতুন যোগ হয়েছে, এই মাত্র।

ঃ তাজ্জব!

ঃ আরও তাজ্জব ব্যাপার এই যে, এই রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাকের দলই অলক্ষ্যে থেকে শাহাজাদা গিয়াসউদ্দীনের বিরোধিতা করেছে, জয় তাঁর নিশ্চিত হয়ে এলে তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছে , তাঁরাই এখন সুলতানের ডান হাত আর সুলতানের চোখে ধূলো ছিটিয়ে দিয়ে তাঁরাই এখন পাণ্ডুয়ার মুসলমান হুকুমাতকে বিপন্ন করে তুলেছে।

ফজরের আযান শুরু হওয়ায় উভয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়লো।

চার

মওলানা মোজাফফর শামস বলখী সাহেবের পত্রসহ আলী আশরাফ দুদিন পরই বাংলা মুলুকে রওনা হলো। তাঁরই নির্দেশ মতো গোয়ালপাড়ায় গিয়ে উজির খানজাহানের সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং বলখী সাহেবের পত্র তাঁর হাতে অর্পণ করলো। বলখী সাহেবের পত্র পেয়ে খানজাহান সাহেব অত্যন্ত প্রীত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলী আশরাফকে পাণ্ডুয়ার ফৌজে যোগদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সাথে তাকে পাঁচ শ' ঘোড়ার অধিপতি করার জন্যে সুলতানের কাছে সুপারিশ পত্র লিখলেন। আপাতত একজন মামুলী সেপাই হিসাবে উজির খানজাহানের তদারকী বাহিনীতে ঐ দিনই বাদ

আসর যোগ দিয়ে আলী আশরাফ বিশ্রাম নিতে গেলো।

আলী আশরাফের ইরাদা ছিল, বিশ্রাম অন্তে এদিকের হাল-হকিকত সম্পর্কে সে যথাসম্ভব খোঁজ খবর নেবে এবং তারপর স্বীয় কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করবে।

কিন্তু সে মওকা সে পেলো না। ঐদিনই বাদ-মাগরিব উজির খানজাহান সাহেব তাকে আবার জরুরী এত্তেলা দিলেন। আশরাফ এসে হাজির হলে উজির সাহেব বললেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবাণী যে, এই দুঃসময়ে তোমার মতো একজন নওজোয়ানকে আমি হাতের কাছে পেয়েছি নইলে বড় মুসিবতে পড়তে হতো আমাকে।

আলী আশরাফ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই তিনি আবার বললেন, দীর্ঘ রাহা পেরিয়ে এসে তুমি বড় পেরেশান আছো, এটা জানা সত্ত্বেও তোমাকেই আবার আরো খানিক তকলিফ্ দিতে হচ্ছে। এ জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি।

আলী আশরাফ বললো, আপনি হুকুম করুন, আমি তৈয়ার।

উজির সাহেব সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের খানকাহ শরীফের অবস্থান সম্পর্কে আলী আশরাফকে একটা ধারণা দিলেন। সেই সাথে শাহজাদা শাহাব উদ্দীন আজম শাহকে নিয়ে এদিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু' চারটি কথা বলে একটি খত আলী আশরাফের হতে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এই খত সুফী সাহেবকে দেবে। তোমার সেই জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহানের ইচ্ছা, এ বংশে আর যেন কেউ নিহত না হয়। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আজ রাতের মধ্যে সুফী নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে শাহজাদা শাহাব উদ্দীনের মউত কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

ঃ আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।

উজির খানজাহান সাহেব তবু চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তামগ্ন অবস্থাতেই বললেন, সুলতান খাজা জাহান সাহেব তো ইচ্ছা প্রকাশ করেই নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আমি তো কোন খেই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ঃ জনাব!

ঃ আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, এই আঁধার রাতে সেই খানকাহ শরীফের পথ তুমি চিনতে পারবে কি করে?

ঃ কোন নকশা আছে ও অঞ্চলের?

উজির সাহেব তাজ্জব হয়ে আলী আশরাফের দিকে চাইলেন। বললেন, তোমার নকসাবিদ্যা জানা আছে?

ঃ জি, তা আছে।

হাতে বেশী সময় না থাকায় উজির সাহেব এ নিয়ে আর কালক্ষয় করলেন না। শুধু খানকাহ শরীফেরই নয়, পাণ্ডুয়াসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার নকশা এনে আলী আশরাফের হাতে দিলেন। আলী আশরাফ ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

গভীর রাতে সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম উজির খানজাহানের পত্র পেয়ে পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি আলী আশরাফের পরিচয় নিলেন। শাহজাদা শাহাব উদ্দীনের কয়েদ হওয়ার ব্যাপারে আলী আশরাফকে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন। সুফী সাহেবের হস্তক্ষেপ ছাড়া শাহজাদা শাহাব উদ্দীনের মউত অনিবার্য বলে আলী আশরাফ সুফী সাহেবকে জোরদার ভাবে অনুরোধ করলেন। অবশেষে আলী আশরাফকে খানকাহ শরীফের দাওয়ায় একটা খাটিয়ার উপর এন্তেজারে বসিয়ে রেখে তিনিও আবার খত লিখতে খানকাহ শরীফের এক কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

খত লিখে সুফী সাহেব খানিক পরেই ফিরে এলেন। খতখানা আলী আশরাফের হাতে দিয়ে তিনিও আফসোস করে বললেন, দুস্‌রা কোন লোক নেই যে এখন তার হাতে সুলতানের কাছে পাঠাবো। আমার বিশ্বাস, সুলতান আমার এই খত পেলেই শাহাব উদ্দীনের প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রেরণ করবেন। কাজেই এ তকলিফটুকুও তোমাকেই করতে হবে।

আলী আশরাফ তাজিমের সাথে বললো– জি, বলুন, আমার কোন অসুবিধে নেই।

হজবত নূর কুতুব-ই-আলম বললেন, এই খত নিয়ে সিধা পাণ্ডুয়ায় চলে যাবে। শাহী প্রাসাদে গিয়ে খোদ সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহর হাতে এই খত পৌঁছাবে।

ঃ কিন্তু–

ঃ তোমাকে কোন বেগ পেতে হবে না। আমার নাম বললেই প্রাসাদফটকের যে কেউ তোমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু সুবেহ্ সাদিকের মধ্যেই তোমাকে পৌঁছাতে হবে পাণ্ডুয়ায়। ফজর নামাজের পর সুলতান প্রাসাদের মধ্যে খোলা ময়দানে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়ান। সেই মুহূর্তেই ধরতে হবে তাঁকে।

ঃ জি আচ্ছা!

আলী আশরাফ আবার ঘোড়ায় চড়ে বসলো এবং পাণ্ডুয়ার দিকে ছুটলো। সুফী সাহেব এক দৃষ্টিতে তার গতিপথে চেয়ে রইলেন।

সুবেহ সাদিকের কিছু আগেই আলী আশরাফ পাণ্ডুয়া শহরে প্রবেশ করলো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। জনপ্রাণীর কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। উন্মুক্ত রাজপথ তেপান্তরের পথের মতো টান হয়ে পড়ে আছে। গোটা শহরটাকেই একটা পরিত্যক্ত পুরী বলে মনে হচ্ছে। রাজপথের দুই পাশে কাতারবদ্ধ সুউচ্চ ইমারত। ধরন-গড়ন দেখে আলী আশরাফ বুঝতে পারলো, এগুলো সব আমীর-উমরাহের মকান। এই পথে এগুতেই সামনে পড়বে শাহী প্রাসাদ। আলী আশরাফ নিজ খেয়ালেই এগুচ্ছিলো। অশ্বের গতি এখন অনেক ধীর। আচানক কোথা থেকে এক টাঙ্গা এসে তার অশ্বের সামনে পড়লো। লাগামটা প্রাণপণে টেনে ধরা সত্ত্বেও আলী আশরাফের ঘোড়া এসে টাঙ্গার সাথে ধাক্কা খেলো। মামুলী এক ধাক্কা। টাঙ্গার আরোহীটা বেখেয়াল হয়ে টাঙ্গার

এক প্রান্তে বসে ঝুমছিল। এতেই সে পিছলে টাঙ্গা থেকে পড়ে গেলো। পড়ে যাবার কালে সে টাঙ্গার পাদানটা আঁকড়ে ধরার দরুণ বেশী জোরে পড়লো না। পিছলে এসে জমিনের উপর আস্তে করে গড়িয়ে পড়লো। পড়ে যাবার সাথে সাথে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ শুরু করলো।

আলী আশরাফ এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে এসে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে দাঁড় করালো এবং এক রকম শূন্যে তুলেই তাকে আবার টাঙ্গার উপরে বসিয়ে দিলো। তাকে তুলতে গিয়েই আলী আশরাফ টের পেলো সে একজন মাতাল। তার মুখ দিয়ে ভুর ভুর করে শরাবের গন্ধ বেরুচ্ছে। জবান তার জড়িত। সোজা হয়ে দাঁড়াবার তার সাধ্য নেই। অথচ লেবাস দেখে মনে হচ্ছে, সে উঁচু তবকার মানুষ। কোন বাইজী বা শরাবখানায় রাত কাটিয়ে ভোর হবার আগেই সকলের অলক্ষ্যে মকানে ফিরে যাচ্ছে।

আরোহীটা সমানে গালি গালাজ করেই চললো। আলী আশরাফ টাঙ্গাওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে ভাই? এঁর নাম কি?

টাঙ্গাওয়ালা মেজাজের সাথে জবাব দিলো, নাম কি? হুঁশে থাকলে টের পেতেন, কত ধানে কত চাল!

টাঙ্গাওয়ালার কণ্ঠটাও বড় একটা পরিস্কার নয়। তার কথাও অল্প অল্প জড়িয়ে যাচ্ছে। আলী আশরাফ বুঝলো বেশী না হোক, এও খানিকটা টেনেছে। আলী আশরাফ বললো, জি?

ঃ আতিকুল্লাহ। আতিকুল্লাহ সাহেব।

আলী আশরাফ চমকে উঠলো। বললো, কোন্ আতিকুল্লাহ?

টাঙ্গাওয়ালারও মাতলামিটা বেড়ে গেলো। সে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলো, কোন আতিকুল্লাহ মানে? এই শালার তামাম পাণ্ডুয়ায় আতিকুল্লাহ একটাই ছিলো, একটাই আছে, একটাই থাকবে। ফুলবানুর আতিকুল্লাহ– জবরদস্ত উমরাহ আতিকুল্লাহ!

মেজাজের সাথেই টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়া দাবড়িয়ে চলে গেলো। আলী আশরাফ ফিরে এসে ঘোড়ায় উঠে বসলো। ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো ঘোড়া। আলী আশরাফের মগজ তখন অবিরাম ঘুরছে। এই সেই আতিকুল্লাহ! এক জীর্ণ শীর্ণ প্রৌঢ়। চামড়া ঢাকা ঠক- ঠকে হাড়হাড্ডি ছাড়া মেদ-মাংসের বালাই নেই তাঁর সর্বাঙ্গে। খাস্‌লতের গুণে সে বরাবাদ হচ্ছে নিজে, বরবাদ করেছে সাজানো গুছানো সংসার। এই সুরাসক্ত লম্পট কি জানে, তারই খন্নাসপনার কারণে তার বউ বেটি আজ লুণ্ঠিতা? হয় তারা আর ইহধামে নেই, নয় তারা কোন এক অখ্যাত কুখ্যাত স্থানে নর্দমার কীটের চেয়েও হীনতার জিন্দেগীর বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে?

আলী আশরাফের চোখের সামনে ভেসে উঠলো লায়লা আকতারের মুখাকৃতি। তার মনে হলো, কোন অদৃশ্য লোক থেকে সে যেন চেয়ে আছে তার দিকে! তাকে

হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কোথায় যেন বসে বসে সে সর্বক্ষণ তারই এন্তেজার করছে! একবার আলী আশরাফের মনে হলো – সে বিলকুল দিকভ্রান্ত। সে স্বার্থপর। সে বেঈমান। এই সংগ্রাম, এই কর্তব্যবোধ, এই আযাদী হেফাজতের প্রয়াস– সব মিথ্যা, সব ভুল। তার উচিত ছিল লায়লা আকতারের মুহব্বতের মূল্য দেয়া। তার উচিত ছিল সবকিছু ছিঁড়ে ছুটে গিয়ে লায়লাকেই তালাশ করা। তার তালাশ করা উচিত ছিলো তামাম দুনিয়ার সর্বত্র। তাড়িখানায়, সুড়িখানায়, কসবিপাড়ায়, নাচমহলে!

আবার সে ভাবলো, প্রায় দেড় দুই বছর আগের ব্যাপার, বিলকুল হদিসহীন অবস্থায় সে যাবেই বা কোন্‌দিকে আর তালাশই বা করবে কোথায়? গোটা জৌনপুরের অলিগলি কোথাও তো তালাশ করতে কম করেনি শেখ আব্দুল্লাহ! কম করেনি সে নিজেও ফিরে এসে। বেঁচে থাকলে হদিস পাওয়াই যেতো একদিন! খবর একটা পাঠাতোই তাকে লায়লা আকতার।

দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসতেই সে খেয়াল করে দেখে তার দুই চোখ ভরে গেছে আঁসুতে। হাতে ধরা লাগামটা ঢিলে হয়ে গেছে।

ক্ষিপ্র হস্তে দুই চোখ মুছে নিয়ে সে আবার লাগামটা জোরদার হাতে ধরলো। ফজরের আযান শেষ হয়েছে ইতিমধ্যেই। চারদিক ফর্সা হয়ে যাচ্ছে। আর দেরী করার ফুরসুত নেই। দুই পায়ের গোড়ালীতে আলী আশরাফ তাকিদ দিলো ঘোড়াকে। আবার পূর্ণবেগে ছুটতে লাগলো ঘোড়া।

কিছুক্ষণ ছোটার পরই সামনে পড়লো পাণ্ডুয়ার শাহী প্রাসাদের ফটক। ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই ছুটে এলো দ্বাররক্ষী বাহিনীর এক সেপাই। সে সওয়াল করলো, কি চাই?

আলী আশরাফ বললো, সুলতানে আলার দীদার।

সেপাইটি অবাক হয়ে আলী আশরাফকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর সে শ্লেষের সাথে বললো, দিমাগটা ঠিক আছে, না বিলকুল দীওয়ানা?

ঃ মানে?

ঃ এই সময় সুলতানের দীদার কেউ পায়, না কোন বহাল তবিয়তের মানুষ তা কল্পনা করতে পারে? রাস্তায় গিয়ে বসে বসে এন্তেজার করগে। দরবার যখন বসবে তখন সেখানে গিয়ে কোশেশ করে দেখো।

সেপাইটি স্বস্থানে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। আলী আশরাফ বললো, এই যে ভাই, শুনো। হুজুর তো নিশ্চয়ই এখন ভেতরের ময়দানে পায়চারি করছেন। তাঁকে গিয়ে বলো, হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের কাসেদ তাঁর সাক্ষাৎ চায়।

সুফী সাহেবের নাম শুনেই সেপাইটি চমকে গেলো। সে সংযত হয়ে এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বললো, ঐ সুফী সাহেব আপানাকে পাঠিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ মেহেরবানী করে একটু এন্তেজার করুন। আমি নিজেই গিয়ে খবর দিচ্ছি।

সেপাইটি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আসুন জনাব।

সঙ্গে সঙ্গে দুস্‌রা এক সেপাই এসে আলী আশরাফের অশ্বটির লাগাম ধরে বললো, আপনি নিশ্চিন্তে যান জনাব, এর হেফাজতে আমি রইলাম।

সেপাইয়ের পেছনে পেছনে কয়েক চত্বর পার হয়ে আসার পর সেপাইটি তাকে বললো, ঐ যে, ঐ দেখুন, জাঁহাপনা দাঁড়িয়ে আছেন! আপনি এখন এগিয়ে গিয়ে কথা বলুন তাঁর সাথে।

সেপাইটি ওখান থেকেই ফিরে এলো। চারদিক তখন ফর্সা হয়ে গেছে। আলী আশরাফ লক্ষ্য করে দেখলো, অন্দরমহল সংলগ্ন এক বাগিচার পাশে খোলা ময়দানে সুলতান দাঁড়িয়ে আছেন। আলী আশরাফ কাছে এসে কুর্ণিশ করে মাথা তুলতেই সুলতানে আলা চমকে উঠে বললেন, কে?

আলী আশরাফ বললো, হুজুরের একজন নগণ্য সেপাই। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব আমাকে হুজুরের কাছে পাঠিয়েছেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর কানে এসব কথার এক বিন্দুও গেলো না। তিনি অপলক নেত্রে আলী আশরাফের মুখের দিকে চেয়ে থেকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম?

ঃ আলী আশরাফ।

ঃ আলী আশরাফ! ওয়ালেদের নাম?

ঃ মরহুম আলী আসগার।

ঃ আলী আসগার! কোন্ আলী আসগার?

সুলতান উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন। জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, তিনি এই পাণ্ডুয়ারই সালার ছিলেন।

সুলতানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি দুই হাতে আলী আশরাফের দুই বাজু শক্ত করে ধরে বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, তুমি আসগার চাচার ছেলে? মারহাবা – মারহাবা!

ঃ আমি এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি জনাব!

ঃ সব কথা পরে! আগে এসো তুমি আমার সাথে।

আলী আশরাফকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন সামনের এক বিশ্রামকক্ষে ঢুকলেন। আলী আশরাফকে একদম তাঁর সামনাসামনি বসিয়ে তিনি তাদের হাল

হকিকত জানার জন্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। আলী আশরাফ সংক্ষেপে সব প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে অধীর কণ্ঠে বললো, সময় বয়ে যাচ্ছে জনাব! ওদিকের অবস্থা বড় নাজুক। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব এই খত আপনাকে পাঠিয়েছেন।

খতখানা সুলতানের হাতে দিলো। সুলতান তা খুলে আগাগোড়া পাঠ করলেন। আলী আশরাফ লক্ষ্য করলো, সুলতানের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠেছে। পাঠ-অন্তে পত্রখানা হাতের মধ্যেই চেপে ধরে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আওয়াজ দিলেন, এয়, কোই হ্যায়?

সঙ্গে সঙ্গে একজন বান্দা এসে হাজির হলো। সুলতান তাকে বললেন, জহিরুদ্দীনকে বোলাও। সহকারী সালার আভ্ভি।

বান্দা ছুটে বেরিয়ে গেলো। সুলতান স্বগতোক্তি করলেন, এরা আমাকে বেইয্যত করে ছাড়বে!

এরপর সুলতান আর কোন কথাই বললেন না। উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সহকারী সালার জহিরুদ্দীন ছুটে এলো। সুঠাম দেহের সুদর্শন যুবক। বয়সটা আলী আশরাফের চেয়ে সামান্য একটু বেশী।

জহিরুদ্দীন কুর্ণিশ করে দাঁড়াতেই সুলতান তাকে বললেন, জহিরুদ্দীন, এক্ষুণি তোমাকে গোয়ালপাড়ায় যেতে হবে।

সিনা উঁচু করে জহিরুদ্দীন বললো, আমি তৈয়ার জনাব।

সুলতান ফের বললেন, রাজস্ব আর রণবিভাগের উজির রাজা গণেশ গোয়ালপাড়ায় আছেন। তাঁকে গিয়ে আমার ফরমান জানাও। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব শাহাজাদা শাহাবউদ্দীনের ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন, সেইটেই চূড়ান্ত ফয়সালা। খোদ তিনি যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন তখন আমাদের আর কারোই কিছু করার নেই বা শাহজাদার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করারও কোন এক্তিয়ার নেই।

ঃ জনাব!

ঃ শাহাবউদ্দীকে যদি কয়েদ করা হয়েই থাকে, তাকে খালাস করে সসম্মানে তার শিবিরেই পৌঁছে দেয়া হোক। বুঝেছো?

ঃ জি জনাব!

ঃ সেই সাথে সালার সহদেব রায়কে জানাও তাঁকে যে ইরাদায় গোয়ালপাড়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সে কথা তিনি যেন হামেশাই ইয়াদ রাখেন। কোন অজুহাতেই যেন লড়াইয়ের নিয়মনীতি ভঙ্গ করা না হয়। স্থগিত লড়াই স্থগিতই থাকবে। অপর পক্ষ একান্তই হামলা করলে আমার পক্ষের ফৌজেরা শুধু আত্মরক্ষাই করে যাবে। পাল্টা হামলা চালাবে না।

ঃ যথাদেশ আলমপনা।

ঃ মুনসীখানা থেকে আমার সীলমোহর সংগ্রহ করে নিয়ে এক্ষুনি রওনা হও।

কুর্ণিশ করে জহিরুদ্দীন বেরিয়ে গেলো। সুলতান এবার আলী আশরাফকে বললেন, বুঝলে আলী আশরাফ, আমার লোকজনদের মধ্যে একটা অমূলক আতংক হামেশাই বিরাজ করছে। সব কিছুরই তারা সেরেফ খারাপ দিকটা দেখে। আর এতে করে অল্পতেই আতংকিত হয়ে ওঠে। তা সে যা-ই হোক, তোমার আর পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। আমার ফরমান এক্ষণি গোয়লপাড়ায় চলে যাচ্ছে। সুফী সাহেবকেও আমি এ ব্যাপারে সব কিছু জানিয়ে দিচ্ছি।

আলী আশরাফ বললো, জাঁহাপনার অশেষ মেহেরবানী।

ঃ তোমার আব্বার অভাব আজ হরকদম অনুভব করছি। তিনি থাকলে আমাকে এত পেরেশান হতেই হতো না।

ঃ হুজুর দরাজদীল।

ঃ তোমাকে পেয়ে আমার একিন করতে ইচ্ছে হচ্ছে–পাণ্ডুয়ার অনেক খেদমত তোমার দ্বারাও হবে। যতই হোক, এটাই তো তোমার জন্মভূমি।

ঃ আমি আমার কর্তব্যে হরওয়াক্ত হুঁশিয়ার জনাব।

ঃ তুমি সবে মাত্র এসেছো। কয়দিন উজির খান জাহান সাহেবের কাছেই এন্তেজারে থাকো। তোমাকে আমার বড় কাজে দরকার।

ঃ জাঁহাপনার খোশ মর্জি।

ঃ আমি এখন উঠি। সারা রাত অনেক তকলিফ গেছে তোমার। আহার-বিশ্রাম অন্তে তুমি এখানে থেকে যাবে।

বান্দাকে ডেকে মেহমানদারীর আদেশ দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বিশ্রাম কক্ষ ত্যাগ করলেন।

* * *

আহার বিশ্রামের পর আলী আশরাফ গোয়ালপাড়ায় ফিরে আসার পথে যে ঘটনা ঘটলো, তাতে আলী আশরাফের জিন্দেগীর যা কিছু আকর্ষণ অবশিষ্ট ছিলো, লায়লা আকতারের সুখ-স্মৃতিরূপে নিজস্ব সম্পদ বলে যা কিছু সম্পদ তার ছিলো, এক ফু ৎকারেই সেটুকুও তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

গোয়ালপাড়ার ক্রোশ দুইয়েক আগে পথের উপর পুকুর পেয়ে অশ্বটাকে পানি খাওয়ানোর ইরাদায় আলী আশরাফ থামলো। খানিক্ষণ অশ্বটাকে জিরিয়ে নিয়ে সে অশ্বসহ পুকুরের পাড়ের নীচে নামলো এবং অশ্বকে পানি পান করিয়ে নিয়ে উপরে আবার উঠে আসতে লাগলো। পুকুরের পাড়ের সাথেই পর্যাপ্ত কচি আর লকলকে ঘাস ছিলো। পানি খেয়ে উঠে আসার পথে অশ্বটি ব্যস্ত হয়ে সেই ঘাস খেতে শুরু করলো।

তা দেখে ক্ষুধার্ত আর পরিশ্রান্ত অশ্বের উপর আলী আশরাফ জোর খাটাতে গেলোনা। অশ্বটাকে ঘাসের কাছে ছেড়ে দিয়ে রেখে সে উপরে উঠে এলো এবং পাড়ের উপর এক গাছের ছায়ায় বসলো। পুকুরের প্রায় চার পাড়ই বন-জঙ্গলে ভরা। এই জায়গায়াটাই ফাঁকা। গাছ-গাছড়া অল্প । এখানেই এক কদমগাছের গোড়ার কাছে সে চুপচাপ বসে রইলো।

একটু পরেই ঐ রাস্তা বেয়ে দুই দুইটি ঘোড়ার গাড়ী এক সাথে এগিয়ে এসে পুকুর পাড়ে থামলো। এক গাড়োয়ান একটা পাত্র হাতে পানি নেয়ার ইরাদায় পুকুরে এসে নামলো। আলী আশরাফ অন্যমনস্ক থাকায় এসব দিকে নজর তেমন ছিলোনা। হঠাৎ তার নাম উচ্চারণ হতেই সে সজাগ হয়ে উঠলো এবং গাড়ীর দিকে সতর্ক নজর দিলো। দুই গাড়ীর পেছনেরটায় চার চারজন নওজোয়ান উপবিষ্ট ছিল। তাদেরই একজন বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আলী আশরাফ। এককালের সালার আলী আসগারের ছেলে। সে এই গোয়ালপাড়াতে আছে। সেপাই হয়ে সুলতানী ফৌজে যোগ দিয়েছে।

আগের গাড়ীতে এক নওজোয়ান আর একজন বোরকা পড়া উঠতি বয়সের আউরাত উপাবিষ্ট ছিলো। আগের গাড়ীর নওজোয়ানটি এ কথায় প্রশ্ন করলো, ও কোথা থেকে এলো? মতলব কি তার?

পিছের বক্তা বললো, জৌনপুর থেকে এসেছে। সে নাকি মস্তবড় এক যোদ্ধা। সাল্‌তানাতের খেদমতে সে এখানকার দলাদলি ঠাণ্ডা করতে এসেছে।

অতঃপর সে নিজে নিজেই বললো, হুঁঃ! ঠাণ্ডা করবে! কয়দিন অপেক্ষা কর বাছাধন! কার ঠাণ্ডা কে কাকে করে, শীগগির টের পাবে!

আগের বক্তা বললো, হ্যাঁ, যদি তাই হয় তাহলে আর বাছাধনকে ছেড়ে কথা আছে! এমন প্যাঁচে ফেলবো যে, সে প্যাঁচ খুলে বাহাদুরকে আর কদম তুলতে হবে না।

গাড়োয়ানটা পানি নিয়ে উঠে গেলো। আলী আশরাফ আর চুপ থাকতে পারলো না। সেও উঠে গাছ-গাছড়ার আড়াল দিয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো। অতিরিক্ত গরমে সামনের গাড়ীর আউরাতটি তার মুখের আবরণ তুলে দুই গাড়ীর লোকদের দিকে পেছন দিয়ে পুকুরের দিকে মুখ করে বসে ছিলো। সেদিকে নজন দিয়েই আলী আশরাফ চমকে উঠলো, একি! লায়লা আকতার নয়? তাইতো বোধ হয়!!

সে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলো। আইরাতটিও স্পষ্টভাবে আলী আশরাফের মুখের দিকে তাকালো। চোখচোখি হতেই আউরাতটি তৎক্ষণাৎ মুখ নীচু করলো এবং মুখের আবরণ টেনে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, গাড়োয়ান, গাড়ী ছুটাও জলদি--

আলী আশরাফ হতবাক! পাশে বসা নওজোয়ানটি প্রশ্ন করলো, কি হলো?

আউরাতটি জওয়াব দিলো, যা বলছি তাই করুন না? এত প্রশ্নের কি দরকার?

গাড়োয়ানটি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছুটিয়ে দিলো। পিছের গাড়ীও আগের গাড়ীর

অনুসরণে ছুটতে লাগলো। আগের গাড়ীর নওজোয়ানটি বিপরীত দিকে মুখ করে ছিলো বলে আলী আশরাফ তার মুখাকৃতি অনুমান করতে পারলো না। তবে সে বুঝতে পারলো, সেও এক নওজোয়ান।

দূরে থেকে হলেও আউরাতটির মুখ সে স্পস্ট ভাবে দেখতে পেলো। হুবহু লায়লা আকতার! কণ্ঠস্বরও তারই মতো। ভুল হওয়ার তো কথা নয়! আলী আশরাফ সঙ্গে সঙ্গে গাছ-গাছড়ার সেই আবছা আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিয়ে পাড়ের নীচে রাস্তায় নেমে এলো। গাড়ী দুটি ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলী আশরাফ ভাবতে লাগলো, ব্যাপার কি? আউরাতটি তাকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে। লায়লা আকতার হলে তাকে চিনতে না পারার প্রশ্নই কিছু উঠে না। তবু সে এ আচরণ করলো কেন? তবে কি লায়লা আকতার নয়? কিন্তু তাকে যে লায়লার মতোই লাগলো? কণ্ঠস্বরও সেই রকম!

নাকি লায়লা আকতার তাকে চিনতে পেরেই এই আচরণ করলো? সে আর তার সাথে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না? যে জীবন সে পেয়েছে এতেই সে তুষ্ট? যাদের সে পেয়েছে, তাদের পেয়েই বর্তে গেছে? তাই-ই হয়তো হবে। সে যদি লায়লা আকতারই হয়, এছাড়া আর দুস্‌রা কোন প্রশ্নই আসে না এখানে। লায়লা তাকে এড়িয়ে চলে গেলো!

আলী আশরাফ এখনও পারে ঐ গাড়ীর গতি রোধ করতে। এখনও পারে লায়লা আকতারকে ছিনিয়ে নিতে! ঐ চার পাঁচজন নওজোয়ান এমন কোন প্রতিবন্ধকই নয় তার কাছে। কিন্তু ছিনিয়ে সে নেবে কাকে? লায়লাই তো চায় না তাকে! ছিনিয়ে নেয়ার এতটুকু ইঙ্গিতও তো দেয়নি সে!

আলী আশরাফের ফের চিন্তা-- নাকি তার দেখারই ভুল? আদৌ সে লায়লা আকতার নয়? যে লায়লা জৌনপুরে হারিয়ে গেছে সে লায়লা এখানে আসবে কোত্থেকে?

আলী আশরাফের বুক ফেঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ঐ আউরাতই যদি লায়লা আকতার হয়, তাহলে তার জিন্দেগীর তামাম খোয়াব খতম! হয়তো লায়লাকে সে পাবেই একদিন–এই যে ক্ষীণ আশাটুকু তার বুক জুড়ে ছিলো, সেটাও আজ দপ্ করে নিভে গেলো।

আলী আশরাফ মনে মনে আর্তনাদ করে বললো, হে পরোয়ারদেগার! ঐ আউরাতটা অন্য আউরাতই হয় যেন, লায়লা আকতার কিছুতেই যেন না হয়!

* * *

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আলী আশরাফ গোয়ালপাড়ায় ফিরে এসে আর এক ধাক্কা খেলো। এসেই সে শুনলো– তার এই ছুটোছুটি তামামই পণ্ডশ্রম! শাহজাদা শাহাবউদ্দীন আজম শাহর জিন্দেগীর চরম ফয়সালা অনেক আগেই হয়ে গেছে। দাফনের জন্যে তাঁর

লাশ হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের লোকেরা খানকাহ শরীফে নেয়ার জন্যে এন্তেজারে আছেন!

খবর শুনে আলী আশরাফ খামোশ্ হয়ে গেলো! পয়লাধাপেই তার মেহনত কোন কাজেই এলো না বলে সে দীলে একটা মস্ত বড় চোট পেলো। সে এখানে নয়া আদমী। ঘটনার আদি অন্ত কিছুই তার সঠিক ভাবে জানা নেই। জিজ্ঞেস করে জানবে এমন কোর পরিচিত লোকও নেই। একমাত্র উজির খান জাহান সাহেব ছাড়া। সব সময় তাঁরও আবার নাগাল পাওয়া ভার। আলী আশরাফ বড় একাকিত্ব বোধ করতে লাগলো। সে বচপন কালেই আব্বা-আম্মাকে হারিয়েছে! জোওয়ানীতে হারিয়েছে তার জিন্দেগীর একমাত্র মন্‌যিল লায়লাকে। বান্ধবহীন এ দুনিয়ায় গোয়ালপাড়া তার কাছে সর্বাধিক অচেনা এক খতরনাক দ্বীপ বলে মনে হলো।

ছাউনির খাটিয়ার উপর কিছুক্ষণ অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ করার পর সে উজির খান জাহানের কামরার দিকে পা বাড়ালো। কয়েক কদম এগুতেই উজির খান জাহান সাহেবের নওকরের পিছে পিছে এক বৃদ্ধ আলী আশরাফের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং সালাম দিয়ে বললো, হুজুর কি আমাদের আলী আসগার হুজুরের আওলাদ?

খান জাহানের নওকর বৃদ্ধটিকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলো। আলী আশরাফ বৃদ্ধের দিকে এক নজরে চেয়ে থেকে বললো, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু--

বৃদ্ধের দুই চোখ খুশীতে ভরে উঠলো। বললো, আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সহি সালামতে রাখুন!

আলী আশরাফ ভেবে হয়রান হতে লাগলো। কোথাও একে দেখেছে বলে খেয়াল করতে পারলো না। সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কিন্তু আপনি? আপনি কে?

বৃদ্ধের দৃষ্টি আবার স্তিমিত হয়ে এলো। বললো, আমি এক লানতী বাবা! শরীফ-তমীয আদমীরা একে একে সবাই চলে গেলেন। শুধু গুনাহগার এই আমি পাপের বোঝা বাড়ানোর জন্যে এই না-ফরমানীর মাঝে আজও পড়ে আছি।

ঃ মানে?

ঃ আমি সালার দৌলত খাঁর নওকর বাপজান! এর আগে আপনার আব্বারই খাসবান্দা ছিলাম।

ঃ তাই?

ঃ হ্যাঁ, বাপজান। আহা, কি দরাজদীল আর পরহেজগার মানুষ ছিলেন তিনি। আমাকে সাথে নেয়ার জন্যে কত করে বললেন! কিন্তু সবই আমার বদনসীব! ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এই পাপপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে পারলাম না।

বৃদ্ধের দুই চোখ চিক্‌চিক্ করতে লাগলো। আলী আশরাফ প্রশ্ন করলো, আপনার নাম?

ঃ গোলামের নাম মুহব্বত খাঁ বাবা। পাঁচ পাঁচটা যুগ ধরে এই পাণ্ডুয়ার উমরাহদের গোলামী করে যাচ্ছি।

ঃ আপনি আব্দুল্লাহ্ নামের কাউকে চিনতেন?

ঃ কোন আব্দুল্লাহ? শেখ আব্দুল্লাহ?

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, শেখ আব্দুল্লাহ!

ঃ আব্দুল্লাহ ভাইকে চিনবো না মানে? উনি কোথায় আছেন এখন?

ঃ জৌনপুরে। আমার সাথেই থাকে।

ঃ আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করুন। এমন মানুষ এ দুনিয়ায় কমই আছে। যেমনই ছিলেন তোমার আব্বা, তেমনই ঐ আব্দুল্লাহ ভাই। এঁদের মধ্যে যে ইনসানিয়ত দেখেছি এমনটি আর এই জিন্দেগীতে বড় একটা দেখলাম না। যেদিন তোমার আব্বার মওতের খবর পেলাম, সেদিন আমি এতই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম যে, দুই দুইটা দিন আর কাজে যেতে পারিনি।

বৃদ্ধের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আলী আশরাফের দীলটাও ভারী হলো। একটু থেমে সে আবার প্রশ্ন করলো, এতটা বয়সেও আপনাকে কাজ করতে হচ্ছে কেন?

ঃ ঐ তো বললাম বাপজান, নসীব! সবই আমার নসীব! বৌ-বাচ্চা রেখে জোয়ান বেটা মারা গেলো। ওদের এখন খাওয়ায় কে?

ঃ ও। তা আমার খবর আপনি কি করে পেলেন?

ঃ আজকেই সবেরে উজির সাহেবের এই নওকর আমাকে বললো, তোমার পুরানো মুনিবের আওলাদ আমাদের ফৌজে এসে যোগ দিয়েছে। শুনেই আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম আপনি এখানকার ছাউনিতেই আছেন।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমি সবেরা থেকেই কোশেশ করছি আপনার কাছে আসার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই ফুরসুৎ করতে পরিনি। আমার মুনিব একটু আগে পাণ্ডুয়ায় গেলেন বলে ফাঁক পেয়ে ছুটে এলাম। আপনি আবার এরকম ভুল করলেন কেন বাপজান?

ঃ ভুল?

ঃ আপনার আব্বার মতো মানুষের দাম দেয়নি যারা, তাঁর সর্বনাশ করার জন্যে যারা সবেরা-শাম্ ষড়যন্ত্র করেছে, সেই দুশমনদের মাঝে আপনি আবার এলেন কেন? আপনার জানের কি কোন জিম্মাদারী পাবেন এখানে?

ঃ সেটা বলতে পারবো না। তবে হাজার হোক, এটা আমার জন্মভূমি। নিজের দেশ। দুশমনদের ভয়ে ভিনদেশে পড়ে থাকবো, স্বদেশের খেদমত করতে আসবো না, এটা কি ঠিক?

ঃ আপনাকে সেই খেদমতটা করতে দেবে কে? ভাললোকের ভাত আছে এখানে? এই যে আপনার বাপটা, জান বাজি রেখে সুলতানকে বাঁচানোর জন্যে তিনি গেলেন সুলতানের ঘরে, আর সুলতানের নজরে তিনিই হলেন বেঈমান, তিনিই হলেন বিশ্বাস ঘাতক! বিশ্বস ঘাতক যারা, তারাই বিশ্বাসী হয়ে ঘিরে রইলো সুলতানকে, আর ভালমানুষকে বেইয্যত হয়ে সুলতানের দরবার থেকে বিদায় নিতে হলো!

আলী আশরাফ মুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধের কথা শুনলো। বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আপনিও ওসব জানেন?

ঃ জানবো না মানে? আমি তো হামেশাই তাঁর কছে থাকতাম। আমি সব ঘটনা জানি। আর এও জানি যে, এই পাণ্ডুয়ায় সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভাল মানুষেরা সবাই বদ মানুষের হাতে অসহায় জিম্মি। না আছে তাঁদের কদর, না আছে তাঁদের কথার দাম। যে যত বেশী বদ, তার দাপটই তত বেশী। দরবারেও তার প্রতিপত্তিই সীমাহীন।

ঃ সুলতান? সুলতান এসব দেখেন না?

ঃ সুলতানেরা তো হামেশাই ঘুরে বেড়ান সাততলা আসমানে। অন্যের হাতের তোলা খেয়ে পেট পূর্তি করেন। জমিনের সাথে সম্পর্ক রাখার মওকা তাদের কোথায়?

ঃ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহও কি তাই?

ঃ উনি তো একজন বন্ধচোখের মানুষ। ধ্যানমগ্ন সাধক। ভাল-মন্দ বিচার করার হয় তাঁর ফুরসুৎ নেই, নয় তাঁর সাধ্য নেই। নিজে একজন ভাল মানুষ বলে এ দুনিয়ার তামাম মানুষই ভাল মানুষ, এই ধারণার উপরই বুঁদ হয়ে আছেন।

ঃ হুঁ।

ঃ চোখের উপর এতগুলো সাংঘাতিক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এসব দেখেও যে কিছুই বুঝতে পারেনা– হয় সে নির্বোধ, নয় সে উন্মাদ।

ঃ আচ্ছা!

ঃ বংশটা তার নিপাত হয়ে গেলো, আর সুলতান শুধু হাউ হাউ করে কেঁদেই আকুল হলেন! গর্দানটা সোজা করে এর বিহিত করতে পারলেন না। নিজে তিনি মালিক। অথচ মালিক যা চান, প্রতিবারেই তার উল্টোটাই ঘটে যায়। মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছা যে বহাল রাখতে পারে না, সে আবার কোন কিসিমের মালিক? তিনি তো আর সত্যি সত্যিই চাননি, বাপটা তাঁর নিহত হোক! বন্দীর অধিক কেউ কিছু করবে না এই ছিল তাঁর আদেশ। অথচ লড়াইয়ে বাপের সাথে ভাইগুলো সব, তার ইচ্ছা-ইরাদার বিরুদ্ধে কোরবানী হয়ে গেলো, তিনি বুক চাপড়িয়ে কেঁদেই সারা হলেন, কোন্ হাত এর পেছনে কাজ করছে সেটা দেখতে গেলেন না। অথচ দোষগুলো তো তামামই নিজের ঘাড়েই পড়লো। সারা জাহান জেনে গেলো, মসনদকে নিষ্কন্টক করার ইরাদায় তিনি কী নিষ্ঠুরতাটাই না করলেন!

ঃ বলেন কি?

ঃ এই যে তাঁর বংশের শেষ বাতিটা নিভে গেল, এর পরও কি হুঁশ হয়না মানুষের? হাত সাফাই করে যে যা বোঝায় তাই বুঝেই খামোশ থাকে মানুষ?

ঃ শেষ বাতি মানে? আপনি শাহজাদা শাহাবউদ্দীনের কথা বলছেন?

ঃ হ্যাঁ বাবা। ভাইদের মধ্যে ঐ একটাই তো ছিলো। ভরসাও ছিলো ঐ একটাই। নিজের ছেলেটাতো মাতাল আর লম্পট। কানাকড়ির ভরসা নেই তার উপর।

ঃ শাহজাদা শাহাবউদ্দীন লড়াইয়ের ময়দানেই এন্তেকাল করলেন?

ঃ লড়াইয়ের ময়দানে? লড়াইতো স্থগিত ছিলো। আর ইন্তেকাল বলছেন কাকে? হত্যা করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে! নজীরবিহীন বেইমানী করে তাঁকে কোতল করা হয়েছে!

বৃদ্ধ মুহব্বত খাঁ ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগলো। আক্রোশে আর আফসোসে তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। হতবুদ্ধি আলী আশরাফ অবাক হয়ে বললো, বলেন কি! আপনি একজন নওকর হয়ে যে খবর রাখেন, আর সুলতান তা রাখেন না?

মুহব্বত খাঁ চমকে উঠলো। এতক্ষণে তার হুঁশ ফিরলো। ভয়ে তার চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে ছুটে গিয়ে আলী আশরাফের দুইহাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে কললো, আমার কসুর হয়ে গেছে বাবা! ঝোঁকের মাথায় একি করলাম আমি? এসব কথা বলার মতো কোন লোক এত দিন না পেয়ে তামাম কথা বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিলো। একটু নাড়া পড়তেই বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে বাবা। আমি বেখেয়ালে মস্তবড় বেয়াদবী করে ফেলেছি। ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দাও বাবা। এসব কথা আর কারো কানে গেলে নকরীতো থাকবেই না, জানটাও যাবে!

মুহব্বত খাঁর এই আচরণে আলী আশরাফ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আরে না - না। এসব কি বলছেন? আমি আবার বলতে যাবো কাকে?

মুহব্বত খাঁ ঐ একই রকম অনুনয়ের সুরে বললো, তবু বাবা বলা যায় না। যদি এসব কথা ফাস হয় তাহলে মওত আমার নির্ঘাত। যে কঠিন মুনিব আমার। আর আমি যদি না থাকি তাহলে আমার বেটার এতিম বৌবাচ্চা না খেয়ে মারা যাবে।

মুহব্বত খাঁর দুই চোখ ছলছল করতে লাগলো। আলী আশরাফ তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো, চাচা, আপনি আমাকে বেটার মতো ঠাওরাবেন। আমি কসম খেয়ে বলছি, আমার দ্বারা আপনার তো কোন ক্ষতি হবেই না, বরং আপনার মদদে আমি হামেশাই তৈয়ার থাকবো। আপনার হেফাজতির জন্যে আমার তরফ থেকে চেষ্টার কোন কসুর আমি করবো না।

মুহব্বত খাঁ বিহবল কণ্ঠে বললো, এই না ফরমানীর দুনিয়ায় এতটা কি সত্যিই আমি বিশ্বাস করতে পারি?

ঃ পারেন এই কারণে যে, আমি আপনার মুনিব সেই আলী আসগারেরই ছেলে। এ ছাড়া জুলুমের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে যার দীলে, সে আমার দীলের চেয়েও আপন। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার দীলের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে এই বাংলা মুলুকে এসে এর চেয়ে বেশী আপন বড় একটা খুঁজে পাইনি এখনও। আমার মঙ্গল নিয়ে এতটা উতলা হতে এ পর্যন্ত আর কাউকে দেখি নি। তবে আপনাকে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, মওকা পেয়েও জানের ভয়ে অন্যায়কে চেপে যাওয়া হলফিল একটা গুনাহ্।

বৃদ্ধের দুই চোখ জ্বলে উঠলো। বললো, জানের ভয় আমার জাররা মাত্র নেই বাবা। ও ভয় কোনদিনই আমি করি নি। ভয়টা শুধু ঐ এতিমদের আখের নিয়ে। আর সেই জন্যেই নিরুপায় হয়ে জেনেশুনে একজন জালীমের হুকুম বরদারী করছি।

ঃ আল্লাহ তায়ালার রহমে যদি পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে আপনাকে আর এ বয়সে এ তকলিফ করতে হবে না। এ ছাড়া আপনি আমার মরহুম আব্বার অনেক খেদমত করেছেন। সেদিক দিয়ে আপনার দায়-দায়িত্ব অনেকখানি আমার উপরও বর্তে। এখন আপনি আমাকে নির্ভয়ে সব ঘটনা খুলে বলুন। কোন জুলুমের প্রতিকার নিজে করতে না পারলে যে প্রতিকার করতে আগ্রহী তাকে সাহায্য করাও সওয়াবের কাজ। এদিকের হাল-হকিকত সব আমাকে জানতে হবে। সবার আগে জানতে হবে শাহজাদা শাহাবউদ্দীনের ব্যাপারটা। আপনি যা জানেন, সব আমাকে খুলে বলুন। এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা পরিস্কার ধারণা না থাকলে আমি সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবো না।

মুহব্বত খাঁ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো, তাহলে বাপজান, আপনার ঐ ছাউনির মধ্যে চলুন। অনেকগুলো কথা। বসে বসে বলি, চলুন। খোলা ময়দানে এভাবে অধিকক্ষণ কথা বলতে দেখলে লোকজন সন্দেহ করতে পারে।

দুইজন এসে ছাউনির মধ্যে বসলো। বসে বসে মহব্বত খাঁ শাহজাদা শাহাবউদ্দীনের কাহিনী আগাগোড়া শোনালো।

ছত্রার যুদ্ধে জয়ী হয়ে শাহজাদা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ মসনদ অধিকার করেন এবং পাণ্ডুয়ার সুলতান হন। তাঁর পিতা সিকান্দার শাহ ও অন্যান্য ভাইয়েরা এই যুদ্ধে নিহত হন। ভাইদের মধ্যে জীবিত থাকেন একমাত্র শাহাবউদ্দীন আজম শাহ। তিনি পালিয়ে গিয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন এবং পরে সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়ে সোনারগাঁয়ের এক অংশ দখল করেন ও নিজেকে পাণ্ডুয়ার সুলতান বলে ঘোষণা দেন। সেখান থেকেই তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গোয়ালপাড়ায় দুই পক্ষের ফৌজ মুখোমুখি দাঁড়ায়। শুরু হয় লাড়াই। দীর্ঘদিনব্যাপী দুই ভাইয়ের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী লড়াই চলে আসতে থাকে। ফলে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে দীর্ঘদিনযাবত তাঁর ফৌজের বিশাল এক অংশকে গোয়ালপাড়ায় মোতায়েন

রাখতে হয়। ছত্রাদুর্গ থেকে রসদ সরবরাহ হয় আর লড়াই চলে গোয়লপাড়ার ময়দানে। ময়দানের দুই প্রান্তে দুই শিবিরের কাতার। একটা গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর, অন্যটি শাহাবউদ্দীন আজম শাহর। দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে। কেউ কাউকে পুরোপুরি বাগে আনতে পারেন না।

জৌনপুরের সুলতান পাণ্ডুয়ার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। কওমের এক আযাদ ভূমির প্রতি অন্য এক আযাদ ভূমির স্বাভাবিক হাম্‌দরদ। তিনি এই ভ্রাতৃঘাতি লড়াই বন্ধ করার জন্যে দুই পক্ষকেই আপোসে একটা ফয়সালা করার নসিহত করে পাঠালেন। কওমী স্বার্থে বাংলার মুসলমান সুফী-সাধক ও অলি-আউলিয়া ব্যক্তিবর্গ এর একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সালার ইরাদায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পাণ্ডুয়ার শাক্তির উপরই নির্ভর করছে বাংলায় মুসলমানদের আযাদ ভূমির স্থায়িত্ব। এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলেন সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেব। এই সুফী সাহেব সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সহপাঠী ছিলেন। পাঠ অবস্থা থেকেই গিয়াসউদ্দীন এই সুফী সাহেবকে ভক্তি করা শুরু করেন এবং এখন গিয়াসউদ্দীন তাঁকে ভালবাসেন যতখানি, ভক্তি করেন তার চেয়েও হাজার গুণে বেশী।

একদিন সুফী সাহেব খত পাঠালেন সুলতান গিয়াসউদ্দীনের কাছে। তিনি লিখলেন, শাহজাদা শাহাবউদ্দীনের সাথে সুলতানের এই লড়াই নিয়ে তিনি সুলতানের সাথে কিছু কথা বলতে চান। সুলতান সময় নির্ধারণ করে দিলে তিনি এসে মোলাকাত করবেন সুলতানের সাথে।

খত পেয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ শরমিন্দা হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তায়ালার আরাধনায় যিনি মশগুল, তকলিফ করে তিনি আসবেন এই দুনিয়াদারির তেজারতদারের কাছে? এতবড় গুণাহ্ করতে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তৈয়ার হয়ে নিজেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন খানকাহ শরীফের উদ্দেশ্যে।

দাওয়ায় ফরাশ বিছিয়ে সুফী সাহেব বসে বসে তস্‌বীহ তেলাওয়াত করছিলেন। এই সময় সুলতান সেখানে হাজির হয়ে তাঁর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তেলাওয়াতের এক ফাঁকে চোখ মেলে সামনের দিকে চেয়েই সুফী সাহেব অবাক হয়ে গেলেন! তসবিহ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানকে সম্মানোচিত আসন দেয়ার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুলতান হাসিমুখে তসলীম জানিয়ে মোসাফেহা করলেন এবং তারপরই ঐ ফরাশের উপর বসে পড়ে বললেন, কোন সুলতান এই খানকাহ শরীফে আসার হিম্মত রাখে না। যে আসে, সে একজন খাদেম হয়েই আসে। আপনি নির্দ্বিধায় বসে পড়ে কথাবার্তা বললে আমি খুবই স্বস্তিবোধ করবো।

সুফী সাহেব বললেন, খোদ সুলতান হঠাৎ এখানে?

সুলতান স্মিতহাস্যে বললেন, সুলতান নয়, গিয়াসউদ্দীন এখানে। আপনার খত পেয়েই এলাম। আপনি যাবেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে, এ শরম আমার রাখার

জায়গা আছে? আপনি মেহেরবানী করে তসরীফ রাখুন। সুফী সাহেব সুলতানের পাশে বসলেন। পরস্পর পরস্পরের তবিয়তের খোশখবরী করার পরই সুফী সাহেব আসল কথায় এলেন। বললেন, আপনি দানেশমান্দ আদমী। আপনাকে বোঝাবার কিছু নেই। শুধু এইটুকুই বলবো– শাহজাদা শাহাবউদ্দীন আপনার ভাই। একই পিতার সন্তান হিসাবে তাঁরও একটা হক আছে এখানে। যে ইনসান সুলতান, দুনিয়াদারীর ইনসাফের সে ইনসান মালিক। বেইনসাফী করে তামাম জাহানের বাদশা হওয়াকে কোন মহৎ কাজ বলে আপনি মনে করেন কি?

গিয়াসউদ্দীন হেসে বললেন, জি না, আমার তা মনে করার কিছুমাত্র কারণ নেই।

ঃ তাহলে আপনারা দুই ভাইয়ে এই লড়াইয়ের একটা ইয্যতপূর্ণ ফয়সালা করে ফেলুন – এই আমার আরজ।

ঃ দেখুন হজরত, শাহাবউদ্দীনকে ভাইদের মধ্যে বেশী ভাল বাসতাম। কিন্তু সে যে এমন পদক্ষেপ নেবে এটা ধারণা করতে পারিনি। সে আমার কাছে এসে সমনাসামনি দাবি করলে তার উম্মিদের চেয়েও সে বেশী পেতে পারতো।

ঃ আপনার দিক দিয়ে তো তাঁর কথা ভাবলে চলবে না জনাব! তাকে ভাবতে হবে তার দিক দিয়ে। তার হেফাজতির প্রশ্ন আছে। জানের হেফাজতি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে কেউ সুলতানের সামনে সেভাবে আসতে কখনও পারে না।

ঃ তাই যদি না পারে তাহলে ফয়সালা আর হয় কিসে?

ঃ সে ব্যবস্থা আমি করবো। আপনাদের দুইজনকে এক করার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।

ঃ আপনি যদি মেহেরবানী করে সে তকলিফটুকু করেন, তাহলে আমার তরফ থেকে আমি বলছি, আমি জিন্দেগী ভর এজন্যে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ঃ কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে জনাব!

ঃ আমি আন্দাজ করতে পারছি, হজরত কি বলতে চান। লেনদেন ছাড়া কোন ফয়সালা হয় না। এ ব্যাপারে আমার একটিই মাত্র বক্তব্য যে, হজরত নূর কুতুব-ই-আলম (রঃ) আদেশ করার মালিক। তিনি কারো অনুমতির অপেক্ষায় থাকবেন, এটা আমার চিন্তা করতে কষ্ট হয়। আমার জানের নিরাপত্তা বিধান করে হজরত যদি পাণ্ডুয়ার মসনদটা আমার ভাইকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেন, এ ব্যাপারে অন্তত আমার চেয়ে বেশী আর খুশী কেউ হবে না। কারণ আমি জানি, আমার জন্যে যা মঙ্গল সেই আদেশই হজরত আমাকে দেবেন, কোন অন্যায় আদেশ তিনি দেন না।

ঃ জনাবের এই দরাজদীলের জন্যে আমি তাঁর তারিফ করি এবং তাঁকে মোবারকবাদ জানাই। তবে এত বড় কোরবানী দিতে জনাবকে আমি বলবো না। আমার খেয়াল, শাহাজাদা শাহাবউদ্দীন সোনারগাঁয়ে স্বাধীন সুলতান হয়ে থাকলে এবং ভাইয়ের সাথে মিল মুহব্বত বজায় রেখে চললে জনাবের ইয্যত বাড়বে বৈ কমবে না। এছাড়া সোনার

গাঁতো এককালে পাণ্ডুয়ার বাইরে ভিন্ন রাজ্যই ছিলো।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন এ কথায় উৎফুল্ল হয়ে বললেন, এমনটি তো আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত। এতে আমার আপত্তি থাকার কিছুমাত্র কারণ নেই। কিন্তু ভাই কি আমার খোশদীলে রাজী হবে এতে? আমাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে উভয় ভূখণ্ডের একচ্ছত্র সুলতান হওয়াই হয়তো তার উম্মিদ।

ঃ আমিতো বলেছিই, সে দায়িত্ব আমার। এই মর্মে জনাবের এযাযতটুকুই দরকার। এরপর আমি নাড়া দিয়ে দেখি। এটাকে সে পুরোপুরি গ্রহণ করতে না পারলে সেটা তারই বদনসীব। আমার আপনার কারার কিছু থাকবেও না বা করতে আমি বলবোও না।

ঃ আমার তরফ থেকে হুজরতকে ঢালাও এযাযত দেয়া রইলো। তিনি যে ফয়সালা করে দেবেন, সেটাকেই আমি রহমত হিসাবে গ্রহণ করবো। বংশ আমার খতম হয়ে যাওয়ার পথে। আর কোন জিদে আমি থাকতে চাইনে।

ওয়াদা করে সুলতান পাণ্ডুয়ায় ফিরে এলেন। সুফী সাহেব শাহজাদা শাহাবউদ্দীনকে খবর দিতেই তিনিও এসে হাজির হলেন খানকাহ শরীফে। শাহাবউদ্দীন ও সুফী সাহেবকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অল্প কথায় শাহবউদ্দীনও সব দায়িত্ব সুফী সাহেবের উপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, হজরত! সুলতান আমার বড় ভাই। ভাই যেখানে সুলতান, সেখানে আমার নাখোশ হওয়ার কোন কিছুই ছিলো না। ভাইযের পাশে বসে তাঁর হুকুমাতকে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু পাণ্ডুয়ার হেরেম থেকে দরবার – এই তামাম এলাকাটাই ষড়যন্ত্রের উত্তপ্ত ঘাটি। ওখানে এক রত্তিও নিরাপত্তা থাকতো যদি আমার।

ঃ খোদ সুলতান যদি আপনার সে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন?

এ কথায় শাহাবউদ্দীন ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, খোদ আল্লাহ তায়লা ছাড়া তাঁকেই কে হেফাজত করে তার কিছুমাত্র ঠিক-ঠিকানা নেই, নিজের হেফাজতিই যাঁর একেবারে অনিশ্চিত, তিনি নেবেন আমার হেফাজতির দায়িত্ব! এর চেয়ে আর করুণ কি হতে পারে! উনিতো আমার চেয়েও অসহায়!

শাহাবউদ্দীনের সাদা দীলের পরিচয় পেয়ে সুফী সাহেব যারপার নাই খুশী হলেন। বললেন, তাহলে আপনার ইরাদাটা জানতে পারলে –

ঃ আমার কথাতো বলেছিই আপনাকে। আপনার ফয়সালাই আমার ফয়সালা। তবু যদি ইরাদার কথা বলেন, তাহলে আমি বলবো, পাণ্ডুয়ার সাল্‌তানাতের তামাম ভূখণ্ডটাই চাই আমার। কিন্তু এটা আমার জিদের কথা। আমার আসল উম্মিদ, স্বাধীনভাবে জীবন ধারণের মতো সামান্য একটু ভূখণ্ড। কিন্তু ভাইজান তো এখন চোখে সুরমা দিয়ে এ দুনিয়া দেখছেন, কানে কুসুম গুঁজে সবার কথা শুনছেন। গরীবের এই আরজ তার কানে পৌঁছবেই বা কেন, আর তা উনি মানবেনই বা কোন দুঃখে? কাজেই এস্পার কি

ওস্পার! অল্প চেয়ে পাবো না যখন, তখন পারলে তামামটাই নেবো, না পারলে চুকেই গেলো ল্যাঠা! বেঁচে থাকলে কোথাও ঠাঁই একটু পাবোই।

ঃ সবই আপনার ভুল শাহজাদা! আর এই ভুলের জন্যেই বার বার আপনি জিদের আশ্রয় নিচ্ছেন। উনি আপনাকে আপনার উম্মিদের চেয়েও অনেক বেশী দিতে রাজী। বাধা যেটা দাঁড়িয়েছে তাহলো, আপনাদের মধ্যে সমঝোতার নিদারুণ এক অভাব।

ঃ যদি তাই হয়, আমার প্রতি হজরতের কি আদেশ তা জানতে চাই।

ঃ যদি এমন করা যায়, সোনারগাঁয়ে আপনি থাকলেন, আপনার ভাই থাকলেন পাণ্ডুয়ায় দু'জনই স্বাধীন এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল সুলতান হয়ে রইলেন, তাহলে কেমন হয়?

ঃ হজরত, গোস্তাকী মাফ করবেন, এ যেন আমাকে এক কল্পপুরীর খোশ-খোয়াব দেখাচ্ছেন! এতটাও তো চাহিদা নয় আমার। তবু যদি ভাইজান এটা খোশদীলে মঞ্জুর করেন, তাহলে সে তো আমার চরম খোশ-কিস্‌মতি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখুন।

ঃ কথা আমার হয়েছে। এতে তিনি রাজী আছেন।

ঃ তাহলে তো আর কথাই নেই। এবার আদেশ করুন, আমাকে কি করতে হবে এখন?

ঃ আপাতত লাড়াইটা স্থগিত রাখুন। আপনাদের দু'জনকে নিয়ে এক সাথে বসে চরম ফয়সালা অচিরেই আমি করার ব্যবস্থা করছি।

ঃ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কামিয়াব করুন। কিন্তু লড়াই তো এক পক্ষ স্থগিত রাখতে চাইলেই স্থগিত রাখা যায় না, দুই পক্ষ চাইলেই তা সম্ভব।

ঃ আপনি আপনার দিকটা সামলান, অপর পক্ষকে এখনই আমি বলে দিচ্ছি।

ঃ অপর পক্ষ লাড়াই থামানোর সাথে সাথে আমার ফৌজও নিক্রিয় হয়ে যাবে, আপনার কাছে এ ওয়াদা রইলো আমার।

ঃ আপনার এই সৎ ইরাদার জন্যে আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শাহাজাদা শাহাবউদ্দীন খুশী হয়ে ফিরে এলেন। বিশেষ কাসেদের মারফত লড়াই স্থগিত রাখার ফরমান পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে সুফী সাহেব সুলতানকে অনুরোধ জানালেন। সুলতান সে অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করলেন। সুলতানের ফরমান পেয়ে সুলতান পক্ষ লড়াই বন্ধ করলো। তা দেখে শাহাবউদ্দীনও লড়াই বন্ধ করে সেপাইদের বিশ্রামে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর সুফী সাহেব এই মর্মে সুলতানকে জানালেন যে, সুলতান রাজী থাকলে হপ্তাকালের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে গোয়ালপাড়ায় যাওয়ার ও দুই ভাইকে নিয়ে ফয়সালায় বসার তিনি ইরাদা পোষণ করেন। দিন ধার্য করে সুলতান তাঁর সম্মতি পাঠালে সুফী সাহেব সেই মোতাবেক তৈরি থাকবেন।

চলতি হপ্তার শেষের দিনটা ধার্য করে সুলতানও তার সম্মতি জানিয়ে সুফী সাহেবকে

তৎক্ষণাৎ বার্তা পাঠিয়ে দিলেন।

এটুকু করেই সুলতান নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন না। ফয়সালায় বসার আগে স্থগিত লড়াই কিছুতেই যাতে পুনর্জীবিত না হয়, এই মর্মে নয়া ফরমানসহ সালার সহদেব রায়কে তৎক্ষণাৎ গোয়ালপড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। আর এতে করেই সব ফয়সালার কবর খুঁড়লেন সুলতান।

গিয়াসউদ্দীন আর শাহাবউদ্দীনের মধ্যে আপোস মীমাংসার ইরাদায় সুফী সাহেব পয়লা কদম তুলতেই খবরটা সালার সহদেব রায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছিলো। শুনেই তিনি হুঁশিয়ার হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরদের তৎপরতা আপাতত এককভাবে এই দিকে ঘোরালেন। তারা তাঁকে দৈনন্দিন ঘটনাবলী সবিস্তার অবগত করাতে লাগলো। খানকাহ শরীফের আলাপ আর সুলতানের কার্যকলাপ কিছুই তাঁর অগোচর রইলো না। সুফী সাহেবের মাধ্যমে সুলতানেরা দুই ভাই চলতি হপ্তার মধ্যেই গোয়ালপাড়ায় চূড়ান্ত ফায়সালায় বসতে যাচ্ছেন এটা যখন স্থির হলো, সহদেব রায় তখন একেবারেই পেরেশান হয়ে পড়লেন। রাজা গণেশ গোয়ালপাড়ায়। দশরথ দেব, ভরত সিং, শ্রী মাধব, তারাদাস প্রভৃতি স্বজাতীয় সেপাই সালার উমরাহরাও সেখানে। কারণ ঐ একটাই। সবারই লক্ষ্য শাহাবউদ্দীন। এটিই এখন বাড়তি কাঁটা, বাড়তি কাটা না সরালে আসল কাঁটার কাছে ঘেঁষার পথ কৈ? সহদেব রায় নিজেও ওখানে ছিলেন। সুলতানের এত্তেলাতেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। এখানে প্রায় একা তিনি। এখন কি করণীয় তাদের, একা একা চিন্তা করে কূল কিনারা না পেয়ে গোয়ালপাড়ায় যাওয়ার জন্যে যখন তিনি বাহানা তালাশ করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সুলতানের ফরমান নিয়ে গোয়ালপাড়ায় যাওয়ার আদেশ তার উপরই হলো। সহদেব রায় আনন্দে নেচে উঠলেন এবং কালক্ষয় না করে সেই দিনই পড়ি মরি গোয়াল পাড়ায় ছুটলেন।

গোয়ালপাড়ায় পৌঁছে সুলতানের ফরমানটা জেবের মধ্যে পুরে রেখে সহদেব রায় আগে চুপি চুপি রাজা গণেশের তালাশ করলেন। রাজা গণেশকে পাওয়া মাত্র দুইজন এসে দৌলত খাঁর খিমার মধ্যে বসলেন। গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে তারা রাজা গণেশের নিজ খিমায় বসলেন না। দৌলত খাঁর খাস কামরা ফাঁকা ছিলো তখন। দৌলত খাঁ বাইরে ছিলেন। এই সুযোগে তারা সেখানেই গোপন শলায় বসলেন। এক দলে হলেও দৌলত খাঁ বা অন্য কাউকে এই গোপন শলায় ডাকলেন না। তৃতীয় কারো আগমন সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে দৌলত খাঁর বৃদ্ধ নওকর মুহব্বত খাঁকে খাস কামরার অপর পার্শ্বে প্রবশ পথে পাহারায় বসিয়ে দিলেন। পর্দার এপারে বসে বৃদ্ধ মুহব্বত খাঁ চোখ-কান খাড়া করে রইলো।

সহদেব রায় ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, দাদা, সর্বনাশ! আমাদের সব চেষ্টা এবার বুঝি ভেস্তে যায়!

রাজা গণেশ বললেন, কি রকম?

সহদেব রায় বললেন, ক'দিনের মধ্যেই সুলতানেরা দুই ভাই আপোস-মীমাংসায় বসে সব কিছু ফয়সালা করে নিচ্ছেন। ফয়সালার উদ্যোক্তা দরবেশ নূর কুতুব-ই-আলম।

রাজা গণেশ চমকে উঠলেন। বললেন, ফয়সালার ধরনটা কি আঁচ করতে পেরেছেন?

ঃ শুধু আঁচ করা নয়, গোটা ব্যাপারটাই জেনে নিয়ে এসেছি।

ঃ ব্যাপারটা খুলে বলুন তো শুনি?

সহদেব রায় সুফী সাহেবের প্রথম উদ্যোগ থেকে আরম্ভ করে তাকে এখানে ফরমানসহ প্রেরণ করার তামাম কাহিনী সবিস্তার বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ সুফী সাহেব চেষ্টা করছেন সুলতানকে পাণ্ডুয়ায় আর শাহাবউদ্দীনকে সোনারগাঁয়ে দুইজনকে দুই জায়গায় স্বাধীন সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে।

শুনে রাজা গণেশ দুই চোখে তামাম দুনিয়া আঁধার দেখতে লাগলেন। তিনি এত মুষড়ে পড়লেন যে, কিছুক্ষণ দম ফেলতেও ভুলে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে সখেদে বললেন, একেবারে গুটিয়ে আনা জালটা আবার এভাবে মেলে যাবে? না রায় সাহেব, তা হতে দেয়া যায় না। যে ভাবেই হোক, এই ফয়সালাটা রোধ করতেই হবে।

সহদেব রায় বললেন, সেই রোধটা করা যাবে কেমন করে? ব্যাপারটা তো সুলতানের হাতে নেই। ঐ দরবেশটার হাতে। ওখানে তো কোন বুদ্ধি-কৌশল খাটবে না?

ঃ তাহলে?

সহদেব রায় ভাবতে লাগলেন। কোন কূলকিনারা না পেয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন, ফয়সালায় বসতে চাচ্ছে বসুক না হয়। মিট-মাট তো নাও হতে পারে? মুখে যে যা-ই বলুক, কে চায় নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য ছেড়ে দিতে?

রাজা গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, রায় সাহেব, আপনি বিজ্ঞ লোক। কথাটা কিন্তু বিজ্ঞের মতো বললেন না।

ঃ মানে?

ঃ এদের আপনি চেনেন না। দীল এদের মোমের চেয়েও নরম। একটু তাপ লাগলেই গলে যাবে। দুই ভাই এক জায়গায় হলে আর কথা আছে? যে যা চায় তাই দিয়ে ফয়সালা করতে এরা এতটুকু ইতস্তত করবে না। ঐ দরবেশটা যা বলবে, চোখ বুজে দুইজনই তা-ই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে।

ঃ এতটা কি সত্যি সত্যিই সম্ভব?

ঃ হ্যাঁ, এতটাই সম্ভব। এমনিতেই একজনকে সরানোর ব্যাপারেই আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে। জানের উপর সীমাহীন ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, তাতে আবার

দুইজন যদি দুইদিকে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আর খেই পাবেন কেমন করে? একটা সাফ করলেও আর একটা রয়েই যাবে।

সহদেব রায় নির্জীব কণ্ঠে বললেন, সে অবস্থায় ব্যাপারটা ঠিক তাই।

ঃ আজীবন সাধনা করে এতদূর এগিয়ে ছিলাম। বয়স তো এখন শেষের দিকে। ওখানে আবার নতুন করে পথ তৈরি করবে কে, আর এই বুকের কাঁটা নামাবে কে? এই বাংলা মুলুকে আমাদের স্বজাতির ভবিষ্যৎ যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সহদেব রায় বললেন, দাদা!

ঃ দীর্ঘকাল ধরে আমরাই ছিলাম এদেশের মালিক। হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসলো যারা, দিনের পর দিন এদেশে তারাই প্রভুত্ব করে যাবে আর আমারা বংশানুক্রমে গোলামী করবো তাদের? অসম্ভব! আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে এই যবনদের এ দেশে আর স্থায়ী হতে দেবো না। পথ একটা পেতেই হবে আমাদের।

দুইজনই বসে বসে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে রাজা গণেশ বললেন,না রায় সাহেব। খামাখা আর হাতড়িয়ে লাভ নেই। চরম পথই ধরতে হবে আবার।

ঃ চরম পথ!

ঃ হ্যাঁ। কাজটা খুব শক্ত এবং ঝুঁকিও আছে খুব। তবু এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ আমাদের নেই।

ঃ মানে ?

ঃ বিশবৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনাশ করা। বাপ আর অন্যান্য ভাইদের মতো এটাকেও সরিয়ে ফেলা।

ঃ তার পথ?

ঃ শাহাবউদ্দীনের শিবিরের উপর অতর্কিতে হামলা চালাতে হবে। লড়াইয়ের জন্যে কেউ এখন তৈরি নেই ওখানে। শাহাবউদ্দীনকে তাঁর ছাউনির মধ্যেই খতম করে দিতে হবে। ফয়সালায় বসার আগেই চরম ফয়সালা আমাদেরই করে ফেলতে হবে।

সহদেব রায় উৎসাহিত হয়ে উঠে আবার দমে গেলেন। বললেন, কিন্তু কৈফিয়ৎটা দেবেন কি?

রাজা গণেশ বললেন, আমাদের সবাইকে তালিম দিয়ে রাখতে হবে। বলতে হবে, অপর পক্ষ অতর্কিতে হামলা করার ফলেই পাল্টা হামলা চালাতে হয় আমাদের। যে কৈফিয়াত দিয়ে ছত্রার ময়দানের খুনগুলো ঢেকেছি, এটাকেও সেই ভাবেই ঢাকতে হবে। আত্মরক্ষার তাকিদে না চিনে কে কখন হত্যা করেছে শাহাবউদ্দীনকে, তা ঠাহর করা যায় নি।

ঃ বার বারই ঠাহর করতে পারিনি – এ দোহাই কি খাটবে দাদা?

ঃ পরিস্থিতি বুঝে ঠাহর আমরা করলেও করতে পারি। ফৌজের সব সেপাই-ই তো ভক্ত নয় আমাদের। বেয়ারা কয়েকটাকে সনাক্ত করে দিলেই চলবে।

ঃ তা অবশ্য ঠিক, তবে –

ঃ এত তবে আর কিন্তু করলে তো কাজ হবে না রায় সাহেব। যে ব্রত আমরা নিয়েছি, তাতে ঝুঁকি কিছু থাকবেই।

ঃ না, আমি বলছিলাম, আমার পকেটে যে সুলতানের অন্যরকম ফরমান আছে!

ঃ ওটা পকেটের মধ্যেই থাকবে।

ঃ মানে?

ঃ আপনি এখনও গোয়ালপাড়ায় পৌঁছান নি। পথের মধ্যেই আছেন।

ঃ কেউ যদি দেখে থাকে?

ঃ সে ভুল দেখেছে। কাকে বলে কাকে দেখেছে?

ঃ কিন্তু –

ঃ আপনি আগামীকাল সকালে জানান দিয়ে গোয়লপাড়ায় আসবেন। আজ আপনি আসেন নি। আপনি আসার আগেই যা ঘটবার তা আজ ঘটে গেছে।

ঃ চমৎকার!

সহদেব রায়ের দুই চোখে আনন্দ ফুটে উঠলো। রাজা গণেশের মাথার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বললেন, সত্যি দাদা, উজিরী করার জন্যে জন্ম হয়নি আপনার। আপনার যোগ্য স্থান মসনদ।

রাজা গণেশ বাধা দিয়ে বললেন, থাক। চাটুকারিতার সময় এটা নয় রায় সাহেব। সামনে এখন অনেক কাজ।

সহদেব রায় প্রশ্ন করলেন, এবার কি আমরা নেমে পড়বো?

ঃ পাগল! আমরা কোন সাত-পাঁচে নেই। যে গিদ্দরেরা কাজ করেছে বরাবর, এবারও কাজ করবে তারাই। ডাকুন এবার সবাইকে। মেড়াগুলোর দুই কান যুৎসই করে মলে দেই। দেখবেন, নিজ গরজেই তারা তামাম কাজ সারা করে দেবে। আমাকে আপনাকে কেউ এসবের ধারে কাছেও দেখবে না।

এবার মুহব্বত খাঁকে ডাকা হলো। পর্দার ওপার থেকে মহব্বত ভেতরে এসে দাঁড়ালে রাজা গণেশ প্রশ্ন করলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মহব্বত খাঁ বুদ্ধি করে বললো এই দুয়ার থেকে ঐ একটু দূরে পাহারায় ছিলাম হুজুর! একটা কুকুর বেড়ালও এদিকে আসেনি।

সহদেব রায় বললেন, বহুত আচ্ছা। এবার যাও। জলদি দৌলত খাঁ, মুরাদ বেগ, বিন-বিল্লাহ, আব্দুল লতিফ, আরব আলী এদের সন্ধান করো। যেখানে পাও, এক্ষুণি তাদের ডেকে আনো। বলবে, খুব জরুরী।

মুহব্ব খাঁ বেরিয়ে গেলো। সহদেব রায়ও আড়ালে গিয়ে বসলেন। সালার দৌলত খাঁ ইতিমধ্যেই খিমার দিকে আস্‌ছিলেন। তাঁকে বার্তা দিয়ে খানিক পরই মুরাদ বেগ, আরব আলী, বিন বিল্লাহ আর আব্দুল লতিফকে সঙ্গে নিয়ে মুহব্বত খাঁ ফিরে এলো। মুহব্বত খাঁকে বাইরে যাবার ইঙ্গিত করে রাজা গণেশ বললেন, আপনারা কেউ অবগত আছেন কিনা জানি না। আমাদের সবার সামনে বিশেষ করে আপনাদের সামনে এখন এক বিরাট দুর্যোগ। বাঁচা-মরার প্রশ্ন! পাণ্ডুয়ার সুলতান আর শাহজাদা শাহাবউদ্দীন – এঁরা ভাইয়ে ভাইয়ে এক হয়ে যাচ্ছেন!

দৌলত খাঁ বললেন, মানে?

রাজা গণেশ বললেন, মানে খানকাহ শরীফের সুফী সাহেব সুলতান আর তাঁর ভাইকে নিয়ে বসে ছিলেন। স্থির হয়েছে আর তাঁরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ফ্যাসাদ করবেন না। দুইভাই এক হয়ে এ রাজ্য চালাবেন।

বিন বিল্লাহ বললো, সে-কি!

ঃ সেই কথাই তো বলছি। একমাত্র এই শাহাবউদ্দীনই জানে, সুলতানের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর বাপ ও ভাইদের কারা খুন করেছে। এখন তারা এক হয়ে গেলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবুন একবার!

এদের সকলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। আরব আলী কম্পিত কণ্ঠে বললো, নির্ঘাত মৃত্যু! এমন হলে আর আমাদের বাঁচার কোন আশাই নেই।

বিন বিল্লাহ বললো, এমনিতেই সুলতানের গুপ্তচর এখনও সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, তাঁর বাপ-ভাইয়েরা কার কার হাতে মরেছে। সুলতানের সাথে শাহাবউদ্দীনের মিল হলে সে তো সব কিছুই ফাঁস করে দেবে। মুরাদ বেগ বললো, আমার তো বিপদ তার চেয়েও বেশী। ঐ শাহাবউদ্দীনের উপর আমি সরাসরি নিজে চড়াও হয়েছি। সে ফস্‌কে গেলে সুলতানের নিষেধ সত্ত্বেও কুকুরের মতো তাড়া করে আমি তার পেছনে পেছনে ছুটেছি এবং তাকে এই মুলুক ছাড়া করেছি। এর বদলা সে তো নেবেই।

রাজা গণেশ বললেন, নেবে মানে! দুই ভাই এক হলে তাদের যারা সত্যিকারের দুশমন, তাদের সবাইকে সবংশে নির্বংশ করে দেবে এবার।

দৌরত খাঁ বললেন, আমার কথা ভেবে দেখেছেন কেউ? এই রাজা সাহেবদের কথায় আপনাদের সব কিছুতেই নেতৃত্ব আমি দিয়ে আসছি। গোপনতো এটা থাকবে না। ফাঁস হয়ে যাবেই। আমার ওপর গজবটা কারো চেয়ে কম আসবে কিছু?

রাজা গণেশ বললেন, বিপদের কথা বসে বসে ভাবলেই তো আর বিপদ কেট যাবে না। বিপদ থেকে মুক্তি কিসে পাবেন, সেই কথা ভাবুন।

হতাশাগ্রস্ত দৌলত খাঁ বললো, আমাদের এই গোবর মাথা সারা বছর ঠুকলেও আর কোন বুদ্ধি বেরুবে না। আমাদের সব সময়ই আশা ভরসা রাজা সাহেব। সব সময়ই

তার বুদ্ধিতে চলেছি। এবারও তাঁর বুদ্ধিতেই চলতে চাই।

মুহব্বত খাঁ পান-পাত্র পরিবেশন করে গেলো। রাজা গণেশ সেটা অন্যের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, অন্য কোন বুদ্ধিই এখানে খাটবে না। শুধু একটা বুদ্ধিই আছে, এখন যদি সেটা আপনারা কাজে লাগাতে পারেন।

সকলেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, বলুন কি করতে হবে আমাদের?

ঃ এই রাত্রেই অতর্কিতে শাহাবউদ্দীনের ছাউনির ওপর আক্রমন চালিয়ে তাকে যদি হত্যা করতে পারেন, তাহলে সব কণ্টক সাফ! দুশ্চিন্তার আর বালাই কিছু থাকে না।

দৌলত খাঁ বললো, লড়াই যে স্থগিত আছে? রাজা সাহেব বললেন, সেই জন্যেই তো সুবিধে। সামনাসামনি লড়ে তো এতদিন কিছুই করেত পারেন নি। এই মওকাই কাজে লাগাতে হবে। যুদ্ধের জন্যে ও পক্ষ এখন আদৌ তৈরি নেই। এখন আক্রমণ করতে পারলে সহজেই কাজ উদ্ধার করতে পারবেন। কাজ শেষে জানাবেন, তারা অতর্কিতে হামলা করে বলেই আত্মরক্ষার খাতিরে আপনাদেরও হামলা চালাতে হয়েছে। লড়াইয়ের হুট্‌পিটের মধ্যে কি ভাবে আর কার হাতে শাহজাদা মারা পড়লেন, তা কেউ আপনারা খেয়াল করতে পারেন নি।

খুশীতে সবার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই বুদ্ধির জন্যে রাজাকে মোবারকবাদ জানিয়ে সকলেই খোশদীলে বিদায় হলো। স্থির হলো আজকেই সাঁঝরাতে কাজ উদ্ধার করবে তারা।

দৌলত খাঁ, মুরাদ বেগ, আরব আলী আর বিনবিল্লাহ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ঐদিন সাঁঝের পরই শাহজাদা শাহাবউদ্দীনের শিবির অতর্কিতে ঘিরে ফেলে নিরস্ত্র শাহাবউদ্দীনকে ছাউনির মধ্যেই হত্যা করলো। শাহাবউদ্দীনের ফৌজ বিশ্রামরত থাকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা চারদিকে পালিয়ে গেলো।

গোয়ালপাড়ায় সুলতানী শিবিরে অকস্মাৎ হৈচৈ শুনে সেদিন সাঁঝরাতে সকলেই চমকে উঠলো। স্থগিত লড়াই হঠাৎ আবার শুরু হওয়ায় সকলে বিস্মিত হলো। শেখানো অনুচরেরা খিমায় খিমায় ঘুরে সংবাদ প্রচার করতে লাগলো যে, শাহজাদা শাহাবউদ্দীন লড়াইয়ের কানুন খিলাপ করে অকস্মাৎ সুলতানী ফৌজকে হামলা করলে সুলতানী ফৌজ পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের খামোশ করে দিয়েছে।

উজির খানজাহান খবর পেয়েই চমকে উঠলেন। লাড়ই সংক্রান্ত উজির রাজা গণেশের তালাশ করলেন। রাজা গণেশও ঐ একই খবর পরিবেশন করলেন। বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, ওদিক এখন ঠাণ্ডা।

উজির খানজাহান পেরেশান দীলে প্রশ্ন করলেন, শাহজাদা শাহাবউদ্দীন? তাঁর খবর কি?

রাজা গণেশ তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, হয় তো উনি কয়েদ হয়েছেন। নইলে

ওপক্ষের ফৌজেরা সব পালিয়ে যাবে কেন?

এ কথায় খানজাহান সাহেব আরো অধিক চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, সেকি! তাহলে আর নিশ্চিন্তে আছেন কেন? শীগগির ওদিকে খোঁজ নিন। শাহাজাদার কোন কিছু হলে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে!

রাজা গণেশ এতে গোস্বা হলেন। বললেল, এ হুকুম আপনি আমাকে দিতে পারেন না।

ঃ মানে?

ঃ পদমর্যাদায় আমি এখন আপনার অনেক ওপরে। আপনার পক্ষে এটা এখন সেরেফ একটা গোস্তাকী।

ঃ কিন্তু –

ঃ কিন্তু এখানে যা-ই থাক, এটা নিয়ে হয়রান হওয়ার আপনার কোন এক্তিয়ার নেই। লাড়াইয়ের দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁরাই এটা দেখবেন।

আর এক লহমা না দাঁড়িয়ে রাজা গণেশ মেজাজের সাথে সেখান থেকে চলে গেলেন। শাহাবউদ্দীনের খোঁজ-খবর না পেয়ে অনেকের মনে ধারণা হলো বন্দী করাই হয়েছে তাকে। ভরত সিং, মীর মতিন, ইয়ার বক্স এদেরকে উজির সাহেব জিজ্ঞাসা করলে এড়াও জানালেন, কয়েদই হয়েছেন শাহজাদা।

শাহজাদার ব্যাপারে কারো কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে নিজেই তিনি ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করতে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কোন আমল না দেয়ায় খানজাহান সাহেব কিছুই করতে পারলেন না। পেরেশান হয়ে নিজের ছাউনিতে ফিরে এলেন আবার।

পরের দিন সবেরে দেখা গেলো সালার সহদেব রায় চারদিকে জানান দিয়ে গোয়ালপাড়ার শিবিরে এসে পৌঁছছেন এবং বুলন্দ কণ্ঠে সুলতানের ফরমান ঘোষণা করছেন।

মুহব্বত খাঁর কাহিনী শেষ হলে আলী আশরাফ বিলুপ্তজ্ঞান অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলো। পরে সে ধীরে ধীরে বললো, সবার আগে আমার দীলে একটা সওয়াল জাগছে – তা হলো, আপনি যখন জানলেন আপনার মুনিবকে সেরেফ হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে ওরা, ওরা তাঁর আসল দোস্ত নয়, তখন আপনার মুনিবকে তা জানালেন না কেন?

ম্লান হেসে মুহব্বত খাঁ বললো, পাগল হয়েছেন আপনি! এঁরা কি আপনার আব্বার মতো মুনিব? এ ভুল অন্য যেসব নওকরেরা করেছে, তারা কেউ আর ইহদুনিয়ায় নেই। এই সব মোনাফেকেরা শুধু মোনফেকই নয়, গিদ্দরও বটে। এদের মাথায় মুগুর মেরেও কেউ এদের সমঝাতে পারবে না যে, ওরা এদের দোস্ত নয় – দুশমন। আমরা হলেম নওকর। পথের একটা কুকুর বেড়ালের চেয়েও এদের কাছে আমরা তুচ্ছ জীব।

আমাদের কথা কানে তোলে এরা? খামাখা বেত্তমিজী করে জান দিতে চায় কে?

আলী আশরাফ আবার নীরব হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বললো, সুলতান তো নিশ্চয়ই এ খবর পেয়েছেন?

ঃ রাজা গণেশ রাত পোহালেই এই বার্তা নিয়ে পাণ্ডুয়ায় ছুটে গেছেন। সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে এসেছে। তারা যা বলছে তাতে খবর পেয়ে সুলতান নাকি হাউ হাউ করে কেঁদেই সারা হয়েছেন।

ঃ রাজা গণেশ নিজে গেলেন?

ঃ যাবে না? ধূর্তের ছলের অভাব আছে? এই ঘটনাকে যে কোন রঙে রাঙিয়ে তিনি সুলতানকে পরিবেশন করবেন, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?

ঃ বলেন কি!

ঃ দেখবেন, এই খুনের অপরাধে কত নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটে!

ঃ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে কেন?

ঃ ঘটবেনা? যে কয়জন সেপাই এই অন্যায় হামলা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, তাদেরকে তো তামামই কয়েদ করা হয়েছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেয়ার মতো হয়তো দেখা যাবে, এই খুনের দায়ে এদেরই লাশ এই গোয়ালপাড়ায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

হলোও ঠিক তাই। ঐদিনই সুলতান গোয়ালপাড়ায় হাজির হলেন। যা বোঝাবার রাজা গণেশ আগেই তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন। গোয়ালপাড়ায় হাজির হওয়ার সাথে সাথে প্রায় সব আমির-উমরাহ-সালার সমস্বরে তাঁকে আরো জোরদারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, অতর্কিত হামলার ফলে আত্মরক্ষার জন্যে তাদেরকেও পাল্টা হামলা করতে হয় বটে, কিন্তু শাহজাদার কোন অবমাননা যেন কিছুতেই না হয় – এ ব্যাপারে সবাইকে বার বার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। কিন্তু কয়জন বেঈমান কোন এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে শাহজাদার তাঁবুতে ঢুকে তাঁকে নির্মমভাবে সেখানেই হত্যা করেছে। সন্ধান পেয়েই অন্যান্য সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাদের কয়েদ করে ফেলেছে এবং হুজুরের নির্দেশের অপেক্ষায় তারা এখনও কয়েদ অবস্থাতেই আছে।

উপস্থিত সেপাইগণ ও শেখানো লোকজনও একই সুরে ঐ একই কথা পরিবেশন করলো। সবার মুখে একই বার্তা প্রতিধ্বনিত হওয়ায় শোকে ক্ষোভে মুহ্যমান সুলতান তৎক্ষণাৎ তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। উজির খানজাহান ও অল্প কয়েকজন প্রাণপণ কোশেশ করেও আলাদা কোন ধারণা সুলতানের দীলে পয়দা করতে পারলেন না।

নিরপরাধ ও সত্যাশ্রয়ী একদল সেপাইয়ের রক্তে গোয়ালপাড়ার লড়াইয়ের শেষ উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের তামাম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। তাঁর এই পদক্ষেপের পুরস্কারস্বরূপ খানাকাহ শরীফে দাফন করার জন্যে সুফী সাহেব লাভ করলেন শাহজাদা শাহাবউদ্দীন আজম শাহর পচা-গলা লাশ।

পাঁচ

উঠে গেলো গোয়ালপাড়ার ছাউনি। সব কিছু ফিরে এলো পাণ্ডুয়ায়। ফিরে এলো লোক-লস্কার। ফিরে এলো লটবহর। উজির খানজাহানের বহরের সাথে পাণ্ডুয়ায় ফিরে এলো আলী আশরাফও। কিন্তু তার কোন কাজ নেই। নামকাওয়াস্তে উজির খানজাহানের তদারকী বাহিনীর সাথে সামিল হয়ে থাকলেও পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসার পর থেকেই আলী আশরাফের অখণ্ড অবসর।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ গোয়ালপাড়া থেকে ফিরে এসেই শয্যা গ্রহণ করেছেন। ভয়ানক অসুস্থ তিনি। সবার সাথেই দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন। উজির খানজাহান সাহেব আলী আশরাফকে জানালেন, সুলতান তাঁর সুপারিশ পত্র পেয়েছেন। শীগগিরই একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন আলী আশরাফের। ততদিন এইভাবে চুপচাপই থাকতে হবে আলী আশরাফকে। খাবেদাবে আর ঘুমুবে।

আলী আশরাফের নিজস্ব কোন লটবহর নেই। একটা দেহ, একটা প্রাণ, এক প্রস্থ হাতিয়ার আর নিজস্ব একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া, এই হলো আলী আশরাফের সাকুল্যে স্বম্বল। এই নিয়ে সে খানজাহানের দপ্তরের এক কোণে পড়ে থাকে। সেখানেই সে খায়-দায় আর রাত্রিকালে সেখানেই সে এক কামরায় ঘুমায়। হাতে কোন কাজ না থাকায় আলী আশরাফ সারাদিন ঘোড়া হাঁকায়। শহরের ভেতর-বাহির সর্বত্র একটানা ছুটে বেড়ায়। সে পথ ঘাট পরখ করে, পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে, চারপাশে ঘুরে শহরের অবস্থান নিরিখ করে দেখে। কোন কোন দিন আবার শহর থেকে অনেক দূরে চলে যায়। নদী-নালা, খাল-বিল, পথ-প্রান্তরবরাবর দিন ভর ছুটে। শামওয়াক্তে আস্তানায় ফিরে এসে যা পায় তা-ই খায়। এর পর সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। এক বিচিত্র জীন্দেগীর সাথে এখন সামিল হয়েছে আলী আশরাফ।

কয়েক দিন পর হঠাৎ একদিন আলী আশরাফের খেয়াল হলো– তার কর্তব্যের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁক খেকে যাচ্ছে! সুলতান অসুস্থ এ সংবাদ পাওয়ার পর এতদিন তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত ছিল তার। পাণ্ডুয়াতেই থেকে তাঁর প্রতি এই উদাসীনতা সুলতান হয়তো খোশদীলে নাও নিতে পারেন। সাত পাঁচ ভেবে আলী আশরাফ পা বাড়ালো শাহী মহলের দিকে।

ফটকের সামনে আসতেই সেই দ্বাররক্ষী সেপাইটা ছুটে এলো। সালাম দিয়ে বললো,

হুজুর আপনি?

আলী আশরাফ বেখেয়ালে বললো, আমি মানে?

ঃ আপনি সেই সুফী সাহেবের কাসেদ নন?

ঃ হ্যাঁ, আমি সেই লোক।

ঃ বলুন হুজুর, কি খেদমত করতে পারি?

ঃ না, আজ আমি সুফী সাহেবের কাসেদ হয়ে আসিনি।

ঃ তবে?

ঃ এখন এই হুকুমাতেরই আমি একজন খাদেম। শাহী মহলে কাজ আছে।

ঃ তা ঐ একই কথা হলো হুজুর! আসুন।

দ্বাররক্ষী ফটকের দ্বার মেলে ধরলো। আলী আশরাফ ভেতরে গেলে সে আবার ফটকের দ্বার বন্ধ করে দিলো। ভেতরে ঢুকে আলী আশরাফ পরিচিত চত্বরগুলি পেরিয়ে সেই বিশ্রামকক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। যে বান্দাটি সেদিন আলী আশরাফের মেহমানদারি করেছিল সে টের পেয়েই পড়িমরি ছুটে এলো। খোদ সুলতান যার মেহমানদারির আদেশ দেন, তিনি ফালতু লোক নন। সে সামানে এসেই সালাম দিয়ে বললো, হঠাৎ হুজুর যে!

ঃ হ্যাঁ, আবার আমি এলাম।

ঃ মারহাবা! মেহেরবাণী করে তশরীফ রাখুন হুজুর।

ঃ না আমি বসবো না। আমি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তাঁর খাস মহলের পথ আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে।

ঃ আসুন জনাব, আসুন।

শাহী মহলে নিজের কদর সম্বন্ধে আলী আশরফ এক উৎসাহজনক অভিজ্ঞতা লাভ করলো। আলী আশরাফকে নিয়ে আরো কয়েক চত্বর পেরিয়ে বান্দাটি এসে সুলতানের বালাখানায় ঢুকলো। বালাখানার বান্দা ইয়াকুত আলীকে না পেয়ে সে আলী আশরাফকে বললো, মেহেরবানী করে এখানে একটু তশরীফ রাখুন হুজুর, আমি ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসি।

আলী আশরাফকে বসিয়ে রেখে সে ভেতর মহলে চলে গেলো এবং খানিক পরেই সুলতানের খাসবান্দা গাজী গাফফারকে সঙ্গে নিয়ে বালাখানায় ফিরে এলো। বালাখানায় ঢুকতে ঢুকতে গাজী গাফফার খানিকটা নাখোশ কণ্ঠে বললো, হুজুরে আলা আজ কয়দিন থেকেই অসুস্থ। উনি কারো সাথেই সাক্ষাৎ দেননি এ যাবত। আজও তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। আপনি আরো কয়দিন পরে আসুন।

বলেই সে মুখ তুলে আলী আশরাফের দিকে ভাল করে চেয়েই চমকে উঠলো। দ্রুতপদে আরো কাছে এগিয়ে এসে বললো, কে, কে আপনি?

আলী আশরাফ তার ব্যস্ততার কারণ খুঁজে পেলো না। সে শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দিলো, আমার নাম আলী আশরাফ।

ঃ আলী আশরাফ! আপনি কি আমাদের আসগার হুজুরের ছেলে– মানে সালার আলী আসগারের আওলাদ?

ঃ হ্যাঁ, আমি তাঁরই আওলাদ।

খুশীতে গাজী গাফফারের চোখ মুখ ভরে উঠলো। সে বিনয়ের সাথে বললো, সালাম হুজুর, সালাম। আহা! ঠিক বাপের মতোই চেহারাখান! আল্লাহ আপনাকে হায়াত দারাজ করুন!

ঃ আপনি কি আমার আব্বা হুজুরকে চিনতেন?

ঃ চিনবো না মানে! আমি সুলতান হুজুরের বচপন কালের বান্দা। সুলতান বাহাদুর যখন শাহজাদা ছিলেন তখন আসগার হুজুরের নছিহৎ ছাড়া এক ধাপও নড়েন নি। হামেশাই তাঁর কাছে কাছে থেকেছেন। সেই সুবাদে আমারও আসগার হুজুরের খেদমত করার খোশ নসীব হয়েছে। আমাকেও আসগার হুজুর খুবই পেয়ার করতেন।

ঃ আপনি মুহব্বত খাঁকে চেনেন?

ঃ সে তো আপনার আব্বারই নওকর ছিল। সে আমার দোস্ত। দুইজন কতদিন একসাথে কত গপ্প করেছি।

এরপর গাজী গাফফার নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বেচারার বদনসীব! আসগার হুজুর চলে গেলেন আর পেটের দায়ে মুহব্বত ভাইকে এক বদমেজাজী আদমীর অধীনে নকরী নিতে হলো!

বিশ্রামখানার বান্দাটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সে ইতস্তত করে বললো, তাহলে এখন আমি আসি হুজুর?

জওয়াবে গাজী গাফফার বললো,হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি এসো। আমি একটু হুজুরের সাথে কথা বলি। হঠাৎ যখন এমন একটা খোশনসীব হলো আমার, তখন কি আর হুজুরকে আমি এক কথায় বিদায় দিতে পারি?

বিশ্রাম কক্ষের বান্দাটি বেরিয়ে গেলো। আলী আশরাফ সংকুচিত হয়ে বললো, আপনি আমার বাপের বয়সী মানুষ, আমার আব্বা আপনাকে পেয়ার করতেন, আর সেই আপনি এত হুজুর হুজুর করলে তো আমি সহজভাবে কথা বলতে পারিনে! আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন।

গাজী গাফফার শরমিন্দা হয়ে বললো, আমি একজন নগণ্য নফর, সব সময়ই হুজুরদের গোলাম। গোলাম হয়ে এই যে আপনার সাথে জান খুলে কথা বলতে পারছি, এই তো আমার পরম সৌভাগ্য! আসলে এভাবে আপনাদের সাথে কথা বলাও তো আমার গোস্তাকী। এর উপর আরো বাড়াবাড়ি করলে আমিও যে সহজভাবে কথা বলার মওকা পাইনে হুজুর?

গাজী গাফফারের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তা দেখে আলী আশরাফ বললো, আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যেভাবে আরাম বোধ করেন সেইভাবেই কথা বলুন। কিন্তু তার আগে আপনার নামটা যে আমার জানা দরকার?

ঃ জি, বান্দার নাম গাজী গাফফার। আপনি গাফফার বলে ডাকবেন।

আলী আশরাফ হেসে বললো, শুধু তো গাফফার বলা যায় না! গাফফার চাচা।

গাজী গাফফারও হেসেই জবাব দিলো, যা আপনার মর্জি।

ঃ আচ্ছা চাচা, এতই যখন আপন ভাবছেন আমাকে, এখন একটা কথার জওয়ার দিতে পারেন কি?

ঃ বলুন বাপজান, কি আপনি জানতে চান? অন্য কেউ হলে অবশ্য এত কথাও বলতাম না বা কোন কথা কাউকে বলার এক্তিয়ারও নেই আমার। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। বলুন, আমার জানা থাকলে অবশ্যই তার জওয়াব দেব।

ঃ সুলতান কি দোস্ত-দুশমন আদৌ চিনতে পারেন না?

ঃ বড় কঠিন প্রশ্ন বাপজান। চারদিক থেকে এই একই প্রশ্ন সুলতানের সামনে এসে হামেশাই পড়ছে। যে দোস্ত তিনিও তাঁকে এই প্রশ্নই করছেন, যে দুশমন তিনিও এসে ঐ একই প্রশ্ন তুলছেন। এ অবস্থায় সুলতানের কি সাধ্য আছে এক কথায় দোস্ত দুশমন নিরূপণ করে ফেলেন?

ঃ গাফফার চাচা!

ঃ যে ভুল মরহুম হুজুর সিকান্দার শাহ আপনার আব্বার আর আমাদের বর্তমান সুলতান হুজুরের উপর করে গেছেন, ঐ ভুল আর সুলতান হুজুর করতে চান না। হুট করে দুশমন বলে ভেবে না নিয়ে যদি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে দেখতেন উনি, তাহলে আসগার হুজুর আর আমাদের সুলতান হুজুরের মতো আপন লোককে দুশমন ভাবার মতো এত বড় মারাত্মক ভুল মরহুম হুজুর সিকান্দার শাহ কখনও করতেন না।

ঃ চাচা!

ঃ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন দুশমনকেই এই সুলতান হুজুর দুশমন বলতে রাজী নন। এ নিয়ে টুকিটাকি অনেক আলাপই হুজুরের সাথে হয় আমার। কিন্তু আমি দেখেছি, তিনি তাঁর মত থেকে এক তিলও সরে আসতে রাজী নন।

ঃ আচ্ছা চাচা, আপনিও কি কিছু অনুমান করতে পারেন না?

গাজী গাফফার ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বাপজান, আমরা বান্দা। আমাদের কাজ শুধু উপদেশ নেয়া আর হুকুম পালন করা। উপদেশ দেয়ার মতো এতটুকু সুর যদি ভুলেও এ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, তাহলে এ কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। গোস্তাকী এ হেরেমে কোন দিনই ক্ষমা পায়নি বাপজান। সেধে কে নিজের মওত নিজে ডেকে আনবে, বলুন?

আলী আশরাফ খামোশ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ দুইজনই নীরব হয়ে রইলো। তারপর গাজী গাফফার বললো, সুলতান বাহাদুরের সাথে কি আপনার একান্তই সাক্ষাৎ করা দরকার বাপজান?

আলী আশরাফ বললো, না, ঠিক একান্ত দরকার নয়। উনি অসুস্থ এটা জেনে সাক্ষাৎ করতে না আসাটা কেমন দেখায় ভেবেই আমি এসেছি।

তাহলে বাপজান, তাঁকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ পর উনি এখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন আছেন। সবাইকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন এ যাবত। আপনাকে যদি ফিরিয়ে উনি নাও দেন, তাহলে তাঁর খুবই তকলিফ হবে সাক্ষাৎ দিতে।

ঃ না, না, আমি তাঁকে কোন তকলিফ দিতে চাই নে, বরং আমার আসার কথা তাঁকে আপনি এক ফাঁকে জানাবেন। এখানে থেকেও আমি দেখা করতে আসিনি–এটা ভেবে তিনি যেন নাখোশ না হন।

গাজী গাফফারের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, আপনার উপর নাখোশ হবেন উনি? কি যে বলেন বাপজান! উনি আপনাকে কত পেয়ার করেন!

ঃ সে কি! আপনি কি করে জানলেন?

ঃ হুজুরই তো সে কথা সেদিন আমাকে বলছিলেন। হুজুরের মুখেই শুনলাম, আপনি আমাদের ফৌজে এসে যোগ দিয়েছেন। হুজুর বললেন, শুনেছো গাফফার, উজির খান জাহান সাহেব আমার কাছে আমার আসগার চাচার আওলাদকে পাঁচ শত ঘোড়ার অধিপতি করার জন্যে সুপারিশ করেছন। অথচ তার ফৌজী এলেমের যে ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন– সে ফৌজী এলেম এই পাণ্ডুয়ার কোন সালারেরও নেই। এমন বুযদীলও মানুষ হয়?

ঃ তারপর?

ঃ তারপর এ নিয়ে আর বেশী কথা না বললেও আমি বুঝলাম, আপনাকে নিয়ে অনেক বড় ধরনের চিন্ত-ভাবনা হুজুরের দীলে আছে।

আরো কিছুক্ষণ ছোট খাটো আলাপ-আলোচনার পর আলী আশরাফ গাত্রোত্থান করতে গেলে গাজী গাফফার বললো, এখনই উঠবেন হুজুর?

আলী আশরাফ বললো, আজ আমি যাই, বরং আর একদিন এসে এই শাহী মহলটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে যাবো। আজ নিয়ে দুই দুইবার এই মহলে এলাম, কিন্তু ভাল করে কিছুই দেখা হলো না।

ঃ আজ কি খুবই ব্যস্ত আছেন আপনি?

ঃ না, না, আমার কাজই নেই এখন।

ঃ তাহলে চলুন আজকেই সব দেখিয়ে দিই। সুলতান হুজুর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আত্মীয়-পরিজনেরাই ঘিরে থাকেন তাঁকে। আমি প্রায় অবসরে।

ঃ জি চাচা, তাহলে খুবই ভাল হয়। হাতে কোন কাজ না থাকায় আমারও এখন

সময় আর কাটতে চায় না।

দুজনেই বেরিয়ে পড়লো। সুলতানের খাশমহল, জেনানা মহল , মেহমানখানা, অস্ত্রাগার, দরবারকক্ষ, বাগবাগিচা, রঙ্গমহল– বাইরের দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে গাজী গাফফার সবই আলী আশরাফকে দেখালো। এর পর আরো কয়েকটি মহল পেরিয়ে অন্য একটি মহলের কাছে আসতেই নারী পুরুষের মিলিত কণ্ঠে তীব্র হাস্যোচ্ছ্বাস শুনে আলী আশরাফ থমকে দাঁড়িয়ে গেলো, বিস্মিত কণ্ঠে বললো, ওটা কিসের আওয়াজ গাফফার চাচা?

গাজী গাফফার মুচকি হেসে বললো, এই গোটাটাই শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা শাহর মহল। এখন আমরা তাঁর প্রমোদ ভবনের পাশ দিয়ে হাঁটছি।

ঃ প্রমোদ ভবন?

ঃ হ্যাঁ, শাহজাদা এখন তাঁর প্রমোদ ভবনে ফুর্তি করছেন।

ঃ ফুর্তি করছেন? কাদের নিয়ে?

ঃ বাইজী, কস্‌বী, আর নানা স্থানের খুবসুরত আউরাত নিয়ে। সাথে ইয়ার বন্ধুও আছে কিছু।

আলী আশরাফের বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেলো। বললো, যাঁর আব্বা এমন অসুস্থ, ভ্রাতৃ- বিয়োগের ব্যথায় যাঁর আব্বা এমন মর্মাহত, তিনি এ সময়ে এইভাবে ফুর্তি করতে পারেন?

গাজী গাফফার আবার একটু হাসলো। বললো, এই হচ্ছে পাণ্ডুয়ার বর্তমান সুলতান বংশের অবস্থা! কোথায় কি হলো, কোথায় কি এলো গেলো–তা নিয়ে পাণ্ডুয়ার ভাবী সুলতানের দীলে থোড়াই কোন চিন্তা-ভাবনা আছে। কোথাও থেকে নতুন আউরাত যোগাড় একটা হয়ে গেলেই শাহজাদার জন্যে সেটা মহোৎসবের লগ্ন। পাণ্ডুয়ার উপর দিয়ে তখন যদি মহাপ্রলয়ও বয়ে যায়, তা যাক! তা নিয়ে তখন জাররা পরিমাণ ভাবান্তরের ফুরসুৎও শাহাজাদার নেই। শরাব আর নতুন নতুন আউরাতই শাহজাদার কাছে এ দুনিয়ায় সব!

আলী আশরাফ অবাক হয়ে গাজী গাফফারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললো, নতুন নতুন আউরাতই? কোথা থেকে আসে?

ঃ অর্থের জোর বড় জোর এ দুনিয়াতে বাপজান। অর্থ দেখলে কত খানদান ঘরের রূপসী আউরাতও দীওয়ানা হয়ে ছুটে আসে শাহজাদার প্রমোদকক্ষে। আর অর্থের জোর একান্তই কাজ না দিলে গায়ের জোর তো আছেই। খোদ শাহজাদার খায়েশকে বাধা দিচ্ছে কে?

ঃ সুলতান এটা দেখেন না?

ঃ কি করবেন তিনি? শাহজাদা তো নাবালক নন, সাবালক। নসিহৎ উপদেশ না মানলে তিনি করবেন কি? আফসোস্ করা ছাড়া কিছু করার আছে? কোন

নালিশ-ফরিয়াদ থাকলে হয়তো তিনি তা দেখতে পারতেন। কিন্তু শাহজাদার অপ্রিয় হওয়ার ভয়ে কোন ফরিয়াদও কোন দিক থেকে আসে না।

ঃ চাচা!

ঃ দেশে কি মানুষ আছে বাপজান? সবাই ভাবী সুলতানের মন যোগাতেই উদগ্রীব। প্রতিবাদ করে কে?

আলী আশরাফ আর এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলো না। সে গাজী গাফফারের পিছে পিছে ঘুরে শাহী মহলের অবশিষ্ট অংশটুকুর উপর নজর বুলিয়ে গেলো। শাহী মহলের দৃশ্যের প্রতি তেমন কোন আকর্ষণ আলী আশরাফের দীলে আর ছিলো না। দীলে তার একটা প্রশ্নই জোরদার হয়ে উঠেছে তখন– এই হুকুমাতের হেফাজতির উম্মিদে মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখীরা কতই না উদগ্রীব!

* * *

একদিন পর আবার ছুটছে আলী আশরাফের ঘোড়া। শহরের পথ পেরিয়ে সে বাইরে চলে এসেছে। শহর ছেড়ে মেঠো পথে একটানা ছুটছে। বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় সামনে থেকে পেছন দিকে পালাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন আলী আশরাফ সামনের দিকে ছুটছে। বন- ফুলের বাহার, মত্ত অলির গুঞ্জন, পক্ষীকুলের ঐকতান– কিছুই যেন আলী আশরাফের পথ আগলাবার নয়! মেঠো হাওয়ার আমেজ, শ্যামলশস্যের হাতছানি, রাখালিয়া বাঁশী– কিছুই যেন আলী আশরাফের মন ভোলাবার নয়! আলী আশরাফ ছুটছে কোন এক অরূপের সন্ধানে, লোকালয়ের ওপারে কোন এক নিরুদ্দেশের পথে।

এই তার জন্মভূমি বাংলা মুলুক। এ দেশের মানুষেরই সীমাহীন নির্মমতায় তার জন্মদাতা পড়ে আছে জৌনপুরের মাটিতে, তার জন্মদায়িনী ঘুমিয়ে আছে পরদেশের ধূলোর তলে। প্রিয় স্বদেশ জন্মভূমি কোল দেয়নি তাদের। অনুদার কোল তার বেঈমানদের কাছেই বুঝি দায়বদ্ধ চিরকাল! ঈমানদরদের জন্যে বুঝি সূঁচাগ্র মেদিনীও অবশিষ্ট নেই এখানে। এই ক্ষোভেই আলী আশরাফ যেন পালিয়ে যাচ্ছে এই নৈরাশ্যের অঙ্গন থেকে! যেন ছুটে যাচ্ছে এক কল্পপুরীর আকর্ষণে, যেখান থেকে লায়লা আকতার ডাকছে তাকে অনুক্ষণ!

কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করে আলী আশরাফের অশ্ব অকস্মাৎ থেমে গেলো। সামনে এক প্রশস্ত স্রোতস্বিনী। হুঁশ হলো আলী আশরাফের! ছুটতে ছুটতে কত দূর সে এসেছে কে জানে! পেছনে তার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সামনে এই খরস্রোতা নদী। অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো আলী আশরাফ। নদীর তীর বেয়ে বেয়ে ধীর লয়ে হাঁটতে লাগলো ঘোড়া। অচেনা এই অঞ্চলটা চেনা হলে হয়ে যাক না! কখন কোন্ কাজে লাগে কে জানে! এখনও অনেকখানি বেলা আছে। ফিরলেই তো সেই নিষ্ক্রিয় ছন্দহীন জীবন! ভাল লাগেনা আলী আশরাফের। সে কাজ চায়। সংগ্রাম চায়। কোষমুক্ত অসি নিয়ে বেঈমানদের মুখোমুখী দাঁড়াতে চায়। লায়লা আকতারের স্মৃতিঘেরা জৌনপুর ছেড়ে সে

ঘুম পাড়তে এই বাংলা মুলুকে আসেনি!

খানিকদূর এগুতেই বাঁক নিয়েছে নদী। নদীটা ফের বেঁকে গেছে পাণ্ডুয়ার দিকেই। সেইদিকেই চলতে লাগলো আলী আশরাফ। সে ফিরতে ফিরতে দেখতে চায়, পাপেঘেরা পাণ্ডুয়ার কতখানি কোল ঘেঁষতে সাহস রাখে এ তটিনী!

আনমনে কত পথ সে এগিয়েছে খেয়াল নেই! হঠাৎ এক আর্তনাদে আলী আশরাফ সজাগ হয়ে উঠলো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াটাও কান দুটো খাড়া করে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। আর্তনাদটা সামনে থেকেই আসছে। একক নয়, বহু কণ্ঠের আর্তনাদ– বাঁচাও–বাঁচাও।

আলী আশরাফের হাত গেলো কোমরে। যথাস্থানে বাঁধা আছে তলোয়ার। ঢাল আছে পিঠের সাথে সাঁটা। আলী আশরাফ ইশারা দিলো অশ্বকে। অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ছুটতে লাগলো অশ্ব। ঝোপ ঝাড়টা পেরিয়ে সে সামনে এসেই দেখে, খোলামেলা নদীর পাড়ে এক মস্ত বড় বসতি। আর্তনাদটা ঐ বসতির ভেতর থেকেই আসছে। বসতির ভেতর ঢুকেই আলী আশরাফ অবাক হয়ে দেখে– একদল সশস্ত্র সেপাই একটা উদ্ভিন্ন যৌবনা খুবসুরত মেয়েকে বিবস্ত্র অবস্থায় জোর করে টেনে আনছে সামনে অবস্থিত একটা শিবিকার দিকে। জোর করেই তাকে ঐ শিবিকায় ওঠানোর প্রয়াস পাচ্ছে তারা। মেয়েটার বাপ-মায়েরা মেয়েটাকে মুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াসে সেপাইদের হাতে নির্মমভাবে মার খাচ্ছে আর ঐ 'বাঁচাও–বাঁচাও' রবে আর্তনাদ করছে। আলী আশরাফ আরো অবাক হয়ে দেখলো– বাচ্চা বৃদ্ধের মধ্যে ঐ বসতির প্রায় শতাধিক জোয়ান জোয়ান লোকেও দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে আর থর থর করে কাঁপছে। প্রতিবাদ করতে একজনও এগুচ্ছে না।

উল্কার বেগে ছুটে এলো আলী আশরাফ। সেপাইদের সামনে এসে গর্জে উঠে বললো, খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইদের তরবারি কোষমুক্ত হলো। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন সশস্ত্র সেপাই। এদের ভেতর থেকে একজন লাফ দিয়ে সামনে এলো। অসি হাতে সেও গর্জে উঠে বললো, হুঁশিয়ার কম্‌বক্‌ত্‌! জানের মায়া থাকলে এই ভীমরুলের চাকের মধ্যে নাক গলাতে এসো না। যে পথে এসেছো, সেই পথেই এক্ষুণি ওয়াপস যাও––

আলী আশরাফ তার চেয়েও বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, খামুশ! ঐ মেয়েটার গায়ে কেন হাত দিয়েছো তার উপযুক্ত কৈফিয়াত দাও।

ঃ খোদ শাহজাদার হুকুমেই ওকে আমরা ধরতে এসেছি।

ঃ তোমরা শাহী মহলের সেপাই?

ঃ শাহী মহলের না হলেও এই পাণ্ডুয়ার এক কিল্লারই আমরা সেপাই। এর বেশী জানতে চাইলে জান দিতে হবে– বেয়াকুফ।

বলেই সে হুকুম দিলো, এই দেখছিস কি? পাকড়ো ঐ নাদানকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা আলী আশরাফকে ঘিরে ফেলতে গেলো। আলী আশরাফও তলোয়ার খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। দুশমনেরা ঘিরতে তাকে পারলো না। আলী আশরাফের সুশিক্ষিত অশ্ব বিদ্যুৎ বেগে এই পদাতিক সেপাইদের মধ্যে ফেলে তাদের চারপাশ দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো এবং আলী আশরাফ এক ধারছে দুশমনদের মাথা কাটতে লাগলো। পলকের মধ্যে প্রায় দশ পনের জন সেপাই ধরাশায়ী হলো।

এমন বেপরোয়া ও মারাত্মক আক্রমণ একালোক চালাবে, এ ধারণা দুশমনদের একরত্তিও ছিলনা। হঠাৎ এই বিপর্যয় দেখে বাদ বাকীরা আতংকে শিউরে উঠলো এবং কেউ কারো অপেক্ষায় না থেকে যে যেদিকে পারলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। আলী আশরাফও কয়েক জনের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে পথের উপর শুইয়ে দিলো। তা লক্ষ্য করে ছুটন্ত দুশমনেরা দিশেহারা হয়ে কয়েকজন নদীতে ঝাঁপ দিলো এবং কয়েকজন বন জঙ্গল ভেঙ্গে সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় পড়িমরি পালিয়ে গেলো।

তামাম মুসিবত সাফ হয়ে গেলো। অপেক্ষমাণ লোকজন চারদিক থেকে ধন্য ধন্য রবে আশরাফের কাছে ছুটে এলো। আশরাফ তাদের লক্ষ্য করে বললো, এতবড় কাপুরুষ আপনারা কেন? আপনাদের চোখের উপর আপনাদেরই এক মা-বোন দুশমনের হাতে বেইয্যত হচ্ছে, আর আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন? এত লোক আপনারা, হাতে হাতে একখানা লাঠি নিয়ে ছুটলেই তো দুশমনেরা পালিয়ে যেতো ভয়ে?

উপস্থিত লোকদের একজন বললো, কি করবো হুজুর! আমরা কাঙাল-গরীব ছাপোষা মানুষ। পানিতে বাস করে কুমীরের সাথে লড়াই কেমন করে করবো আমরা?

ঃ মানে?

ঃ শুনলেন তো হুজুর, ওরা আমাদের শাহজাদার লোক। খোদ শাহজাদাই ঐ মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে লোক পাঠিয়েছেন। মুখের কথায় কাজ না হলে, শুনেছি, এমনই জোর করেই আউরাতদের তিনি ইদানীং ধরপাকড় করছেন। জুলুমের জন্যে যাঁর কাছে ফরিয়াদ করবো, তিনি নিজেই যদি জালিম হন, রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তাহলে আর আমাদের করার থাকে কি?

ঃ শাহজাদা জালিম হতে পারেন, কিন্তু সুলতান তো আর জালিম নন, তাঁর কাছে মযলুমেরা ফরিয়াদ করে না কেন?

ঃ তা করে কেউ রেহাই পাবে হুজুর? খোদ শাহজাদা যদি কারো উপর নাখোশ হন, তাহলে তার হাত ছান্দার কোন উপায় আছে? তাছাড়া – –

ঃ তা ছাড়া?

ঃ তিনিই তো আমাদের ভবিষ্যৎ সুলতান! এখন কিছু না করলেও সুলতান হওয়ার পর কেউ থাকতে পারবে ভিটে মাটিতে? এই যে আজ যা ঘটলো, এর জন্যেও হয়তো

জওয়াবদিহি করতে হবে আমাদের।

এরপর আর আলী আশরাফ জওয়াব দিতে পারলো না। সে গোপনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। শেষে একটা আশ্বাস দিয়ে বললো, জওয়াবদিহি করতে যাতে না হয় তা আমি দেখবো।

এই সময় এক মধ্যবয়সী লোক অশ্রুভরা নয়নে সামনে এসে দাঁড়ালো। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে বললো, আমি জান ভরে দোওয়া করছি হুজুর, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হায়াতদারাজ করুন। ঠিক সময়ে আপনি এসে না পড়লে এই গরীবের মান ইয্যত সব শেষ হয়ে যেতো!

আলী আশরাফ বললো, তামামই ঐ একজনের ইচ্ছা। মানুষের কি সাধ্য আছে নিজে কিছু করার?

ঃ কিন্তু সবই তো হলো হুজুর, এখন এই অভাগীকে নিয়ে আমি কি করি?

ঃ আপনি? আপনিই কি...

ঃ আমিই হতভাগীর আব্বা।

ঃ আচ্ছা! তা এত দূরে এই পল্লীতে আপনার ঘরে যে সুন্দরী মেয়ে আছে, শাহজাদা সেটা জানতে পারলেন কি করে?

ঃ এইটেই আমার বদনসীব হুজুর! কয়দিন আগে মেয়েটা এই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ঠিক ঐ সময় শাহজাদার বজরা নদীর এই ধার দিয়ে যাচ্ছিলো। বজরা থেকেই দেখে নিয়েছেন তিনি।

ঃ বজরা থেকেই তিনি কি করে বুঝলেন মেয়ে আপনার সুন্দরী?

ঃ দেখতে পেয়েছিলেন যে!

ঃ বেয়াদবী মাফ করবেন, মেয়ে তখন নিশ্চয়ই বেপর্দা বেআব্রু হয়েছিল?

ঃ তাই হয়তো হবে হুজুর।

ঃ শরিয়তে আব্রু-পর্দার নিয়ম আছে কি জন্যে? বেদাত আউরাতদের এমন দশাই হয়।

ঃ ঐ কসুরের জন্যেই তো এই এত দুর্ভোগ হুজুর। পরের দিনই খুঁজতে খুঁজতে লোক এলো আমার কাছে। এক গাদা অর্থ আমার চোখের সামনে মেলে ধরে মেয়েটাকে কিনতে চাইলো। বললো, স্বয়ং শাহজাদার খোশমহলে থাকবে। খাবে দাবে নাচবে গাইবে। আপনার মেয়ের জীবন পরম সুখে কেটে যাবে। এই অর্থ নিয়ে মোয়েটাকে তুলে দিন আমার হাতে।

ঃ তারপর?

ঃ আমি বললাম, অর্থ নিয়ে ইয্যত বেচবো। অসম্ভব! তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। শুনে সে লোক গোস্বাভরে উঠে গেল। যাবার সময় বললো, ঠিক আছে! অর্থগুলো মনে ধরলো না যখন, তখন থাকো বসে। বুঝতে পারবে ঠ্যালা! এই

কয়দিন আগের কথা হুজুর! তারপর এই কাণ্ড!

আলী আশরাফের দীল তখন পাণ্ডুয়ার শাহী মহলে চলে গেছে। তার মনে পড়ছে শাহজাদার প্রমোদ ভবনের পাশে সুলতানের খাসবান্দ গাজী গাফফারের কথা– অর্থের জোরে একান্ত কাজ না হলে গায়ের জোর তো আছেই! আলী আশরাফকে নীরব দেখে লোকটি ফের বললো, এখন আমি কি করব হুজুর! এ খবর শাহজাদার কানে গিয়ে পৌঁছলে না জানি আবার কি বিপদ হয়। তাছাড়া এদিকে আবার মেয়েটার বিয়েটাও ঠিকঠাক হয়ে গেছে। বর থাকে চাটিগাঁয়ে। আসার ফুরসুৎ পাচ্ছে না বলেই বিয়েটা ঠেকে আছে আজ অবধি। নইলে তো এসব ফ্যাসাদে পড়তে হয় না আমাদের!

আলী আশরাফ বললো, তা যদি মনে করেন, তাহলে মেয়ে নিয়ে আপনি তাড়াতাড়ি ঐ চট্টগ্রামেই চলে যান। মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে কিছুদিন ওখানেই কাটিয়ে দিন। এরপর আপ্‌ছে আপ্‌ সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলী আশরাফ ঘোড়ায় চড়ে বসলো ও পাণ্ডুয়ার অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

রাজধানীর প্রবেশ পথে আলী আশরাফের সাথে সহকারী সালার জহিরুদ্দীনের দেখা। আলী আশরাফের এলোমেলো বেশবাস লক্ষ্য করে জহিরুদ্দীন প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোথাও থেকে লড়াই করে ফিরলেন?

ঘোড়া থেকে নেমে মোসাফেহা অন্তে আলী আশরাফ বললো, অনুমান আপনার ঠিক। এইমাত্র একটা ছিচকে লড়াই লড়ে এলাম।

ঃ মানে?

আলী আশরাফ তামাম ঘটনা বর্ণনা করার পর বললো, ভেবে আমি হয়রান হই, সুলতান এমন সাচ্চা আর সৎ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার ঔরসে এমন একটা লম্পটের জন্ম হলো কি করে?

জহিরুদ্দীন মুস্‌কি হেসে বললো, দোষটা জন্মের নয় ভাই সাহেব! জন্মগতভাবে শাহজাদা ভাল ছেলেই ছিলেন। বিশেষ কোন গুণাবলীর অধিকারী না হলেও এত খন্নাস তিনি ছিলেন না। সংগদোষই তাঁকে চরিত্রহীন বানিয়েছে।

ঃ কি রকম?

ঃ পাণ্ডুয়ার এই হুকুমাতটা তামামই দীর্ঘদিন যাবত একটা ভানুমতির খেলের মধ্যে পড়ে আছে। খেলোয়াররা যখন যাকে যেভাবে নাচাচ্ছে, সে তখন সেইভাবেই নাচছে। নতুন এসেছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, একটু খেয়াল করলে সবই বুঝতে পারবেন।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ মানুষগুলো তৈরি করেছেন রহমানুর রাহিম, মতলব হাসিলের ইরাদায় এখানকার খেলোয়াররা সেই মানুষগুলোকে বানাচ্ছে অমানুষ। যখন যাকে যেভাবে কাত করা সম্ভব, তাকে তারা সেইভবেই কাত করে ভবিষ্যতের বিপত্তি দূর করছে আর ভবিষ্যতের রাহা তৈরি করে নিচ্ছে। উমরাহ আতিকুল্লাহকে জানেন কি?

আলী আশরাফ একটুখানি চমকে উঠলো। বললো, জানি।

ঃ আতিকুল্লাহ সাহেব এই খেলোয়ারদের বানানো এক ছাগল। বাঘের বাচ্চা ছিলেন আগে, এরাই তাকে মন্ত্র দিয়ে ভেড়ার বাচ্চা বানিয়েছে। এমন ভেড়ার বাচ্চা আরো অনেক আছে এই পাণ্ডুয়ার দরবারে। স্বার্থজ্ঞান ছাড়া এই খেলোয়ারদের একজনেরও চরিত্র বলে কোন কিছুই নেই। তাই চরিত্রের কোন স্ফুরণ কোথাও দেখলেই আঁত্‌কে উঠে তারা। মতলব হাসিরের অন্তরায় হবে ভেবে এরা বাঘকে ছাগল বানানোর কাজে জানপ্রাণ ছেড়ে দিয়ে লেগে যায়।

ঃ যদি কোন বাঘ বাঘই থেকে যায়, ছাগল বানাতে আদৌ যদি না পারে?

ঃ তাহলেই শুরু হয় ঠুকাঠুকি। এখানে থাকলে দুই অবস্থার এক অবস্থা মেনে নিতেই হবে। হয় বাঘ হয়ে থেকে ঠুকাঠুকি করবেন, নয় ছাগলছানায় পরিণত হয়ে ওদের পিছে পিছে ঘুরবেন। ইরাদা হাসিলের সংগ্রামে ওরা অটল।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এই শাহজাদাও এদের ইরাদার এমনই এক শিকার!

ঃ যথা?

ঃ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে খেলোয়ারদের দৃষ্টি পড়ে শাহজাদার উপর। তাঁর নির্মল চরিত্র দেখে তারা শংকিত হয়ে ওঠে এবং জানপ্রাণ ছেড়ে দিয়ে মেতে ওঠে খেলায়। শুরু হয় খেল। শাহজাদাকে নানা কসরতের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে অপরাধীদের পরিচর্যায় ছেড়ে দেয়া হয়। শাহজাদার আদর-আহার-আপ্যায়ন সবকিছুই অপ্সরীদের হাতেই ন্যস্ত করা হয়। মকসুদ হাসিলের ইরাদায় ত্যাগ করতে পারে না এমন বস্তু এই খেলোয়ারদের নেই। এই একই চাল চলতে থাকে দিনের পর দিন। কোমলমতি যুবক! দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ে অপ্সরীদের দিকে। শুরু হয় তাঁর পতন। অভিজাত ঘরের অপরূপা অপ্সরীদের হাত ধরে নামতে নামতে শাহজাদা আজ এত নীচে এসেছেন। আজ আর কোন জাতকুলের বিচার নেই। শরাবের পেয়ালার সাথে খুবসুরত সাকী একটা চাই তার, তা সে কাঙাল-গরীব, মুটে-মজদুর যে ঘরেরই হোক।

ঃ শাহজাদা কি বরাবরই এইভাবে আউরাত লুটে আনেন?

ঃ আমি যতদূর জানি আর শুনেছি, তাতে এই দোষ তাঁর এর আগে ছিলো না। আপছে আপ যা জুটে যেতো তাই নিয়েই তুষ্ট থাকতেন। ইদানীং এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য এর পেছনেও উৎসাহ আছে অদৃশ্য মহলের।

ঃ তাজ্জব!

ঃ এখানকার সবকিছুই বিচিত্র! তা যা এখন আসি ভাইসাহেব– আমার তাড়া আছে। বিদায় নেয়ার জন্যে জহিরুদ্দীন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আলী আশরাফও আর কথা না বাড়িয়ে জহিরুদ্দীনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলো।

ছয়

আলী আশরাফকে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ বানানো হলো। হপ্তাদেড়েক পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ শয্যা থেকে উঠলেন। একদিকে ভ্রাতৃবিয়োগের শোক, অন্যদিকে দোস্ত-দুশমন নিরূপণে ব্যর্থতার গ্লানি এই উভয়বিধ কারণে যারপরনাই পেরেশান ছিলেন তিনি। শয্যা থেকে উঠে রাজকার্যে হাত দিয়েই তিনি ছত্রাদুর্গের অব্যবস্থা দূরীকরণে তৎপর হয়ে উঠলেন। পাণ্ডুয়া সালতানতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছত্রাদুর্গের অবস্থান। সোনারগাঁয়ের নিরাপত্তা বিধান, গোয়ালপাড়ার ওপারে কামরূপ রাজের গতিবিধির উপর চৌকি, কেন্দ্রীয় স্থান থেকে সারা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবম্বিধ প্রয়োজনে ছত্রাদুর্গের ভূমিকা অপরিসীম। রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই ছত্রাদুর্গের আশেপাশেই এই হুকুমাতের তিক্ত ও অবিস্মরণীয় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। রাজধানী থেকে দূরে এই ছত্রাদুর্গের মুহাফিজদের বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা আর গাদ্দারী পাণ্ডুয়ার হুকুমাতকে অনেকবার বিপন্ন করে তুলেছে। বর্তমান মুহাফিজ যিনি আছেন তাঁর বিরুদ্ধে গাদা গাদা অভিযোগ সুলতানের দপ্তরে জমা হয়ে আছে। অতি কাছে থেকেও গোয়ালপাড়ার এই দুর্ঘটনার সঠিক কোন তথ্য তিনি দাখিল করতে পারেন নি। যা কিছু করেছেন, তাও সুলতানের বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

তাই দরবারে বসেই সুলতান একজন জানবাজ ও ঈমানদার নওজোয়ানকে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শুনেই সভাসদেরা সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করলেন। উজির মিয়া মোস্তাক বললেন, সেদিক দিয়ে সহকারী সালার শ্রীমাধব একমাত্র যোগ্য লোক। জানবাজ আর নওজোয়ান।

রাজা গণেশ বললেন, এক্ষেত্রে আরব আলীও মোটামুটি কম যায় না। তার বিশ্বস্ততা প্রশংসাযোগ্য।

দৌলত খাঁ বললেন, বয়সটা একটু বেশী হয়, নইলে এ পদে বিন বিল্লাহর সমকক্ষ আর কাউকে দেখিনে।

উজির আজম খান সহকারী সালার জহিরুদ্দীনের নাম প্রস্তাব করলেন। সবার শেষে উজির খান জাহান বললেন, জহিরুদ্দীনের ব্যাপারটা আমিও সমর্থন করি। তার হিম্মত, বিশ্বস্ততা আর আখলাক সম্পর্কে হুজুরও অনেকখানি ওয়াকিবহাল আছেন। সেই সাথে

আমি আলী আশরাফের নামটাও যোগ করতে চাই। তার যোগ্যতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে অন্য এক প্রসংগে হুজুরকে আমি জানিয়েছি।

আলী আশরাফের নামটা কানে যেতেই সুলতান উৎকীর্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো আলী আসগারের প্রতিচ্ছবি। তিনি মনে মনে আফসোস করলেন, আহা! এমন একটা লোক আজ পাশে থাকতো যদি!

সুলতান কোন সুপারিশের উপরই কোন মন্তব্য করলেন। দরবারের কাজ শেষ করে নীরবে উঠে গেলেন।

পরের দিন সকলেই তাজ্জব হয়ে দেখলো আলী আশরাফকে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ আর জহিরুদ্দীনকে সহকারী সালার থেকে পুরোদস্তুর সালার বানানো হয়েছে এবং শাহী প্রাসাদসহ রাজধানীর হেফাজতি তার উপরই অর্পণ করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো উজির খান জাহান আর আজম খাঁ সুলতানের বুদ্ধিমত্তাকে মোবারকবাদ জানাবার মওকা পেলেন।

সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করার ইরাদায় উভয়েই খোশদীলে শাহী প্রাসাদে এলেন। সুলতান তাঁদের আসন গ্রহণ করতে বলে দেরাজ থেকে একখানা খত বের করে বললেন, মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেবের এটা তিন নম্বরের হুঁশিয়ারী। শাহাবউদ্দীনের খুনের খবর পেয়েই তিনি আফসোস্ করে আবার এই খত লিখেছেন। বলেই খতখানা তাঁদের হাতে দিলেন। উভয়েই মনোনিবেশ সহকারে খতখানা পাঠ করলেন। মাওলানা মোজাফফর শামস্ বলখী সাহেব শাহাবউদ্দীনের মউতের জন্যে সুলতানকেই প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করে লেখেছেন– এটা তাঁরই অদূরদর্শিতার ফল। বিধর্মীরা কখনও মুসলমান হুকুমাতের বন্ধু হতে পারে না, বিশেষ করে সে হুকুমাত যদি তাদের হাত থেকেই ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে মুসলমান হুকুমাতের বিপর্যয় অনিবার্য। তফসীরে বলা হয়েছে যে, "বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী ও অপরিচিত লোকদিগকে বিশ্বস্ত কর্মচারী বা উজির নিযুক্ত করিবে না। তাহারা (বিধর্মীরা) তোমাকে বিপথে চালিত করিতে ব্যর্থ হইবে না এবং তাহারা তোমার কাজে গোলযোগ সৃষ্টি করিতে ইতস্তত করিবেনা। তাহারা তোমার ধ্বংস কামনা করে অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের সাথে মিত্রতা কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে বিপথে চালিত করিবে। অতএব, আমাদের ক্ষুদ্র বিচার শক্তিকে ত্যাগ করাই আমাদের উচিত।"

পাঠ অন্তে তাঁরা আবার খতখানা সুলতানকে ফেরত দিলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। তা দেখে সুলতান বললেন, আপনারা কিছু না বললেও আমি আন্দাজ করতে পারি। এ কথা আপনাদেরই মনের কথা। কিন্তু একটা খেয়াল কারো কখনও হয় না যে, নিজের ঘর সামাল করতে না পারলে পরের ঘরের উপর খবরদারি করার এক্তিয়ার কারো নেই। আজ পর্যন্ত যে কয়জন গাদ্দারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তারা সব ক'টিই মুসলমান। এ প্রমাণ আপনারা কেউ অকাট্যরূপে দিতে পারবেন না যে, আমাদের কোন হিন্দু

আমীর-উরাহ নিজে কেউ গাদ্দারী করেছে বা গাদ্দারীর সাথে সরাসরি জড়িত আছে। আপনাদের ধারণা সব অনুমানভিত্তিক। অথচ যতগুলো অঘটন ঘটেছে, সন্ধান নিয়ে জানা গেছে, সবগুলোই মুসলমান আমীর-উমরাহ আর সেপাই দ্বারা ঘটেছে। কোন হিন্দুর কোন নাম- গন্ধ তার আশেপাশে নেই।

সুলতান থামলে উজির আজম খাঁ আফসোস্ করে বললেন, এই বাংলা মুলুকে আমাদের কওমের একটা মস্ত বড় বদনসীব হুজুর যে, একজন হিন্দু অনায়াসেই একজন মুসলমানকে দিয়ে দশজন মুসলমানকে খুন করাতে পারে। অথচ একজন মুসলমান সারাজনম সাধানা করলেও তার সাধ্য নেই একজন হিন্দুকে দিয়ে আর একজন হিন্দুকে খুন করায়।

ঃ যারা গভীর পানির মাছ হুজুর, তারা অদৃশ্যে থেকেই চলাফেরা করে। তারা হামেশাই পাতলা হয়ে ভাসে না বা সামনাসামনি আসে না।

উজির খান জাহান বললেন, কাজ করার কামিন মযদুর হাতের কাছে মজুত থাকলে সামনে আসার দরকার পড়ে কার?

সুলতান নাখোশ কণ্ঠে বললেন, এগুলো সবই আপনাদের আন্দাজের কথা।

খান জাহান সাহেব বললেন, হুজুর!

সুলতান বললেন, অন্যেরাও তো একথা বলতে চায় যে, এই সব কিছুর পেছনে আপনাদেরই ইঙ্গিত আছে। তাই বলে কি সেটাকেই নিশ্চিত বলে মেনে নেয়া যায়? অনিশ্চিত ধারণা বা আন্দাজের পেছনে অন্ধ হয়ে ছুটোছুটি করে একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না।

উজির আজম খান বললেন, 'গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! কিছু আন্দাজ আছে যা আন্দাজ হলেও মউতের মতো সত্য। পরিচালক পর্দার পেছনে থাকে। অভিনয় করে শিল্পীরা। হলফিল চোখে দেখা না গেলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এই শিল্পীদের পরিচালনায় কেউ আছে এবং কেউ এদের চালাচ্ছে।

জওয়াবে সুলতান এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমারও তো ঐ একই বক্তব্য এখানে– কে সে পরিচালক? কারা আছে পেছনে? আপনারা যদি একতরফাভাবে বলেন, হিন্দুরা, তাহলে আমিও বলবো আপনাদের মতো কেউও তো থাকতে পারেন এখানে। এমন ইঙ্গিত বহু আমলা বহুবার আমাকে দিয়েছেন। এ আমলারা একজনও হিন্দু নয়, সকলেই মুসলমান। বিধর্মীরা ছাড়া স্বধর্মীরা যদি একজনও বেঈমানী বা মোনাফেকী না করতো, তাহলে এ বিতর্কের প্রশ্নই উঠতো না।

উজির আজম খান ক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, হুজুর যদি মনে করেন আমরাই কেউ –

উজিরকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে সুলতান হেসে ফেললেন। পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, উজির আজম খান সাহেব হলেন আমার শ্রদ্ধেয় হজরত নূর

কুতুব-ই-আলম (রঃ) এর সহোদর। উজির খান জাহান সাহেব অত্যন্ত প্রবীণ ও আমার শ্রদ্ধার পাত্র। খোদ তাঁদের সম্বন্ধে এ ধারণা আমার দীলে যে কোন দিনই পয়দা হতে পারে না, তা তাঁরা আমার চেয়েও বেশী জানেন। এতে কেউ ক্ষুণ্ন হয়ে আমার তকলীফ বৃদ্ধি করবেন, এ আশা কখনও আমি করি না। আমার এ বক্তব্য সেরেফ উদাহরণের খাতিরেই। আপনারা ছাড়াও তো আমার ময়মুরুব্বী, সালার-উজির, আমীর-ওমরাহ আরো আছেন এবং তারা নামে গোত্রে জবরদস্ত মুসলমান।

উজির খান জাহান সাহেব ইতস্তত করে বললেন, তা– মানে–

সুলতান বলেই চললেন, কথা আমার একটাই। গলদটা ঠিক কোথায়, তা নিশ্চিতভাবে উদ্ধার করা না গেলে কোন দল বা গোত্রের প্রতি একতরফা মনোভাব নিয়ে সুলতানী করা ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় নয়। মাওলানা সাহেবের বক্তব্যগুলো নিঃসন্দেহে মূল্যবান ও যথার্থ। কিন্তু আমার আফসোস, আমি সুলতান। সুলতানী করা আর দরবেশগিরি করা এক কথা নয়। পবিত্র খোলাফায়ে রাশেদীন-এর পরিবেশ আজ এখানে নেই। বহুজনের ইচ্ছা–আনিচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে সুলতানকে আজ চলতে হয়। কাজেই মাওলানা বলখী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং আপনাদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা রেখে আমার বক্তব্য, আমি আপনাদের দোওয়া চাই। প্রমাণ ছাড়া আন্দাজের উপর নসিহৎ খুব একটা আমার কাম্য নয়। নিশ্চিত ব্যাপারে আপনাদের নসিহৎ আমার কাছে সর্বদাই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। জহিরুদ্দীন আর আলী আশরাফের নিযুক্তিই তার প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে প্রশাসনিক ব্যাপারে দু' একটি জরুরী কথা বলে তিনি উজিরদের বিদেয় করলেন।

* * *

ছত্রাদুর্গে যোগদান করতে যাওয়ার পথে আলী আশরাফ সুফী হজরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের খানকাহ শরীফে এলো। সুফী সাহেবের দোওয়া খায়ের তার কাম্য। সুফী সাহেব আলী আশরাফকে দেখেই দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন। বললেন, একি, আলী আশরাফ! তুমি হঠাৎ? তবিয়ত তোমার ভাল তো?

সুফী সাহেবকে কদমবুসি করার পর আলী আশরাফ বললো, জি। আপনার নেক দোয়ায় তবিয়ত আমার খুব ভাল আছে।

ইতিমধ্যেই সুফী সাহেব উদাসীন হয়ে উঠলেন। উদাসীন কণ্ঠে বললেন, আমরা সবাই মিলে খামাকা তোমাকে এতটা তকলিফ দিয়েছি। তোমার এত মেহানত কোন কাজেই এলো না।

ঃ হুজুর!

ঃ উজির খান জাহান গোয়ালপাড়ায় থেকেই জানতেই পারলেন না যে, শাহাবউদ্দীন

ইতোমধ্যেই শাহাদতবরণ করেছেন। তোমাকে আমাকে সবাইকে উনি খাটিয়ে মারলেন।

ঃ উনি আসলেই কিছু জানতেন না হুজুর!

ঃ তা অবশ্যি ঠিক। সবই ঐ একজনের ইচ্ছা। তবু ভাবনা আসে দীলে– আমি হস্তক্ষেপ না করতে গেলে হয়তো শাহাবউদ্দীনের এ পরিণতি হতো না। কেন যে আমার এ কুমতি হলো!

সুফী সাহেবের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর তীব্র হয়ে উঠলো। তা দেখে আলী আশরাফ বললো, হুজুর!

সুফী সাহেব নিজেকে সংযত করে নিলেন। বললেন, তা যাক সে কথা। এবার বলো, তুমি হঠাৎ কি জন্যে?

ঃ আপনার দোওয়া নিতে এসেছি হুজুর। আমাকে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ বানানো হয়েছে। আমি সেই দুর্গে এখন যোগদান করতে যাচ্ছি। আপনার দোওয়া নিয়ে তবেই ছত্রায় যাবো, এই ইরাদায় এসেছি।

ঃ মাশা আল্লাহ! অনেক দিন পর একটা খোশ খবর পেলাম।

ঃ দোওয়া করুন হজরত, যেন যোগ্যতার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারি আর তামাম বালা-মুসিবত উতরে যেতে পারি।

ঃ জরুর– জরুর। তোমার উপর আমার দোওয়া সব সময়ই আছে। আল্লাহকে একিন দীলে ইয়াদ রেখো বেটা, তামাম বালা-মুসিবত থেকে তিনিই তোমাকে হেফাজত করবেন।

সুফী সাহেবকে সালাম করে আলী আশরাফ খোশ দীলে খানকাহ থেকে বেরিয়ে এলো এবং ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ছত্রার দিকে ছুটলো।

অনেক দূরের পাল্লা। একটানা ছুটে চলেছে আলী আশরাফ। এক একটা তেপান্তর পেরিয়ে আর একটা তেপান্তরে হাজির হচ্ছে সে। সামনে পড়ছে অসংখ্য খাল, বিল, বনজঙ্গল।

এবার সে হাজির হলো এক অরণ্যঘেরা প্রান্তরে। বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী হেথা হোতা গাছগাছড়া আর তার ফাঁকে ফাঁকে কৃষিভূমি। এরই মাঝে পথ। প্রায় ক্রোশ তিনেক এর বিস্তৃতি। এরপরে গ্রাম-গঞ্জ-লোকালয়। এই পথে খানিকদূর এগুতেই আলী আশরাফ চমকে উঠলো এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে। জনশূন্য প্রান্তরে জনমানবের সাড়া পেয়েই আলী আশরাফ সজাগ হয়ে উঠলো। দেখে, সামনের জঙ্গল থেকে একদল দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী রাহাজান হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো পথের উপর এবং আলী আশরাফের অবস্থান থেকে রশিকয়েক দূরে তারা সবিক্রম ঝাঁপিয়ে পড়লো এক অশ্বারোহী রাহাগীরের উপর। রাহাগীরটাকে একজন ফৌজী লোক বলে আলী আশরাফের মনে হলো। কিন্তু আলী আশরাফ ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠার আগেই দস্যুরা রাহাগীরকে

চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো এবং মার মার রবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাহাগীরটাও অগত্যা রুখে দাঁড়ালো তলোয়ার হাতে এবং বিপুল বিক্রমে রাহাজানদের হামলা রোধ করতে লাগলো। চলতে লাগলো তুমুল লড়াই। আক্রমণের ধরণ দেখে আলী আশরাফ বুঝলো, রাহাজানদের মুল লক্ষ্য রাহাগীরের জানের উপর, কোন মালমাত্তা সম্পদের উপর নয়। আলী আশরাফ আরো লক্ষ্য করে দেখলো, রাহাগীরটা একটা জবরদস্ত যোদ্ধা–কোন এক আলতু-ফালতু সেপাই নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র দস্যুস্যদের সমবেত আক্রমণের বিরুদ্ধে সে কোন সুবিধে করতে পারছে না। ক্রমেই পেরেশান হয়ে পড়ছে।

নিমেষেই আলী আশরাফের তরবারি কোষমুক্ত হলো। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাহাজানদের উপর। প্রমত্ত বিক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যেই আলী আশরাফ রাহাজানদের কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেললো। সহায় এসে জুটে যাওয়ায় রাহাগীরটার কুওতও দুইগুণে বেড়ে গেল। সেও এবার প্রচণ্ড আঘাত হেনে রাহাজানদের দুই তিনজনকে মাটিতে শুইয়ে দিলো এবং কয়েকজনকে জখম করে ছুটে পালাতে বাধ্য করলো।

পলকেই লড়াইয়ের গতি পাল্টে গেলো। আলী আশরাফ আর রাহাগীরের অতুলনীয় রণকৌশলের সামনে রাহাজানদের পরিকল্পনাহীন এলোপাতাড়ি আক্রমণ অধিকক্ষণ টিকলো না। ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো রাহাজানরা পাত্তাহীন হয়ে গেল। একের পর এক প্রাণ হারিয়ে রাহাজানরা ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ অবস্থা দেখে রাহাজানরা শিউরে উঠলো এবং মউত সুনিশ্চিত দেখে তারা এক একজন এক একদিকে দিশেহারা অবস্থায় রণভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। আলী আশরাফ তাদের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তাদের দলপতিকে ঘায়েল করলো এবং তাকে কয়েদ করে রাস্তার উপর টেনে আনলো।

ময়দান সাফ হয়ে গেলো। রইলো শুধু সেই রাহাগীর, আলী আশরাফ আর আঘাতে মুমূর্ষু ঐ রাহাজানদের দলপতি। কেন এই রাহাগীরকে তারা হামলা করেছিল একথা আলী আশরাফ জানতে চাইলে দলপতিটি অকপটে বললো, আমি এখন মৃত্যুপথ যাত্রী, কোন মিথ্যা কথা এ সময় আমি বলবো না। কোন ধনদৌলত ছিনিয়ে নেয়ার ইরাদায় আমরা হামলা করিনি তাঁর উপর। আমাদের লক্ষ্য ছিল তাকে খতম করে দেয়া।

আলী আশরাফ প্রশ্ন করলো, কেন, উনি কি করেছেন তোমাদের?

ঃ উনি আমাদের কিছু করেন নি। আমরা অর্থের বিনিময়ে এই কাজ করেছিলাম।

ঃ অর্থের বিনিময়ে? কে তোমাদের অর্থ দিয়েছিলো?

ঃ কিল্লাদার।

রাহাগীর এবার প্রশ্ন করলো, কোন্ কিল্লাদার?

দলপতি বললো, সেটা আমি সঠিক বলতে পারবো না। আমাদের বাড়ী এই বাংলা

মুলুকে মিথিলার সীমান্ত এলাকায়। হয় আমাদের সীমান্তের কিল্লাদার, নয় মিথিলা সীমান্তের কিল্লাদার দিয়েছিলেন অর্থ। যে দালাল আমাদের বন্দোবস্ত করে তাকে আমি চিনি, সেই অর্থ দিয়েছে, আর তার কথাতেই রাজী হয়েছি আমরা।

আলী আশরাফ বললো, কি রকম?

ঃ দালালটা আমাদের অনেক অর্থ দিয়ে বললো, ঐ যে চিনে রাখো ঐ লোককে। ফৌজ ছাড়া ও যখন একাকী কোথাও যাবে, তখন তাকে রাস্তার মধ্যে খতম করে দিতে পারলে ফের এত অর্থ তোমাদের আমি দেবো। কিন্তু হুঁশিয়ার, কিল্লাদারের কাজ এটা। অর্থ নিয়ে কাজ না করলে চরম মুসিবত হবে তোমাদের।

ঃ কোন্ কিল্লাদার জানতে চাইলে না?

ঃ আমার সেটা গরজ ছিলো না হুজুর। আমি দালালটার বাড়ীঘর চৌদ্দ পুরুষ চিনি। অর্থ দিতে বেঈমানী করলে তাকে ধরবো আমরা। কিল্লাদারের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?

আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর ছিলো। কথা বলার মাঝে মাঝে দলপতিটা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এবার সে একেবারেই অজ্ঞান হয়ে গেলো। এ দুনিয়া দেখার জন্যে আর চোখ খুললো না।

আলী আশরাফ আফসোস করে বললো, আহ্হা, বেচারা মারাই গেলো! অল্পের জন্যে কে সেই দালাল তা জেনে নেয়া গেলো না।

রাহাগীরটা বললো, দালালকে না চিনতে পারলেও কে এই কিল্লাদার, তা আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু যাক সে কথা। আমার এই চরম মুহূর্তে আপনি যে উপকার করলেন আমার, তা জবানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। এর জন্যে আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং পরোয়ারদেগারের কাছে আরজ পেশ করছি আপনাকেও যেন সকল মুসিবত থেকে হেফাজত করেন তিনি। এই মুহূর্তে আপনি আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে অবস্থা যে কি দাঁড়াতো তা কল্পনা করতে পারছি নে।

আলী আশরাফ বললো, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?

ঃ অবশ্যই অবশ্যই। আমার নাম আতা খাঁ। আমি একজন ফৌজদার। পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের আমি একজন নগন্য খাদেম। আমার বর্তমান কাজ হলো, বাংলা মুলুকের মিথিলা সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে যারা নিয়োজিত আছে তাদের কাজকর্ম তদারক করা। আমার অস্থায়ী আবাস ঐ দিকেই।

ঃ ও আচ্ছা। তাই ওখানকার কিল্লাদারদের এত আক্রোশ আপনার উপর?

ঃ জি, ঠিক ধরেছেন। এবার মেহেরবানী করে আপনার পরিচয়টা দিলে ধন্য হই।

ঃ আমার নাম আলী আশরাফ। আমাকে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ নিয়োগ করা হয়েছে।

আমি সেই দুর্গে যোগদান করতে যাচ্ছি।

আতা খাঁ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললো, আরে! আপনিই সেই আলী আশরাফ? আপনার নাম জহিরুদ্দীন ভাইয়ের কাছে কত যে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। আপনাকে দেখার খুবই আমার শখ ছিল। আল্লাহ তায়ালা কোন সময়ে কি ভাবে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন!

দুইহাত বাড়িয়ে দিয়ে আতা খাঁ আলী আশরাফের সাথে কোলাকুলি করলো। দুইজনই তরুণ। দুইজনের মধ্যে অল্পতেই ভাব জমে উঠলো। আলী আশরাফ বললো, তা ফৌজদার সাহেবের এদিকে আগমনের হেতু?

আতা খাঁ বললো, গোয়ালপাড়ায় আমার কিছু ফৌজ একটা ব্যাপারে পেরেশানিতে ছিলো। তার ফয়সালা করতে এসেছিলাম। আমার এই আগমনটা সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের – দুইরকমই ছিলো। এদিকে না এলে আপনার সাথে পরিচয় আমার ঘটতো হয়তো একদিন, কিন্তু আপনার এই মহৎ দীলের পরিচয় আমি পেতাম না। এখন বুঝতে পারছি জহিরুদ্দীন আর উজির খান জাহান সাহেব কেন এত প্রশংসা করেন আপনার!

এরপর উভয়ের মধ্যে আরো কিছু আলাপ পরিচয় হলো এবং অবশেষে উভয়ে উভয়ের গন্তব্য পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

* * *

ছত্রাদুর্গে এসে আলী আশরাফ দেখলো এক বিরাট বিশৃঙ্খলা। কর্মচারীদের কারো কোন কর্মোদ্যোগ নেই। ছোট বড়র মধ্যে কোন নীতিগত ফারাক নেই। কাউকে কারো মেনে চলার রেওয়াজ নেই। কারো প্রতি কারো আদৌ কোন বিশ্বাস নেই। আছে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ আর আরাম-আয়াশের আনজাম। সেপাইরা সব খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে। শৃঙ্খলা আর ফৌজী তৎপরতার বালাই নেই তাদের মধ্যে।

এগুলোকে কঠোর হস্তে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে আলী আশরাফের বেশ কয়েকদিন সময় লাগলো। আলী আশরাফের আরণগুণে মুহাফিজের প্রতি অনেকের বিশেষ করে সেপাইদের দীলে ভীতির সাথে মুহব্বতের পয়দা হলো। তারা তাঁকে ভয় করতেও লাগলো আবার তাঁর নীতি ও সহৃদয় আচরণগুণে ভালবাসতেও লাগলো।

যে কয়দিন আলী আশরাফ এই কঠিন কাজে ব্যস্ত ছিলো, সে কয়দিন পানির মতো কেটে গেলো। কাজের চাপ হালকা হয়ে আসতেই সে আবার লাচার হয়ে পড়তে লাগলো। দিন যেন আর কাটে না। উল্টা পাল্টা নানা কিসিমের চিন্তা-ভাবনা মনে আসে। পুরনো ব্যথায় দীলটা আবার টন টন করে উঠে।

এই সেই ছত্রা! লায়লা আকতারের নানা সাহেবের জায়গীরদারি। যদিও এই ছত্রাদুর্গ আর তার আশপাশের এলাকাটা আলাদা একটা রাজ্য, জায়গীরদারির বাইরে, তবু অবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ এলাকাটাই জায়গীরদারির মধ্যে। ছত্রার জায়গীরদারের মকানটাও

একটা ছোটখাটো প্রাসাদ। দুর্গ থেকে এক ক্রোশেরও কম দূরে অবস্থিত। লায়লা আকতারের নানা সাহেবের হাত থেকে এই জায়গীরদারি তদীয় জামাতা আতিকুল্লাহর হাতে যায়। কিন্তু আতিকুল্লাহর অতিশয় সুরাসক্তির কারণে সুলতান তার উপর অত্যন্ত গোস্বা হন। সকলের অনুরোধে আমীরের পদ থেকে তাকে বিচ্যুত না করলেও তাঁর জায়গীরদারি বাজেয়াপ্ত করে নেন। আতিকুল্লাহর ছেলে আব্দুল লতিফ সাবলক হওয়ার পর পিতার এই খাস্‌লত আর বিমাতার আচরণ বরদাস্ত করতে পারে না। পিতাকে সংশোধন করতে না পেরে এবং বিমাতার বেপরোয়া আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে সে পিতার কাছ থেকে জুদা হয়ে যায় ও আলাদাভাবে জীবন যাপন শুরু করে। সৈনিক হিসাবে আব্দুল লতিফ দক্ষতার পরিচয় দেয়। সুলতান এতে খুশী হয়ে তাকে সহকারী সালারের পদে উন্নীত করেন এবং অধিক সংখ্যক সভাসদের সুপারিশে তার নানা সাহেবের জায়গীরদারি তাকেই ফিরিয়ে দেন।

এই কারণে অল্প বয়স থেকেই আব্দুল লতিফ ছত্রার জায়গীরদার আর দরবারের একজন বিশিষ্ট আমীর। আতিকুল্লাহর ছেলে আব্দুল লতিফের সরাব প্রীতি ছিল না। তবে গোত্রপ্রীতি ছিলো তার অত্যন্ত জোরদার। সাবালক হওয়ার পর থেকেই সে রাজা গণেশের গোত্রের সাথে জড়িয়ে যায় এবং তাদের সাথেই নিজের নসীব গেঁথে ফেলে। পক্ষান্তরে বলা যায়, এদের সমবেত সুপারিশেই আব্দুল লতিফ এত অল্পবয়সে উপরে উঠে যায়।

রাজধানী থেকে ছত্রা অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় কালক্রমে আব্দুল লতিফের মকানটাই গণেশের গোত্রের চক্রান্তের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। রাজধানীতে গুপ্তচরের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই তারা আর রাজধানীতে করে না। জরুরত দেখা দিলেই তাঁরা সবাই ছত্রায় ছুটে আসেন এবং আব্দুল লতিফের মকানে বসে নিশ্চিন্তে সব কিসিমের শলা-পরামর্শ করেন। আলী আশরাফ মুহাফিজ হয়ে আসার আগে ছত্রার দুর্গটাও অন্যতম ঘাঁটি ছিলো এবং এখানেও যুক্তি-মতলব আঁটা হতো।

সেদিন অনেক রাতে জায়গীরদার আব্দুল লতিফের মকান গুলজার হয়ে উঠলো। মিয়া মোস্তাক আর রাজা গণেশ সোনারগাঁয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিদর্শনের অজুহাতে আগের দিনই বেরিয়েছিলেন। গভীর রাতে দৌলত খাঁ, মুরাদ বেগ, শ্রীমাধব আর আরব আলীর ঘোড়া আব্দুল লতিফের মকানে এসে থামলো। আব্দুল লতিফের নবনির্মিত বালাখানাটা ভেতরে । উপর তলায় জেনানা মহল– অন্দর মহলের পাশে। নীচের তলার বাইরের দিকের দহলীজটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। হঠাৎ কেউ এলে অনুমান করার উপায় নেই যে, এই মকানের কোথাও দরবার জমে উঠেছে। গুপ্তচরদের দৃষ্টি ঠেকানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই বলাখানা গভীর রাতে গুলজার হয়ে উঠলো।

মুরাদ বেগ বললো, কে এই আলী আশরাফ? আমরা এত লোক থাকতে সুলতান এই অজানা অচেনা লোকটাকে আচানক এত উপরে তুলে দিলেন! ছত্রাদুর্গের

মুহাফিজের পদ কত সালার মাথা কুটে পায় না, এ আবার উড়ে এসে জুড়ে বসলো কোত্থেকে?

মিয়া মোস্তাক বললেন, জুড়েই শুধু বসেনি, আখেরে সবার ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে দিয়ে বসবে।

শ্রী মাধব বললো, মানে?

মিয়া মোস্তাক বললেন, এক কালে আলী আসগার নামে সুলতানের এক পেয়ারের মুরুব্বী ছিলেন। এ হলো সেই সালার আলী আসগারের ছেলে।

দৌলত খাঁ বললো, বলেন কি?

রাজা গণেশ বললেন, এমনি কি আর এত তাড়াহুড়া করে সবাইকে এখানে ডেকেছি? আলী আসগারের নাম শুনলেই সুলতান ইশ্‌কে বেহুঁশ হয়ে যান। তার ছেলেকে যখন পেয়েছেন, তখন আর কথা আছে? কোথায় যে বসাবেন তাকে তার আর ঠিক ঠিকানা কি? দেখছেন না, মামুলী একটা সেপাই থেকে এক ধাক্কায় ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ? এরপর কবে যে তাকে সিপাহসালার বা উজিরে আজম বানিয়ে বসবেন তা অনুমান করা যাবে না।

চোখ কপালে তুলে মুরাদবেগ বললো, এত দূর?

মিয়া মোস্তাক বললেন, সেরেফ এইটুকুই নয়। গোঁয়ার বাপের গোঁয়ার ছেলে। এতো আমাদের দলে আসবেই না, বরং অল্পদিনেই পিছু নেবে আমাদের। সবার নসীব বরবাদ করেই তবে এ থামবে।

রাজা গণেশ বললেন, পথের কাঁটা দিন থাকতে যত সত্তর সরিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। রাত লাগলে আর হাতড়িয়েও তার নাগাল খুঁজে পাবে না।

মিয়া মোস্তাক বললেন, এখন যে আবার কি ভাবে সরানো যায় এটাকে, এটাই হলো ভাবনা। ওর ওয়ালেদটাকে সরাতেই কত কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে আমাদের! একে আবার কোন্ কায়দায় ফেলা যায়--

রাজা গণেশ বললেন, কায়দায় যে একে ফেলতে সহজে পারবেন তা মনে হয় না। শিকারী বিড়াল গোঁফ দেখেই চেনা যায়। এর নজরে যে প্রখরতা দেখেছি, তাতে সহজে বাগে আসার ছেলে নয় এটা।

মিয়া মোস্তাক বললেন, তাহলে উপায়?

রাজা গণেশ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, উপায়টা আপনারাই তালাশ করুন। সব কথা আমাকেই যদি বলে দিতে হয় তাহলে আর প্রত্যেকের সাথে মাথা থাকার প্রয়োজন কি?

দৌলত খাঁ বললেন, ব্যাটাকে এখানেই সাবাড় করে দিতে পারলে কেমন হয়?

মিয়া মোস্তাক আঁতকে উঠলেন। বললেন, আবারও ঐ একই চাল? শাহাবউদ্দীনের খুনটাই এখনও সামাল দেয়া যায়নি। সুলতানের সন্দেহটা জোরদারভাবে আমাদের

দিকেই গড়েছে। কোন প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছেন না বলেই সুলতান খামোশ হয়ে আছেন। আবার একটা খুন হলে আর প্রমাণের আশায় থাকবেন উনি?

রাজা গণেশ বললেন, তবু এ ছাড়া আর দুস্‌রা কোন দাওয়া নেই।

মিয়া মোস্তাক বললেন – মানে?

ঃ খুন করতে হবে তাকে। তবে কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে খুনটাকে কেউ খুন বলে অনুমান করতে না পারে। অনুমান করতে পারলে আপনার ধারণার একতিলও এদিক ওদিক হবে না। সবাইকে এক সাথে জান দিতে হবে, বিশেষ করে দোষটা এসে বেশীর ভাগই তাদের ঘাড়ে বর্তাবে, ছত্রা-দুর্গের মুহাফিজ হিসাবে যাদের নাম আমরা সালতানের কাছে উপস্থাপন করে ছিলাম।

আরব আলী আর শ্রীমাধবের মুখমণ্ডল মলীন হয়ে গেলো। আব্দুল লতিফও এবার সজাগ হয়ে উঠলো। বললো, খুন নয়। অথচ খুন! এটা আবার কেমন করে সম্ভব?

রাজা গণেশ একটু শ্লেষের সাথে বললেন, এই জন্যেই তো সেরেফ ঐ কাজটা করে মাথা থাকলে হয় না, সেখানে কিছু মগজ থাকা চাই। এ অঞ্চলে সাপুড়িয়া আছে?

আব্দুল লতিফ বললো, সাপুড়িয়া সে তো দেদার আছে।

ঃ তাহলে ঐ সাপুড়িয়ারই শরণাপন্ন হও।

আব্দুল লতিফ উৎসাহিত হয়ে বললো, এ্যাঁ! তাহলে –

তাকে কথা বলার মওকা না দিয়ে রাজা গণেশ ফের প্রশ্ন করলেন, আলী আশরাফ সব সময় দুর্গের মধ্যেই থাকে, না বাইরে টাইরে আসে?

ঃ তা হামেশাই আসে। অনেক সময় তাকে দুর্গ থেকে অনেক দূরে এসেও ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কেউ কেউ আবার দুর্গের পাশে ঝোপঝাড়-ঘেরা ঐ ঝিলের পাড়ে বসে থাকতেও দেখেছে।

ঃ রাহা তো তাহলে তৈয়ার। অধিক বেগ পাওয়ার কারণই নেই।

মিয়া মোস্তাক বললেন, মতলবটা কি তাহলে সর্প-দংশন?

রাজা গণেশ বললেন, হ্যাঁ সর্প-সংশন! সাপুড়িয়া ডেকে আলী আশরাফের চলার পথে বিষাক্ত সাপ লেলিয়ে দিন। একবারে কাজ না হলে সাপুড়িয়া বার বার চেষ্টা করবে। মোটা ইনামের লোভ দেখালে ঐ লোভেই তারা কাজ উদ্ধার করে দেবে। সাপে বাঘে খেলেতো আর কারো সন্দেহ করার কিছু নেই?

চোখে মুখে সকলের খুশীর আভা ফুটে উঠলো। মিয়া মোস্তাক অতিশয় খোশদীলে বললেন, রাজা সাহেব, এই মাথার জন্যেই আপনি আমাদের সবার মাথার মণি। এমন একটা সহজ পথ মাথার মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিলেও কেউ আমরা বের করতে পারতাম না। সবাই সমস্বরে বললো, তাই –তাই!

রাজা গণেশ বললেন, আপনাদের তারিফের জন্যে আমি আনন্দ বোধ করছি। তবে আমার আনন্দ কায়েম হবে তখনই, যখন আপনারা কাজ উদ্ধার করতে পারবেন।

আরব আলী এতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সবার কথাবার্তা শুনছিলো। এবার সে উৎসাহের সাথে বললো, এটা মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়। কেউ না পারে এ দায়িত্ব আমার উপর দিন। গোয়ালপাড়ার ওপারে সাপুড়িয়াদের এলাকাতেই মকান আমার। অনেক সাপুড়িয়াকে বিশেষভাবে চিনি। এ মকসুদ আমি অনায়াসেই হাসিল করে দিতে পারবো।

মিয়া মোস্তাক বললেন, তাই যদি পারো, এই আব্দুল লতিফের মকানে আজ থেকেই থাকবে তুমি। হাঁড়িয়াগাড়ি পরগনার রাজস্বের গোলযোগ ফয়সালা করার ব্যাপারে তোমাকে এখানেই পাঠানো হলো। সরকারী দপ্তরে এইভাবেই তোমার অবস্থান দেখানো হবে। হাঁড়িয়াগাড়িতে যেতে হবে না তোমাকে। ওখানকার কাজ সমাধা করতে ওখানকার তহসীলদারই যথেষ্ট। তোমার কাজ এখানে। বার বার কোশেশ করবে। যেভাবে হোক, কামিয়াব হওয়া চা-ই।

এ প্রসঙ্গ শেষ হলে জহিরুদ্দীনের কথা উঠলো। অনেক উপরওয়ালাকে ডিঙ্গিয়ে তার এত উপরে ওঠায় এবং সুলতানের এত বিশ্বাসের পাত্র হওয়ায় মর্মপীড়ার শেষ ছিলো না কারো। স্থির হলো এটারও হিসাব নিকাশ কষা হবে। তবে সেটা হবে পরে।

* * *

কয়দিন পর হাতে তেমন কাজ না থাকায় আলী আশরাফ দুর্গের বাইরে এসে আনমনে হাঁটতে লাগলো। ঝিলের দিকে না গিয়ে সে মেঠোপথ পেরিয়ে পাশের এক গ্রামের দিকে এলো এবং বনাঞ্চলের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। পেছনে তার সশস্ত্র দেহরক্ষী সেপাই। নিজেও সে নিরস্ত্র নয়। নিরীহ গ্রাম এলাকায় অন্যকোন চিন্তা-ভাবনা তার দীলে ছিলো না। পরিবেশটা মনোরম। একদিকে খোলামাঠ, অন্যদিকে বনানী। ঝির ঝিরে বাতাসে ছায়াঘেরা পথ ধরে হাঁটতে আলী আশরাফ আরাম বোধ করছিলো। পথটা জায়গীরদার আব্দুল লতিফের মকানের দিকে প্রসারিত। লায়লা আকতারের ভাই আব্দুল লতিফ। আহা বেচারী! এত বড় উচ্চ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সে ঘর খুঁজে পেলো না! কোথায় কিভাবে কার সাথে আছে কিংবা নেই, আল্লাহ মালুম! কোন এক গায়েবী আকর্ষণে আলী আশরাফ একটানা সামনের দিকে এগিয়ে চললো। মনে তার খেয়াল এলো, লায়লা আকতারের ঐ দুর্ভাগ্যের কথা তার পাষণ্ড বাপ ভাইকে এতদিন জানানো তার উচিত ছিলো। সময় করে একদিন তাকে যেতেই হবে জায়গীরদারের মকানে। নয়া জিন্দেগীর নয়া স্বাদে মগ্নও যদি থেকে থাকে লায়লা আকতার থাকুক, তবু সংবাদটা পৌঁছানো তার উচিত ছিলো।

ভাবতে ভাবতে সে একটা ঝোপের পাশে এলো। একেবারে পথের উপরই ঝোপটা। অন্য কথায় ঝোপটার কোল ঘেঁষেই পথটা। সামনের দিকে পা তুলতেই বিকট এক

চীৎকার এলো ঝোপ থেকে। মরণ চীৎকার! আলী আশরাফ চমকে উঠে পিছন দিকে সরলো। ঘটনাটি লক্ষ্য করে সে হতবাক হয়ে গেল। তার অবস্থান থেকে হাত কয়েক দূরে ঝোপের মধ্যে ঝাঁপি হাতে এক সাপুড়িয়া এখনই এক বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হয়ে মরণ চীৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। তার ঝাঁপির দিক থেকে এক বিশাল আকারের কালসাপ সরসর করে রাস্তার উপর এসে গেছে।

আলী আশরাফ তার তলোয়ারের এক কোপে সাপটাকে কেটে ফেললো। কি তার করণীয় স্থির করার আগেই সাপুড়িয়াটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

আলী আশরাফের দীলে আচানক ধরণা এলো সাপটা তার উদ্দেশ্যেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। সাপুড়িয়াটি তীরবিদ্ধ হয়ে চীৎকার করে না উঠলে আলী আশরাফ সামনের দিকে এগুতো। এগুলেই সাপের উপর পা পড়তো। আর সে ক্ষেত্রে সর্পদংশনে মউত তার অবধারিত ছিলো। ধারণা তার যা-ই হোক, সাপুড়িয়াটা ইচ্ছে করে সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে থাকুক আর না থাকুক, সাপটাকে ধরার জন্যেই সে ওর পেছনে লেগে থাকুক, আলী আশরাফ এটা নিশ্চিত করে বুঝলো যে, সাপুড়িয়াটা তীরবিদ্ধ হওয়াতেই সে আজ বেঁচে গেলো।

আলী আশরাফ ভেবে হয়রান হতে লাগলো, তীরটা এভাবে কোত্থেকে এলো। ঐ সাপুড়িয়াটাকে তীরবিদ্ধ করে কে তাকে বাঁচালো? এই বন্ধবহীন মুলুকে কোথা থেকে এলো তার এই বান্ধব? দুর্গের মধ্যে ইতিমধ্যেই তার কিছু ভক্ত পয়দা হয়েছে। তাদেরই কারো কাজ কি এটা?

সেই সাথে তার খোয়াল হলো আর এক কথা। হজরত নূর-কুতুব-ই-আলম সাহেবের কথা, "আল্লাহ তাআলাকে একিন দীলে ইয়াদ রেখো বেটা, তামাম মুসিবত থেকে তিনিই তোমাকে হেফাজত করবেন।" –একি তবে গায়েবী কিছু?

পরের দিন সে অদ্ভুত এক পত্র পেলো। এক ফকির এসে দুর্গের দ্বাররক্ষীকে দিয়ে গেছে। হস্তাক্ষর হিজিবিজি। কোন সম্বোধন না করে বা নিজের কেনো নাম ঠিকানা না দিয়ে লেখক তাকে লিখেছে – পদব্রজে আর কখনও দূরে কোথাও আসবেন না। সাপুড়িয়ারা সাপ নিয়ে আপনার এন্তেজারে আছে। একান্তই বেরুলে ঘোড়ায় চড়ে বেরুবেন। আর সেই সাথে খেয়াল রাখবেন, আপনি শত্রুহীন নন। নিজের হিফাজতের ব্যাপারে বেখেয়াল হওয়া চলবে না।

পত্র পাঠের পর আলী আশরাফের দীলে একই প্রশ্নের উদয় হলো – কে এই গায়েবী দোস্ত? তবে কি মুহব্বত খাঁ! কয়দিন আগে মুহব্বত খাঁর এমনই এক হুঁশিয়ারী সে পেয়েছে।

এরপর আলী আশরাফ দুর্গ থেকে বেরুলে পায়ে হেঁটে আর বেশী দূরে যায় না। তার সমঝে নিতে কষ্ট হয়নি যে, এখানকার কায়েমী দুশমনরাই পিছ নিয়েছে তার। লায়লা আকতারের স্মরণে দীল তার একান্তই উতলা হয়ে উঠলে এখন সে বেশীর ভাগই ঝিলের

ধারে আসে, ওখানেই চুপ চাপ বসে থাকে।

আরব আলীর তামাম কোশেশ ভেস্তে গেলো। ঝাঁপি হাতে দুর্গের দিকে বেরিয়ে আর এক সাপুড়িয়া তীরবিদ্ধ হয়ে পথের মাঝেই প্রাণ দিলো। এরপর আর কোন সাপুড়িয়াকেই আরব আলী রাজী করাতে পারলো না। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। তার কামিয়াবীর খোশ পয়গাম পাওয়ার জন্যে তার বেরাদরেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পাণ্ডুয়ায় বসে আছে। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেলে সেখানে তার মাথা তুলে দাঁড়ানোর আর উপায় নেই।

আব্দুল লতিফের মকানে বসে আরব আলী আব্দুল লতিফের সাথে এই আলাপই করছিলো। এমন সময় হাজির হলেন দৌলত খাঁ। এসেই তিনি আরব আলীকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তোমার উপর ক্রমেই আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। এত বড়াই করে বললে সেদিন, আর আজ অবধি কিছুই করতে পারো নি?

আরব আলী বেজার হয়ে বললো, কি করে পারবো? পরিকল্পনা আগেই যদি ফেঁসে যায়, তাহলে আমি করি কি করে? কোন সাপুড়িয়া এগুলেই আলী আশরাফের লোকেরা দরাদ্দর তীর মেরে তাদের খতম করে দিচ্ছে।

দৌলত খাঁ অবাক হয়ে বললো, পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে!

ঃ নইলে কি আর কাজ তুলতে এতদিন লাগে?

ঃ তাহলে এক কাজ করো। একটা কায়দা ভেস্তে গেলে আর এক কায়দা খাটাও। হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে খামোশ হয়ে বসে থাকলেতো চলবে না?

আব্দুল লতিফ বললো, কোন কায়দাই তো হাতড়িয়ে আমরা পাচ্ছিনে। আমাদের সাপুড়িয়ারা একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে। সেরেফ খুন করা হলে তো আমার ঘরেও গাদা গাদা তীর আর আস্তাবলে গণ্ডা গণ্ডা ঘোড়া আছে। এক লহমায় মকসুদ হাসিল করা যায়। কিন্তু এটাতো অন্য ব্যাপার!

দৌলত খাঁ বললেন, তাহলে ঐ তীরের সাহায্যই নাও। সূঁচের মতো সূঁচালো দুই তিনটে ফলাযুক্ত তীরের মুখে মুখে তীব্র বিষ মাখিয়ে নিয়ে কোন অদৃশ্য স্থান থেকে আলী আশরাফের পা বা হাঁটুর উপর মারো। আঘাত করার পরই তীরটাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই সবাই ভাববে এ মৃত্যুও সর্প দংশনের মৃত্যু। ক্ষতটা সূক্ষ্ম হলে সর্পাঘাত ছাড়া অন্য আঘাত বলে কেউ ভাবতেও পারবে না।

আরব আলীরা সন্ধান নিয়ে জেনেছে, আলী আশরাফ মাঝেমধ্যেই ঝিলের ধারে বসে থাকে। গুপ্তচর মারফত আরো সন্ধান পেয়েছে – শুক্রবার সকলের একবেলা ছুটি থাকায় প্রতি শুক্রবারেই বাদ আসর আলী আশরাফ ওখানে এসে এক দেড়াকতলে বসে এবং মাগরিবের আযান কানে এসে না পৌঁছা তক ওখানেই বসে থাকে। স্থির হলো – এই উপযুক্ত সময়, মাগরিবের আলো-আঁধারই এ কাজের জন্যে প্রয়োজন এবং আগামী

শুক্রবারেই এ ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে হবে। প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে ঘাতক নিয়োগের উপদেশ দিয়ে দৌলত খাঁ চলে গেলেন।

গুপ্তচরের আহরিত খবর বিলকুল বিশুদ্ধ। শুক্রবার বাদ আসর আলী আশরাফ ধীরে ধীরে ঐ ঝিলের পাড়ে এলো এবং বৃক্ষতলে বসলো। ঘন-পল্লববিশিষ্ট এই দেড়াকটি ঝিলের পাড়ের অন্যান্য গাছ-গাছালির সংলগ্ন। এই গাছ-গাছালির সাথেই এক বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড় মাঠের মধ্যে অনেক দূরে নেমে গেছে।

ধীরে ধীরে দিবা ভাগ শেষ হয়ে এলো। সোনালী থালার মতো গোধুলির সূর্যটা দেখতে দেখতে দূরবর্তী বনারণ্যের ওপারে গায়েব হয়ে গেলো। মাগরিবের আযান প্রায় আসন্ন। ঠিক এই মুহূর্তে আলী আশরাফের দেহরক্ষীটি অল্প একটু দূরে থেকে গাছের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে সংগে সংগে হাঁক দিলো হুজুর, সরুন-সরুন, শীগগির সরুন!

তার মুখের কথা শেষ না হতেই আলী আশরাফের মাথার উপর বিকট এক আর্তনাদ ধ্বনিত হলো। আলী আশরাফ চমকে উঠে দাঁড়াতেই গাছ থেকে একটা লোক তার সামনে স্বশব্দে ভূপতিত হলো। তার হাতে ধরা তীর-ধনুক হাত থেকে খসে অল্প একটু দূরে গিয়ে পড়লো। আলী আশরাফ লক্ষ্য করলো, এ লোকটার পৃষ্ঠদেশও তীবিদ্ধ। ফলাসহ তীরের প্রায় সিকিটাই ঢুকে গেছে পিঠের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুটন্ত অশ্ব-পদশব্দ আলী আশরাফের কানে আসতেই আলী আশরাফ দুস্‌রা দফা চমকে উঠলো। পেরেশান হয়ে তৎক্ষণাৎ সেদিকে নজর দিতেই সে হাজ্জব বনে গেলো। মিশকালো বস্ত্রখণ্ডে সারাদেহ আবৃত এক সওয়ার আলো আঁধারের মধ্যে তীর ধনুক হাতে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো!

অতঃপর আলী আশরাফ অনুসন্ধানী নজরে চার দিকে চাইলো। কিন্তু গাছে বা অন্য কোথাও আর কোন মানুষের সন্ধান সে পেলো না। ইতিমধ্যেই দেহরক্ষীটি হৈ হৈ করে ছুটে এলো। সে এসে হাজির হতেই ভূপতিত ঘাতকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। ঘাতকের ভূপাতিত তীরের দিকে ইঙ্গিত করে দেহরক্ষীটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, সর্বনাশ! আর একটু হলেই ঐ তীর এসে আপনার পিঠে বিঁধতো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে, তার আগেই কে একজন এই ব্যাটার পিঠেই তীর মেরে দিয়েছে!

এক লহমার মধ্যেই সব কিছু ঘটে গেলো। তামাম ঘটনাই আলী আশরাফের কাছে ভেল্কিবাজির চেয়েও বিস্ময়কর মনে হলো। সব কিছু ছাপিয়ে তার দীলে আবার ঐ একই প্রশ্ন জোরদার হয়ে উঠলো – কে তাকে বাঁচালে! কে ঐ অশ্বারোহী? তবে কি জহিরুদ্দীন, নাকি কোন অলি-আউলিয়া কেউ!

ক'দিন আগে জহিরুদ্দীন এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে গেছে। ইতিমধ্যেই এই দুইয়ের মধ্যে দোস্তি জমে উঠেছে। তার মুসিবতের কথা শুনে জহিরুদ্দীন তাকে পুনঃপুনঃ হুঁশিয়ারী দিয়ে গেছে। বলে গেছে তার পেছনে দুশমনেরা তৎপর হয়ে

উঠেছে। উজির খান জাহান ও আজম খান সাহেবেরা তার হেফাজতির ব্যাপারে দুর্ভাবনায় আছেন। এমনভাবে গা এলিয়ে চলা তার কিছুতেই উচিত নয়। তার এক লহমার জন্যেও বেখেয়াল হওয়া চলবে না। মুহব্বত খাঁও অশেষ তকলিফ করে এই পয়গামই তার কাছে পাঠিয়েছেন।

আলী আশরাফও ব্যাপারটা উপলব্ধি করছে। কিন্তু সে সোচ্ করে পাচ্ছেনা, বার বার কে তাকে বাঁচাচ্ছে!

* * *

হপ্তাখানেক পর সুলতান আলী আশরাফকে দরবারে তলব দিলেন। ভরা দরবারের মাঝে এসে আলী আশরাফ কুর্নিশ করে দাঁড়ালে সুলতান তার দিকে এক নজরে চেয়ে হাল্কা কণ্ঠে বললেন, নিজের হেফাজতিই যার হরকদম বিপন্ন হয়, অন্যে আর তার কাছে কি হেফাজতি আশা করবে মিয়া?

আলী আশরাফ বিনীত কণ্ঠে বললো, জনাব!

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বললেন, তোমার কাজ-কামের খোশ খবরই পাচ্ছি। কিন্তু সেই সাথে এ খবরও পাচ্ছি যে, তুমি একজন সুস্থ মানুষ নও। পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি দীওয়ানা। নিজের জানপ্রাণ সম্বন্ধে তুমি বিলকুল উদাসীন। জিন্দেগীর শুরুতেই কোন চোট খেয়েছো নাকি?

আলী আশরাফ চমকে উঠলো। এত বড় সত্যের সামনে পড়ে সে নির্বাক হয়ে গেলো। সুলতান বলেই চললেন, নইলে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের দায়িত্বশীল মুহাফিজ, তুমি কেন আওয়ারা হয়ে ঘুরবে?

ঃ মেহেরবান!

ঃ হাতের কাজ হালকা হলে খেলাধূলা বা অন্য কিছু করবে। নির্জন ডোবার ধারে চুপচাপ বসে থাকবে – এটা তো কোন সুস্থতার লক্ষণ নয়?

সুলতান উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, যদি দীল চায় বাইজী ডেকে দুর্গের মধ্যে নাচ দেখো, গান শুলো। এছাড়া যদিও আমার একন্তই না পছন্দ, তবু অভ্যাস থাকলে একটু আধটু শরাব পিয়ো! লেকেন –

আলী আশরাফ সুলতানের কথার মধ্যেই তাজিমের সাথে প্রতিবাদ করে বললো, গোস্তাকী মাফ হয় জনাব। ওসবে আমার তিল পরিমাণ আসক্তি নেই। ওসব না-পছন্দ।

ঃ বিলকুল?

ঃ জী, জনাব। সঙ্গীত আর সাহিত্যে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ থাকলেও মউজ করার ব্যাপারে এ গোলাম জিন্দেগী ভর অনভ্যস্ত।

সুলতানের পাশে বসা চকচকে লেবাসের এক ছিম ছাম নওজোয়ান আলী আশরাফের এ কথায় খানিকটা শব্দ করেই হেসে ফেললেন।

সুলতান তার দিকে তেরছা নজরে চাইলেন। পরে হাল্‌কা করে বললেন, শাহজাদা আমির-ই-আজম সাইফুদ্দীন হামজা শাহ এতে হেসে ফেললেন যে!

আলী আশরাফ উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করলো, এই সেই শাহজাদা! পাণ্ডুয়ার ভবিষ্যৎ কর্ণধার!

শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা তেজের সাথে বললেন, কসুর মাফ হয় আব্বা হুজুর! বাইজীর নাচ, গান আর শরাব যে পুরুষের না-পছন্দ, জেনানা মহলের খোজা প্রহরী হিসাবেই তাকে মানায় ভাল, কোন দুর্গের মুহাফিজ বা লড়াইয়ের জওয়ান হিসাবে সে একদম বে-মানান।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ মওজ পৌরষের একটা অতিরিক্ত লক্ষণ। মওজ না করলে কোন পুরুষের তাকদ বৃদ্ধি হয় না। হিম্মত বাড়ে না এবং জান্‌বাজির কাজে তার দীলে কোন রকম জোশ পয়দা হয় না।

দরবারের প্রায় বারআনা সভাসদই শাহজাদার এ কথায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং শাহজাদাকে সমর্থন দিয়ে বললেন, মারহাবা! মারহাবা!

সুলতান হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে মুহাফিজ আলী আশরাফের মতামতটা জানতে চাই।

আলী আশরাফ বললো, আমার বদনসীব জাঁহাপনা, আমি এ কথার সাথে এক হতে পারছিনে। শাহজাদার এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রায় গোটা দরবারই যেখানে শাহজাদার মনোরঞ্জনে উন্মুখ, সেখানে এই যুবকের সাহস দেখে সুলতান তাক লেগে গেলেন। এক নজরে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, কেন?

আলী আশরাফ বললো, কোন জানবাজ বা শক্ত কাজের জন্যে জরুরত– নেক নিয়াত, আর মজবুত ঈমান, মওজ করা নয়। নিয়াতের জোশই বড় জোশ জনাব! মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন– এই প্রতিজ্ঞাই বড় শক্তি। মওজ থেকে যে কুওতের পয়দা হয় তা যেমনি কমজোর তেমনি ক্ষণস্থায়ী। জোনাকির আলোর মত সে কুওত টিম করে জ্বলে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়। শাহজাদার দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি রুষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, আপনার মতলব?

আলী আশরাফ নির্ভীক কণ্ঠে জওয়াব দিলো, শরাবের উম্মত্ততা নিয়ে মউতই বেছে নেয়া যায়, কোন শক্ত উম্মিদ হাসিল করা যায় না।

গোটা দরবারটাই হৈ হৈ করে উঠলো। মিয়া মোস্তাক সগর্জনে বললেন, গোস্তাকি জনাব, চরম বেয়াদপি! দানেশমান্দ শাহজাদার ধরণা বিলকুল ঠিক। কোন শক্ত কাজে যাওয়ার আগে দীলটা চাঙ্গা করে নেয়াটাই কামিয়াবীর পয়লা শর্ত। নিয়াত আর ঈমান

দিয়ে দরবেশগিরি করা চলে, জানবাজি চলে না। শাহজাদার এতবড় তত্ত্বপূর্ণ তফসীরের বিরোধিতা করা বেয়াদবীই নয়, চরম অবাধ্যতা।

দরবারটা গমগম করতে লাগলো। সুলতান শক্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, খামোশ!

পলকে দরবার আবার স্তব্ধ হয়ে গেলো। আলী আশরাফের উপর সুলতান নাখোশ হলেন নাকি–এই চিন্তায় উজির খানজাহান, উজির আজম খাঁ, সালার জহিরুদ্দীন ও ফৌজদার আতা খাঁসহ কিছু কিছু অন্য দরবারীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুলতান এসবের ধারে কাছেও এলেন না॥ খানিক নীরব থেকে তিনি আলী আশরাফকে লক্ষ করে ধীর কণ্ঠে বললেন, আলী আশরাফ, আমার ধারণা, কামরূপ রাজের ফৌজই সীমান্ত অতিক্রম করে গোপনে আমার রাজ্যে অভিযান চালাচ্ছে এবং সীমান্তের পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। গুপ্তচরেরা এর কোন সঠিক তথ্য দিতে পারছে না। লুটপাটের খবরটাই তারা দিচ্ছে, কিন্তু কারা এই লুণ্ঠনকারী তার কোন হাদিস করতে পারছে না। আমার কিছু অভিজ্ঞ সালারও সসৈন্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে কোন হাদিস করতে পারেন নি। গোপন এই হামলার হাদিস সেপাই সৈন্য ছাড়া গোপনে কেউ একা একা আনতে যাওয়ার হিম্মত দেখাতে পারেন নি। যেহেতু লুটপাট ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ নেই, সেহেতু তাদের ধারণা, এটা কোন পরদেশী হামলা নয়, এসব অভ্যন্তরীণ রাহাজানদের কাজ। কিন্তু কেন যেন আমি এদের কারো সঙ্গেই একমত হতে পারছিনে। আমার খেয়াল, কামরূপ রাজই নাড়া দিয়ে পাণ্ডুয়ার শক্তি পরিমাপ করছে।

সুলতান একটু থামলেন। আলী আশরাফ কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন, ছত্রা দুর্গের মুহাফিজ হিসাবে এ তথ্য বের করা তোমার কাজ হলেও তোমাকে আমি এযাবত এ দায়িত্ব দেই নি। কারণ কাজটা খুব শক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ আর সে তুলনায় তুমি অভিজ্ঞতায় তরুণ আর খানিকটা খেয়ালী।

আলী আশরাফ জিজ্ঞাসু নেত্রে বললো,

জনাব!

ঃ এ দায়িত্ব কার উপর দেয়া যায় এ নিয়ে আমি পেরেশানীতে ছিলাম। আজ আমার খেয়াল হচ্ছে– এর সুরাহা যে করতে পারবে– সে লোক সেরেফ তুমি!

ঃ আলমপনা।

ঃ এ দায়িত্ব তোমার উপরই দিলাম।

ঃ জনাবের অশেষ মেহেরবানী! আমি তৈয়ার।

ঃ কিন্তু ইয়াদ রেখো, এটা সেপাই সৈন্য নিয়ে লড়াই করতে যাওয়া নয়, এটা গোয়েন্দাগিরি করা। সেপাই সাথে থাকবে বটে, তবে তারা থাকবে দূরে ও বাতেনে। এখানে জানের ঝুঁকি চরম, হুঁশিয়ার!

শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা অবাক হয়ে বললেন, সেকি আব্বা হুজুর! যে পুরোপুরি সুস্থ মানুষ নয়, একজন দীওয়ানা আদমী, তাকেই দিচ্ছেন এই দায়িত্ব? পয়লা কদম না

ফেলতেই তো ও মরে একদম ভূত হয়ে যাবে!

সুলতান শানদার কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, ভূত হলেও সে ভূত হয়েই সবাইকে দাবড়ে বেড়াতে পারবে। না মরেই ভূত হয়ে শ্যাওড়াতলায় মুখ লুকিয়ে থাকবে না।

ঃ আব্বা হুজুর!

ঃ জানো না যখন, তখন জানার কোশশ করো– নেক নিয়ত আর ঈমান এর চেয়ে বড় হিম্মত এ জাহানে নেই।

সুলতান দরবার থেকে উঠে গেলেন।

* * *

আলী আশরাফ ফিরে এসে কামরূপ সীমান্তে রওনার জন্যে তৈরি হতে লাগলো। সত্যিই বড় কঠিন এ কাজ! সঙ্গী সাথী নিয়ে হৈ হৈ করে এগুলে কোন হদিসই পওয়া যাবে না। এগুতে হবে একাকী। বাছাই করা সেপাইয়ের ছোট্ট একটা দল তার পেছনে থাকবে বটে, তবে তারা থাকবে দূরে। কোন পরিকল্পিত কাজে তাদের ব্যবহার করা যাবে, কোথাও হামলা চালানোর জন্যে তাদের তলব করা যাবে, কিন্তু কোন আচানক বা আকস্মিক পরিস্থিতিতে তারা কোন সাহায্যেই তার আসবে না। আসস্মিক বিপদটা সামলাতে হবে নিজেকেই।

আলী আশরাফ আগাগোড়াই জানবাজ। এখন সে একেবারেই বেপরোয়া। এ জিন্দেগীর আকর্ষণ তার ঢিলে হয়ে গেছে। একটা বড় কাজে শহীদ হতে পারলেও সে এখন বর্তে যায়।

আলী আশরাফের ফিরে আসার দিন দুইয়েক পরেই সহকারী সালার আরব আলী সুলতানের ফরমান নিয়ে আব্দুল লতিফের মকানে এসে হাজির হলো। আলী আশরাফকে তার চাহিদা মাফিক সকল প্রকার মদদ যোগানোর কড়া নির্দেশ দিয়ে সুলতান তাকে ছত্রাদুর্গে পাঠিয়েছেন। সদর থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার যোগান নিশ্চিত করাই আরব আলীর কাজ। ছত্রাদুর্গে না এসে আরব আলী জায়গীরদার আব্দুল লতিফের মকানে এসে হাজির হলো। সুলতানের এ ফরমানে আরব আলী যারপরনেই নাখোশ ছিলো। সে একজন সহকারী সালার ও দরবারের বিশিষ্ট সভাসদ। আলী আশরাফের ফরমায়েশ খেটে ঘুরতে হবে তাকে, এ জিল্লতি হজম করতে তাকে তকলিফ পেতে হলো। খোদ সুলতানের ফরমান! অন্যথা করার উপায় নেই। তাই একদিন ছত্রাদুর্গে গিয়ে আলী আশরাফকে যথাসাধ্য সাহায্য করার নামকাওয়াস্তে একটা আশ্বাস দিয়ে এসে আরব আলী তার করণীয় শেষ করলো এবং আব্দুল লতিফের মকানে বসে মৌজ করে দিন কাটাতে লাগলো।

এই সময় আব্দুল লতিফের বালাখানা আর একবার গুলজার হয়ে উঠলো। বিশিষ্ট আমীর-উমরাহ-সালার প্রায় সকলেই এসে যোগ দিলেন এই দরবারে। দরবারের

শুরুতেই আরব আলী আফসোস করে বললো, আপনারা এতসব মাথা মুরুব্বী থাকতে এ দিকদারী আর কত দিন সইতে হবে আমাদের?

রাজা গণেশ বললেন, কি বলতে চাও, সরাসরি বলো। হাতে বেশী সময় নেই। এক এক কাজের অজুহাতে আমরা এক এক জন এক এক দিকে বেরিয়ে এখানে এসে জুটেছি। ঝটপট কাজ সারতে হবে।

আরব আলী বললো, সুলতানের খামখেয়ালী ক্রমেই খুব বেড়ে যাচ্ছে। উনি যা ইচ্ছে তাই হুকুম করে বসবেন আর তাই আমাদের নীরবে পালন করতে হবে? এর প্রতিবাদ করার লোক কেউ কি এ দরবারে নেই?

মিয়া মোস্তাক বললেন, ধীরে। এত অধীর হলে চলবে না। কোন কিছু চরমে না উঠলে তার প্রতিকার সঙ্গে সঙ্গে হয় না। তোমার কি ফরিয়াদ, স্পষ্ট করে বলো।

আরব আলী বললো, আলী আশরাফ একটা দুর্গের মামুলী এক মুহাফিজ। হতে পারে আমার চেয়ে পদমর্যাদায় সামান্য একটু উপরে। কিন্তু তাই বলে এই জিল্লতি? সুলতান বাহাদুর ফরমান জারি করলেন, তার চাহিদা মাফিক সব কিছু নিয়ে আমাকে হামেশাই তার পেছনে ছুটতে হবে। একি বরদাস্ত করার মতো?

রাজা গণেশ বললেন, তবু বরদাস্ত করতে হবে। অনেক কিছুই বরদাস্ত করার মতো নয়, তবু সবাই আমরা বরদাস্ত করে যাচ্ছি। ঐ যে আমাদের মুরুব্বী মোস্তাক সাহেব বললেন– আগে পাকতে দাও। কাচাতেই কামড়াকামড়ি শুরু করলে বিস্বাদই শুধু বাড়বে, মধুর নাগাল পাবে না।

ঃ মানে?

ঃ সুলতানকে সুপারিশ করে ও ফরমান আমিই তোমার নামে বের করে নিয়েছি।

ঃ আপনি!

ঃ হ্যাঁ, আমিই। নইলে এ ফরমান জহিরুদ্দীন বা আতা খাঁর কাছেই যেতো। তোমার কাছে আসতো না।

ঃ তাতে কি? এই গোলামী করার ফরমান আমি না পেলে কি এমন লোকসান হতো আমার?

রাজা গণেশ রুষ্ট হলেন। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, এইটুকুই যদি বুঝতে, তাহলে কি আর এই বয়সে এত দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আমাদের? উজির মিয়া মোস্তাক সাহেবের দিকেই নজর দিয়ে দেখো, একেবারেই যইফ আদমী! এতদূর আসতে কি তকলিফটাই না করতে হয়েছে তাঁকে!

ঃ তা মানে–

ঃ আলী আশরাফকে সাবাড় করার চরম আর চূড়ান্ত মওকা এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সেই স্বার্থেই আমাদের কাউকে না কাউকে এখন আলী আশরাফের সংস্পর্শে

যেতে হবে। দরকার হলে তোয়াজ তোষামোদ করেও তার আশেপাশে থাকতে হবে। আর এ কাজটা করতে হবে তোমাকেই।

ঃ আমাকেই?

মিয়া মোস্তাক বললেন, হ্যাঁ তোমাকেই। সুলতানের খামখেয়ালীর মোকাবেলা করতে হলে মোকাবেলার রাহা তৈরি করা সবার আগে প্রয়োজন। আর সে কারণেই আমাদের যাকে যেখানে দরকার সেখানেই তাকে লাগাতে হবে।

ঃ কি সেই রাহাটা?

ঃ রাহা ঐ একটাই। সুলতানের এইসব ভূইফোঁড় শক্তিগুলোকে খতম করে সুলতানকে পঙ্গু করে দেয়া। ঐ তুচ্ছ একটা ফরমান পেয়েই এত যদি আত্মসম্মানে ঘা লাগে তোমার তাহলে শাহজাদা সাইফুদ্দিন হামজার কথা একবার চিন্তা করো! কে না কে এক আলী আশরাফের পক্ষ নিয়ে ভরা দরবারে সুলতান খোদ শাহজাদাকে যেভাবে অপমাণিত করলেন, তা কি বরদাস্ত করার মতো? প্রতিবাদ করার ইচ্ছে কি তার দীলে জাগে নি?

ঃ তাহলে প্রতিবাদ করেন নি কেন?

ঃ রাহা তৈরি হয়নি বলে। এইসব আগাছাগুলো অতিসত্বর সাফ করার ইচ্ছে তার দীলেও জোরদার।

আরব আলী এ কথায় অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলো। সে আবার প্রশ্ন করলো, তাঁর দীলেও জোরদার?

ঃ জি হাঁ, তাঁর দীলেও। পিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তাঁর দীলেও ক্রমেই জমাট বেঁধে উঠছে। পেকে গেলে বেঁকে বসবেন তিনিও।

এসব এখন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। রাজা গণেশ অধৈর্য হয়ে বললেন, উজির সাহেব কিন্তু আমাদের সময় সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যাচ্ছেন। ওসব কথা থাক এখন। কাজের কথায় আসুন।

মিয়া মোস্তাক শরমিন্দা হয়ে থেমে গেলেন। আরব আলীকে লক্ষ্য করে রাজা গণেশ বললেন, আলী আশরাফকে খতম করার ব্যাপারে এবারেও অগ্রণী ভূমিকা তোমাকেই নিতে হবে। কারণ এ এলাকার পথঘাট সবার চেয়ে তোমারই বেশী জানা।

আরব আলী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, ভূমিকা নিতে তো আপত্তি আমার নেই। কিন্তু ভূমিকা নিয়ে করবো কি ? পরিকল্পনা আগেই যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কামিয়াব হবো কি করে?

সালার দৌলত খাঁ এতক্ষণ চুপচাপই ছিলেন। এবার তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বললেন, এ ব্যাপারটা সত্যিই আরো ভেবে দেখার দরকার। গোপন কথা বার বার ফাঁস হচ্ছে কি করে? জায়গীরদার আব্দুল লতিফ সাহেব এ ব্যাপারে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করেছেন? তার মকানেই পরিকল্পনা তৈরি হয়। কথাগুলো বাইরে যায় কি করে?

আব্দুল লতিফের সম্মানে জাররা ঘা লাগলো। সে বেজার কণ্ঠে বললো, আমরা ছাড়া আজ পর্যন্ত একজন লোকও এ দরবারের আশেপাশে আসেনি। কোন নওকর-নফরদেরও আমি এর ধারে কাছে ঘেঁষতে দেইনি। তবু এসব ফাঁস হচ্ছে কি করে, সে জওয়াব আমার দেয়া সম্ভব নয়। আমার রক্ষী-প্রহরীর কয়েকজনকে আমি এ কারণে ইতিমধ্যেই পরিবর্তনও করেছি। বাড়ীর বাইরে সবাইকে সতর্ক পাহারায় বসিয়ে রেখেছি। এরপরও যদি আবার আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়, তাহলে বুঝবো, আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ এই বেঈমানী করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন আপত্তি তুলে বললেন, আব্দুল লতিফ সাহেবের এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাদের সবার নসীব যেখানে এক সাথে গাঁথা, সেখানে আমাদের কেউ বেঈমানী করবে, এমন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

রাজা গণেশ সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, খামাকা বিতণ্ডা করে লাভ নেই। আবার যাতে এমনটি না ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে – ব্যাস্! ফুরিয়ে গেলো। এবার কথাটা আমাকে বলতে দাও।

আরব আলী নাছোড় বান্দা। বার বার অকৃতকার্য হওয়ায় তার আর আস্থা কিছুই ছিলো না। সে অধৈর্য হয়ে বললো, গোস্তাকী মাফ হয় রাজা সাহেব! যত কথাই বলুন, খুন না করে খতম করার কোন দাওয়াই আর আমাকে দেবেন না।

রাজা গণেশ যারপরনেই চটে গেলেন। অত্যন্ত রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, খুন করেই খতম করতে পারবে এবার। এত উত্যক্ত করলে আমি আর কিছু বলতে চাইনে, যা খুশী তোমরা করো। গোস্বাভরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

আরব আলী এতক্ষণে ঠাণ্ডা হলো। নিজের কসুর বুঝতে পেরে সে বার বার মাফ চাইতে লাগলো। রাজা গণেশ এতে কিছুটা নরম হয়ে এলেন বটে, কিন্তু দীল তার পুরোপুরি রোষমুক্ত হলো না। তিনি নাখোশ কণ্ঠে বললেন, উজির সাহেব এবার এদের বুঝান। আমার মন-মেজাজ আর ঠিক নেই।

উজির মিয়া মোস্তাক সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সবুর বলে তোমাদের যদি কোন কিছুই না থাকে, তাহলে এত বড় জেহাদে কামিয়াব হবে কি করে? ঠাণ্ডা হয়ে শুনো। আলী আশরাফ কামরূপ রাজ্যের কাছাকাছি গেলেই গোপনে তাকে ওখানেই সাবাড় করতে হবে। সবাই জানবে, গোয়েন্দাগিরির সন্ধান পেয়ে হামলাকারীরাই খতম করেছে আলী আশরাফকে। এ খুনের দায় আমাদের কারো ধারে কাছেও আসবে না। সবারই মনে ধরলো কথাটা। সবাই এবার খুশীতে সোচ্চার হয়ে উঠলো। আব্দুল লতিফ বললো, মারহাবা! তাই তো! এ কথাটা ভেবেই দেখিনি আমরা কেউ? গোপনে আলী আশরাফের পেছনে ফৌজ লেলিয়ে দিলেই তো অনায়াসে কাজ উদ্ধার হয়ে যায়।

রাজা গণেশ মুখ খুললেন আবার। বললেন, না, তা হয় না। খানিকটা দূরে দূরে

হলেও আলী আশরাফের ফৌজও গোপনে তার পেছনে থাকবে। পিছু নিলে অনর্থই বাড়বে শুধু। কাজ উদ্ধার হবে না।

ঃ তবে?

ঃ আলী আশরাফ তার ফৌজ থেকে অনেকখানি আগে থাকবে। পেছনে ছুটার পরিবর্তে আগে ছুটেই মতলব হাসিল করতে হবে।

আরব আলী বললো, সেটা তাহলে কিভাবে করতে হবে বুঝিয়ে বলুন?

মিয়া মোস্তাক বললেন, আমি চলছি শুনো! কামরূপ সীমান্তে পৌঁছার ক্রোশ দেড়েক আগে আমাদের যে গড়দিয়ার নামে একটা নামকরা মৌজা আছে, গিয়েছো সেখানে কোন দিন?

দুইদিকে সারিসারি টিলা আর বন। মাঝখানে আধাক্রোশের মতো সরু একটা পথ। এ পথ ছাড়া গড়দিয়ার যাবার আর দুস্‌রা কোন পথ নেই। ঐ সরুপথের মুখেই সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে মুরাদ বেগ আর তুমি আগে থেকেই মোতায়েন থাকবে। আলী আশরাফ ঐ পথে ঢুকলেই আচানক তাকে চারদিক থেকে ঘিরে খতম করে দেবে। আলী আশরাফের দূরবর্তী ফৌজ যখন ওখানে এসে পৌঁছবে, তখন তারা দেখবে সীমান্তের হামলাকারী দস্যুরা আলী আশরাফকে ইতিমধ্যেই খুন করে রেখে গেছে! ব্যাস্‌! ধরছে কিছু মগজে?

আরব আলী ইতস্তত করে বললো, তাতো ধরছে। কিন্তু একটা কথা মগজে আমার কিছুতেই আসছে না যে, এতদিক রেখে আলী আশরাফ কেন ঐ দিকেই যাবে আর ঐ রাস্তায় ঢুকবে?

রাজা গণেশ বললেন, এইখানেই ভূমিকাটা তোমার। হামলাকারীদের তৎপরতা ঐ গড়দিয়ারেই বেশী চলছে। গোয়েন্দাগিরি করলে আলী আশরাফকে যেতেই হবে গড়দিয়ারে। তার আগ্রহটা তুমি আর একটু উস্‌কে দেবে মাত্র।

ঃ কেমন করে?

ঃ সুলতানের হুকুম আছে, ছত্রাদুর্গে থাকবে তুমি, আব্দুল লতিফের এই বালাখানায় নয়। আলী আশরাফের পাশে পাশে থেকে তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে, এই অভিযানের ব্যাপারে তার পরামর্শদাতা কারা? কোন্‌ কোন্‌ লোকের সাথে আলী আশরাফ এ নিয়ে বেশী আলাপ করছে? যে কোন মূল্যে তাদের আগে হাত করবে তুমি। দোস্তি করবে তাদের সাথে। তাদের দ্বারাই আলী আশরাফকে গড়দিয়ার যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করবে। পথঘাট বুঝিয়ে দিয়ে পরামর্শদাতারা তাকে একটু উৎসাহ দিলেই ব্যাস। আলী আশরাফ সুড়সুড় করে ফাঁদের মধ্যে ঢুকে যাবে।

আরব আলী এই ঘোরপ্যাঁচটা নাপছন্দ করলো। বললো, সে জন্যে এত কাঠ পুড়িয়ে লাভ কি? আলী আশরাফকে তোয়াজ করতে আমাকে যদি যেতেই হয়, তাহলে গড়দিয়ার যাওয়ার জন্যে সে পরামর্শ আমিই তাকে দেবো।

রাজা গণেশ বললো, দিতে পারো। তুমি তাকে সে যুক্তি দিলে তোমাদের আর তকলীফ করে ঐ সরু রাস্তায় যাওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়বে না।

ঃ কেন?

ঃ আলী আশরাফের মাথায় তোমাদের অনেকের চেয়ে তোলাখানেক বেশী মগজ আছে। সে নিশ্চিতভাবে জানে কারা তার দুশমন আর কারা তার দোস্ত। তুমি তাকে সে যুক্তি দিলে তোমাকে বোকা বানাবার জন্যে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হবে বটে। কিন্তু কাজের সময় ভুলেও ও রাস্তা মাড়াইবে না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ সে যুক্তি তো দেবেই না, বরং তুমি যে এসবের ধারে কাছে আছো, সেটাও বুঝতে দেবে না।

শুনতে শুনতে আব্দুল লতিফ বললো, এত ঝুটঝামেলায় না গিয়ে আলী আশরাফ গোয়ালপাড়া পার হলেই সেখানে তাকে খতম করলে কেমন হয়?

রাজা গণেশ নাখোশ নজরে তার দিকে চাইলেন। পরে বললেন, তোমার নিজের মাথার সাথে আমাদেরও অনেকের মাথা চলে যায়। এর বেশী কিছু হয় না।

ঃ মানে?

ঃ হামলাকারীরা কোনদিনই সীমান্ত এলাকা ছেড়ে এক ধাপও ভেতরের দিকে আসেনি। সেখানে এই গোয়ালপাড়ার ওপারেই আলী আশরাফ খুন হলে টানাটানিটা সবার আগে জায়গীরদার আব্দুল লতিফকে নিয়ে শুরু হয় এবং পরে আমাদের সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে শেষ হয়।

বিতর্ক খাটো করে রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাকের পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হলো। স্থির হলো, মুরাদ বেগের সাথে আব্দুল লতিফও যাবে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আরব আলী। আলী আশরাফের বেরিয়ে পাড়ার দিনক্ষণ জেনে নিয়ে এসে আরব আলী মুরাদ বেগ আর আব্দুল লতিফের সাথে যথাসময়ে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়বে এবং আলী আশরাফের আগেই এসে গড়দিয়ারের সেই সরু রাস্তার মুখে অবস্থান নেবে।

সিদ্ধান্ত পাকা করে সভার কাজ শেষ হলো।

পরিকল্পনার প্রথম অংশ নির্বিঘ্নে উৎরে গেলো। আরব আলী তার ভূমিকা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আব্দুল লতিফের মকানে ফিরে এসে মুরাদ বেগকে জানালো, আগামীকাল প্রত্যুষেই রওনা হচ্ছে আলী আশরাফ। তাদের আর এক লহমা অপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

সেই রাতেই ফৌজ নিয়ে মুরাদ বেগ, আব্দুল লতিফ আর আরব আলী গড়দিয়ারের অভিমুখে যাত্রা করলো।

পরের দিন প্রত্যুষে আলী আশরাফও বেরিয়ে পড়লো গড়দিয়ারের উদ্দেশ্যে। গোয়ালপাড়া পেরিয়ে গেলে তার তালিম দেয়া ফৌজ তার পেছনে গা ঢাকা দিয়ে

গোয়ালপাড়ায় পৌঁছলো। আলী আশরাফের প্রায় আধা ক্রোশ দূরে থেকে নিশানা দেখে এগুতে লাগলো এরা।

আলী আশরাফের দীলে হাজার চিন্তা বুদবুদের ন্যায় জাগছে আর মিলাচ্ছে। তার নিজের জিন্দেগীটাতো সূতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতোই লক্ষ্যহীন। বাংলা মুলুকের কওমী হুকুমাতটাও তার মতোই এক হালভাঙ্গা কিস্তি। কোন্ ঘাটে যে শেষ পর্যন্ত ভিড়বে এই কিস্তিটা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুলতান নিজে ঈমানদার এতে সন্দেহ নেই। দীলও তাঁর ফুলের মতো পবিত্র। কিন্তু তাঁকে প্রাচীরের মতো ঘিরে আছে বেশুমার বেঈমান। তাদের ডালপালা বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। সুলতান আরো শক্ত হলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতো। কিন্তু বাহ্যিকভাবে যতটা তিনি শক্ত, ভিতরগতভাবে ততটা তিনি দুর্বল। দরবার থেকে উঠে এলেই তিনি আবার আলাদা মানুষ। কাব্য-সাহিত্যের জারক ক্রিয়ায় তখন তাঁর স্থান ভিন্নলোকে। ইহজাহানের লেনাদেনা তাঁর কাছে তখন মামুলী। দুর্বৃত্তের মোকাবেরায় তাঁর চিত্তের দৃঢ়তা জ্ঞানচর্চার কুতুবখানায় বরফের মতো গলে পানির আকার ধারণ করে। মানবিক গুণ চর্চায় যতটা তাঁর আগ্রহ, দরবারের শোধনে তার অর্ধেক আগ্রহ থাকলেও পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের রূপ অন্য রকম হতো। সুলতানের এই আত্মঘাতী চরিত্রের আদৌ কোন পরিবর্তন আসবে কিনা কে জানে।

তারপর তাঁর আওলাদ। শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা তাঁর যে চরিত্র দিনে দিনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, তাতে ইলিয়াস শাহী হুকুমাতের আখেরাত অমাবস্যার রাতের চেয়েও অধিকতর তমসাচ্ছন্ন।

এমনই একটা আবস্থার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আলী আশরাফ পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের খেদমতে বদ্ধপরিকর। মউতের সাথে পাঞ্জা লড়ার নিয়তে হিমাদ্রির মতো অটল। আলী আশরাফের হাসি পায়। সামনে তার দুইটি রাহা– হয় গাজী না হয় শহীদ। তৃতীয় কোন রাহা নেই বা সে কল্পনাও তার নেই। কিন্তু হায়! যার জন্যে সে মরিয়া তার তিল পরিমাণ বাঁচার আশা থাকতো যদি! যাকে আগুন থেকে হেফাজত করতে তার এত আগ্রহ, সে হামেশাই আগুন নিয়ে না খেলতো যদি!

ভাবতে ভাবতে আলী আশরাফ চাঙ্গা হয়ে উঠে আবার। পাতনোন্মুখ ইমারতকে শক্ত ভিতের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাইতো নেক-নিয়তের সত্যিকারের লক্ষ্য। না-উম্মিদের নিঃসীম অন্ধকারে উম্মিদের আলো জ্বালানেই তো কামিয়াবীর সত্যিকারের স্বাক্ষর। তাকে নেতিয়ে পড়লে চলবে না। মকসুদ হাসিল করতেই হবে তাকে। ঝড় তুফান তরিয়ে পাণ্ডুয়ার হুকুমাতকে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে পৌঁছে তাকে দিতেই হবে।

এগিয়ে চলেছে আশরাফ। বিশাল এই জাহানের লা-ওয়ারিশ আশরাফ! মাতাপিতাহীন এতিম আলী আশরাফ! গাজী হলে যাকে খোশ আমদেদ জানিয়ে ঘরে ডাকার কেউ নেই, শহীদ হলে যার স্মরণে এক ফোঁটা আঁসু ফেলার কেউ নেই। সেই সৃষ্টিছাড়া আলী আশরাফ! উৎসাহের উৎস যার কিছুই নেই, তবু সীমাহীন উৎসাহী সেই

আলী আশরাফ!

গোয়ালপাড়া পেরিয়ে একটা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে খানিকটা বন জঙ্গলের পথ। বন পথে চলতে চলতে আলী আশরাফের অশ্বটা আচমকা দাঁড়িয়ে গেলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে আলী আশরাফ সতর্ক হয়ে উঠলো। সে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজরে কারণটা তালাশ করতে লাগলো। কোথাও কিছু না দেখে সে ঘোড়াকে আবার তাকিদ দিলো। তাকিদ পেয়ে ঘোড়া আবার পা তুলতেই একটা তীর এসে ঘোড়ার সামনে পড়লো। তীরটা মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে মাটি বিদ্ধ করে একদম খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তীরের গোড়ায় লাল ফিতায় বাঁধা একটা পত্র।

চমকে উঠে আলী আশরাফ পুনরায় চারদিকে ক্ষিপ্র নজরে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা এগিয়ে দিয়ে সে ঝুঁকে পড়ে পত্রটা তুলে নিলো। ক্ষিপ্র হস্তে পত্র খুলে সে তাতে চোখ বুলালো। ছোট্ট একটা চিরকুট। সেই হিজিবিজি লেখা–"আল্লাহর কমস, এ রাস্তায় গড়দিয়ার যাবেন না, ভিন্ন রাস্তা ধরুন।"

ইতিমধ্যেই আলী আশরাফের অশ্বটা চিঁহিঁ করে আওয়াজ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বনের ভেতর থেকেও একটা অশ্বপদশব্দ আলী আশরাফের কানে এলো। কোন চিন্তা-ভাবনায় না গিয়ে আলী আশরাফ সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। সেই শব্দকে অনুসরণ করেই দ্রুত বেগে ছুটতে লাগলো। আলী আশরাফের পিছু নেয়ার আভাস পেয়ে অগ্রগামী ঘোড়ার বেগও অধিকতর দ্রুত হলো। গাছগাছড়া আর নল খাগ্‌ড়ায় ঘেরা সেই অরণ্যের মধ্যে দুই অশ্ব ছুটতে লাগলো।

খানিকটা ছুটার পরই গাছ-গাছড়া আর নল-খাগড়ার ভিড় ফিকে হয়ে এলো। আলী আশরাফ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো তার রশি দুইয়েক দূরে অগ্রগামী ঘোড়াটা প্রাণপণে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে মিশকালো পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত সেই সওয়ার!

আলী আশরাফের উত্তেজনা বেড়ে গেলো। আজ সে দেখবেই কে এই সওয়ার!

ঘোড়ার গতি দুইগুণ বাড়িয়ে দিলো আলী আশরাফ! অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সওয়ারের খুব কাছাকাছি চলে এলো। সেই সওয়ারও তার ঘোড়ার বেগ বৃদ্ধি করে ছুটতে লাগলো। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে আলী আশরাফের গতিকে ছুঁই ছুঁই অবস্থায় চলে এলো। তা লক্ষ্য করে অগ্রগামী সওয়ার তার গতি আরো অধিক বৃদ্ধি করতে গেলে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে অগ্রগামী অশ্বটা হুড়মুড় করে পড়ে গেলো এবং সওয়ারটা ছিটকে গিয়ে পাশেরই এক ঘন লম্বা খড়ের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে আলী আশরাফ তার অশ্বটাকে থামিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে নামলো এবং দ্রুতপদে খড়ের মধ্যে সেই সওয়ারের কাছে ছুটে গেলো। পড়ে যাওয়ায় সওয়ারটার মুখণ্ডলের আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। আলী আশরাফ তার মুখের দিকে চেয়েই এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে গেলো। এক অনবদ্য শিহরণে তার সারা

অঙ্গ কেঁপে উঠলো। সারাজাহানের সুষমা তার দুই চোখের মণিতে এসে জড়ো হলো। জিন্দেগীর নয়া স্বাদে তার দেহমন ভরে গেলো। ভূলুণ্ঠিত সওয়ারটি আর কেউ নয়– লায়লা আকতার!

পরিশ্রম আর উত্তেজনায় লায়লা আকতার ক্ষণকাল সজ্ঞাহীন ছিলো। আলী আশরাফ ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিতেই লায়লা আকতার ধড়মড় করে উঠে বসলো। মুখের আবরণ টেনে দিয়ে সে আবেগে কাঁপতে লাগলো। আলী আশরাফ আপ্লুত কণ্ঠে বললো, লায়লা আকতার! তুমি!!

লায়লা আকতার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, বললো। আপনি কেন এই মুসিবতের মধ্যে এলেন?

আলী আশরাফের কানে কোন কথাই গেলো না। সে একই রকম আবেগের সাথে বললো, তুমি বেঁচে আছো?

সখেদে লায়লা আকতার জওয়াব দিলো, এতদিন ছিলাম। আপনিই বোধ হয় আর আমাকে বেঁচে থাকতে দিলেন না।

ঃ মানে?

ঃ এভাবে আর কতদিন আমি বাঁচিয়ে রাখবো আপনাকে! আর আপনিই যদি না বাঁচলেন আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

লায়লা আকতার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আলী আশরাফ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, লায়লা, তুমি কেঁদো না। হাজারো প্রশ্ন আমার বুক ফেঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ইতিমধ্যে আলী আশরাফের ঘোড়াটা আওয়াজ দিয়ে ঘাড় দোলাতে লাগলো। এতে তারা দুইজনই সম্বিত ফিরে পেলো। লয়লা আকতার চোখ মুছে বললো, চলুন, আগে ঘোড়া সামাল করি।

লায়লা আকতার উঠতে একটু কষ্টবোধ করছিলো। সে উঠতে গিয়ে পুনরায় বসে পড়লো। আলী আশরাফ তা দেখে ব্যস্ত হয়ে তাকে ধরতে গেলে লায়লা আকতার হাত তুলে বাধা দিয়ে বললো, ছিঃ! ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি এখনও বেগানা পুরুষ?

হুঁশ হতেই আলী আশরাফ শরমে মাথা নীচু করলো। লায়লা আকতার উঠে দাঁড়ালে সে নীরবে লায়লা আকতারের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলো।

ঘোড়া দুটোকে নিয়ে তারা বনের মধ্যে এক নিরাপদ স্থানে এলো। সেখানে ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রেখে তারা নিজেরাও এক নিরাপদ স্থানে পাশাপাশি বসলো।

এবার লায়লা আকতারই কথা বললো আগে। সে বললো, আমার কথায় দীলে আপনি তকলিফ পেলেন তাই না?

আলী আশরাফ বেখেয়ালে বললো, কোন্ কথা?

ঃ ঐ যে বললাম, আপনি এখনও বেগানা পুরুষ?

ঃ না-না, কথাটাতো ঠিকই।

ঃ আপনি দানেশমান্দ্ ব্যক্তি। গুনাহগারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি সজাগ।

আলী আশরাফ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, সে তো অবশ্যই। কিন্তু –

ঃ আমি এখানে কি করে?

ঃ হ্যাঁ, তুমি এখানে কি করে? কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার আম্মা কোথায় আছেন? কেমন আছেন তিনি?

আলী আশরাফের অগোচরে লায়লা আকতারের ঠোঁটে ছোট্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে বললো, আমি জানি, আপনি এসব জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু এক কথায় তো এত কথার জওয়াব দেয়া যাবে না। এক এক করে বলতে হবে।

ঃ এক এক করেই বলো। গোটা জৌনপুরের এমন জায়গা নেই, যেখানে তোমাকে আব্দুল্লাহ চাচা তালাশ করতে বাকি রেখেছে বা আমি নিজেও এসে তালাশ করে দেখিনি। আমরা তো ধরে নিয়ে আছি তুমি আর ইহধামে নেই! আমার জিন্দেগীর তামাম আশা ভরসা খতম হয়ে গেছে!

আলী আশরাফের চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোটা আঁসু ঝরে পড়লো।

লায়লা আকতার সান্ত্বনা দিয়ে বললো, অবুঝ হবেন না। আল্লাহ তায়ালার রহমে আমি তো আছিই এবং আপনারই আছি।

চোখ মুছে আলী আশরাফ বললো, কোথায় ছিলে এতদিন? এখন কোথায় আছো?

ঃ এই বাংলা মুলুকেই ছিলাম আর এই বাংলা মুলুকেই আছি।

ঃ কোথায় আছো এখানে?

ঃ আমার ভাই আব্দুল লতিফের মকানে।

ঃ আব্দুল লতিফ! জায়গীরদার আব্দুল লতিফ?

ঃ সে কি! আমিও তো তাঁর মকানের পাশে ছত্রাদুর্গে আছি!

ঃ আমি তা জানি।

ঃ জেনেও কোন যোগাযোগ করোনি আমার সাথে? কোন খবরও দাওনি কাউকে দিয়ে? এভাবে চুপচাপ থাকতে পারলে?

ঃ নিরুপায় হয়েই চুপচাপ থাকতে হয়েছে। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন যোগাযোগ আমি করিনি।

ঃ কেন?

ঃ যে কারণে আপনাকে দেখে পয়লা দিনই পালিয়ে গেলাম, যে কারণে আজও পরিচয় গোপন করার জন্যে প্রাণপণে পালিয়ে যাওয়ার কোশেশ্ করলাম, সেই কারণে।

ঃ কি সে কারণ?

ঃ সে অনেক কথা। তার আগে শুনুন, আম্মাও ভাইজানের মকানেই আছেন। তিনি

এখন বিমারী। প্রায় মাস তিনেক ধরে একটানা ভুগছেন।

ঃ সেকি!

ঃ তিনি হামেশাই আপনার কথা বলেন। আপনাকে দেখার তাঁর বড় সাধ!

ঃ তবু তুমি খবর দাওনি আমাকে?

ঃ তবুও আমি দেই নি।

ঃ তোমরা যে এখানে, সে খবরটা জৌনপুরে পাঠানোও উচিত মনে করোনি?

ঃ তা অবশ্যই করেছি। এখানে আসার পরই দুই দুইখানা খত আমি লোকের হাতে জৌনপুরে পাঠিয়েছি। কিন্তু অনেক দিন পরও জওয়াব না পেয়ে বুঝলাম, কোন খত ওখানে পৌঁছেনি। এরপর ডাকযোগে খত পাঠানোর মতলব করতেই আপনাকে ঐ পুকুর পাড়ে দেখে সে মতলবও ত্যাগ করতে হলো।

আলী আশরাফ চমকে উঠলো। বললো, পুকুর পাড়ে মানে?

ঃ ঐ যে ঝোপের মধ্যে থেকে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন!

ঃ সে কি! সেই ঘোড়ার গাড়ী থেকে যে আউরাত আমার দিকে তাকিয়েছিলো, সে আউরাত তুমি?

ঃ হ্যাঁ, আমি!

ঃ তবুও পরিচয়টা গোপন করে চলে গেলে?

ঃ হ্যাঁ, গেলাম।

ঃ কিন্তু কেন?

ঃ কারণ একটাই। যদি জানতেন আমিই লায়লা আকতার আর আমি এখানে আছি, তাহলে অবশ্যই আপনি ছুটে আসতেন আমার কাছে। সবাই জানতো, পরস্পর আমরা পরিচিত। কেউ কেউ বলতো মুহব্বত আছে এদের মধ্যে। এমনটি ঘটে গেলে এতদিন আপনি আর ইহদুনিয়ায় থাকতেন।

ঃ কি করে?

ঃ হয় সাপুড়িয়ার সাপে খেতো আপনাকে, নয় ঘাতকের তীর খেয়ে মরতেন। নিদেনপক্ষে সে সব থেকে বাঁচলেও আজ আপনাকে মরতেই হতো– গড়দিয়ার যাবার ঐ টিলা ঘেরা সরু পথে। সেখানে দুশমনদের এক বাহিনী আপনাকে অতর্কিতে খতম করে দেয়ার ইরাদায় এখনও এন্তেজারে আছে।

ঃ আশ্চর্য! এসব কথা তুমি জানলে কি করে?

ঃ সেদিন ঐ পুকুর পাড়ে ওদের আলাপ শুনেই এ ধারণা হয় আমার। এছাড়া এ ধরনের তামাম যুক্তি-শলা ভাইজানের মকানেই হয়। ভাইজানের বালাখানা জেনানা মহলের পাশে। গুপ্তচরদের নজর এড়ানোর উদ্দেশ্যেই বলাখানাকে ভেতরে নেয়া হয়েছে। একদিন ঐ বালাখানার দেয়ালের পাশে আসতেই হঠাৎ আপনার নাম কানে আসায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেয়ালে কান লাগিয়ে জানলাম– আপনাকে খতম করার

জন্যে দুশমনেরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরপর থেকে আমার কান ঐ দেয়ালের পাশেই থাকে। যদি কেউ জানতো আপনি আমার প্রিয়জন, তাহলে কোন যুক্তি-শলাই আর ভাইজানের মকানে হতো না।

ঃ তাজ্জব! তাহলে তুমিই এইভাবে তীর চালিয়ে রক্ষা করেছো আমাকে?

ঃ কি আর করবো বলুন? এত তকলিফ করে আপনি আমাকে তীর চালানো শেখালেন, ঘোড়ায় চড়া শেখালেন, এখন যদি এসব বিদ্যা আপনার জন্যে কাজে না লাগাই, তাহলে উস্তাদের ঋণ আমি শোধ করি কি দিয়ে?

ঃ খতটাও কি তোমার হাতের লেখা ছিলো?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ অত হিজিবিজি লেখা কেন?

ঃ আমার লেখা যে চেনেন আপনি? তাই বাঁ হাত দিয়ে লিখেছি।

আলী আশরাফ বিহ্বল কণ্ঠে বললো, লায়লা!

লায়লা আকতার বললো, এরপর যদি আমাদের পরিচয়টা ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে উস্তাদের ঋণ এই শোধই তামাম শোধ আমার। আপনার আর কোন উপকারেই আসতে পারবো না আমি। আর আমার জন্যেই তাদের সব মতলব ভেস্তে গেছে এটা প্রমাণিত হলে ভাইজানই আমাকে কোতল করবেন।

আলী আশরাফ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আমার আফসোস্, তোমার ভাইজান এই ষড়যন্ত্রের একজন!

ঃ শুধু একজনই নন। তিনিও সবার সাথে মরিয়া। তবে এঁরা সবাই এক বিরাট খেলার গুঁটি মাত্র। আসল খেলোয়ার রাজা গণেশ নামে পাণ্ডুয়ার এক উজির।

ঃ হুঁ! তা থাক ওসব কথা। তোমরা কিভাবে এখানে এলে, সে কথাটা বলো। আমার কাছে এটা এখনও এক বিরাট রহস্য হয়ে আছে।

লায়লা আকতার ম্লান কণ্ঠে বললো, সে এক চরম দুর্যোগের কাহিনী। নেহায়েতই খোশ নসীবের জোরে ও আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে ইয্যতের সাথে আজও বেঁচে আছি। নইলে যে কি ঘটতো --

ঃ কি রকম?

ঃ আপনি বিহারে যাবার মাস ছয়েক পরে আচানক বিমার হয়ে সগীর চাচা ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। আমাদের মাথার উপর থেকে বিরাট এক আচ্ছাদন নেমে যায়। সগীর চাচা যত দিন জিন্দা ছিলেন ততদিন ঐ বস্তিতে কোন ডাকু-গুণ্ডা মাথা গোলাতে সাহস পায়নি। তারা তাকে ভয় করতো। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লুটেরা-ডাকুর উৎপাত দিন দিন বাড়তেই থাকে। এরই সুযোগ নেয় সালার আফতাব খাঁ। একদিন মাগরিবের পর তুফান শুরু হলো– যাকে বলে আঁধি। একটানা ধূলোর ঝড় বইতে লাগলো। প্রতিবেশীরা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিলো।

আমরাও ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ফৌজী পোশাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ভাইজান গিয়ে হাজির হলেন। ভাইজান আমাদের জানালেন, তিনি এখন আব্বা থেকে জুদা হয়ে আলাদা সংসার পেতেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। অনেক দিন আগে থেকেই তিনি আমাদের খোঁজ করছেন। লোক মুখে শুনে তিনি এই জৌনপুরে এসেছেন। এখানে অনেক বেলা থাকতেই এসে মাগরিব ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের নানা জায়গায় তালাশ করেছেন। এই মাত্র এক লোক তাঁকে মকান দেখিয়ে দেয়ায় তিনি এখানে এসেছেন।

ঘরের মধ্যে বসে আমরা এসব কথা শুনছি– এমন সময় পাঁচ ছয়জন সেপাই লুটেরার ছদ্মবেশে আমাদের মকানে এসে হামলা করলো। এদের একজন আওয়াজ দিলো, কেউ কোন মালপত্রে হাত দেবে না। সালারের হুকুম, সেরেফ ঐ আউরাত দুটোই চাই তাঁর। টেনে আনো ওদের।

সংগে সংগে দুশমনেরা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে এলো। ভাইজান তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে হুংকার দিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও তলোয়ার হাতে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। ভাইজান একজন তুখোড় যোদ্ধা। অল্পক্ষণেই আমাদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে দুশমনেরা পালিয়ে যেতে শুরু করলো। পালাতে পালাতে তাদের একজন হাঁক দিলো, এই তোরা চলে আয় সবাই। এদের ঘরে যে একজন ফৌজী খদ্দের ইতিমধ্যেই সওদা করতে এসেছে, তাকে আমরা জানি? চল, ফৌজ নিয়ে বাক্কার খাঁ সামনেই আমাদের এন্তেজারে আছে। গোটা বাহিনী নিয়েই তাকে আসতে বলি চল্। ব্যাটা সালার আফতাব খাঁকে চেনে না! তার ফৌজের গায়ে হাত!

দুশমনেরা ছুটে বেরিয়ে গেলো। আম্মা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ভাইজান বললেন, অবস্থা বড় খারাপ! সেরেফ লুটেরা হলে ভয় ছিলো না। একটা সালার তার ফৌজ পাঠিয়েছে। ওরা মার খেয়ে ফিরে গেলো। এ সংবাদ পৌঁছলেই গোটা বাহিনীই সত্যি সত্যিই এসে পড়বে। তখন আর তাদের ঠেকানো সম্ভব হবে না। এ ছাড়া আরো হাজ্জব যে, এত হৈ চৈ শুনেও বস্তির একটা লোকও আমাদের মদদ দিতে এলো না! আম্মা আরো ভীত হয়ে বলেন, তাহলে এখন উপায়? ভাইজান বললেন, আর কোন উপায় নেই। এখনই আমাদের পালাতে হবে। যে যেভাবে আছেন, এক্ষুণি বেরিয়ে আসুন আমার সাথে।

বলেই ভাইজান আম্মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেন। এরপর লাগাম ধরে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে আমাকে তিনি বললেন, জোরে জোরে পা ফেলে চলে আয় আমারে সাথে। কোন রা করিস্‌নে।

আম্মা ঘোড়ার উপর আর আমরা দুইজন হেঁটে সেই ধুলো ঝড়ের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সেই রাতেই বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূর এগুতেই আমাদের মকানে

আবার বহু লোকের হৈ চৈ শুনতে পেলাম। বুঝলাম, আফতাব খাঁর সেপাইরা আবার ফিরে এসেছে। ভাইজান যদি সেই সন্ধ্যায় না আসতেন সেদিন, একা আমি কিছুই করতে পারতাম না আর তাতে আমাদের নসীবটা যে কোন মোড় নিতো, তা কল্পনা করতে পারিনে।

লায়লা আকতার থামলো। আলী আশরাফ বললো তারপর?

ঃ কোনদিকে না চেয়ে আমরা একটানা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এলাম। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি, আম্মার মুখে তা শুনে ভাইজান খুব খুশী হলেন। জৌনপুরের এদিকে ভাইজানের পরিচিত এক অশ্ব ব্যবসায়ী বাস করতেন। ভাইজান সেই রাতেই সেখান থেকে আর একটা অশ্ব যোগাড় করলেন। অতঃপর আম্মাকে নিয়ে ভাইজান তার ঘোড়ায় এবং আমি নতুন ঘোড়ায় চড়ে লাগাতার সফর করে ছত্রায় এসে পৌঁছলাম।

লায়লা আকতার আবার একটু থামলো এবং দম নিয়ে বললো, এই হুটপিটের কারণে জানিয়ে আসতে পারলাম না। ভাবলাম, ভাইজানের মকানে ফিরেই আব্দুল্লাহ চাচাকে খত লিখবো। কিন্তু আমাদের বদনসীব, যে খোশদীল নিয়ে বাংলা মুলুকে এলাম, ভাইজানের মকানে এসে পৌঁছেই সেই খুশী-আনন্দ আবার কর্পূরের মতো উবে গেলো। এখানে এসেই দেখি, পাণ্ডুয়ার মসনদ নিয়ে যে কয়জন সওদাবাজি করেছেন, আমার ভাইও তাদের মধ্যে একজন এবং আমার ভাইয়ের মকানই সেই সওদাবাজির ঘাঁটি।

আলী আশরাফ বললো, তোমাদের যে নাপছন্দ এসব, তোমার ভাইজান কি তা জানেন?

ঃ না, আমরা এমনভাবে চলি, যেন এ সবের সাথে কোন সম্পর্কই নেই আমাদের!

ঃ তুমি এই যে ঘোড়ায় চড়ে মকান থেকে বেরোও আবার মকানে ফিরে যাও, চোখে পড়ে না কারো?

ঃ পড়ে তো।

ঃ সন্দেহ করে না কেউ?

ঃ না বেআব্রু হয়ে বেরুলেই ভাইজান নাখোশ হন। সালোয়ার পাঞ্জাবীর উপর বোরকা পরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ালে তিনি গর্ববোধ করেন। মাস কয়েক আগে এক ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় শরিক হয়ে সবাইকে হারিয়ে দিই। অবশ্য প্রতিযোগীরা কেউ তেমন কোন দক্ষ সওয়ার ছিলো না। সে যা-ই হোক, ভাইজান এতে এত খুশী হন যে, হপ্তা কয়েক ধরে তিনি সেই গপ্পই সবার কাছে করে বেড়ান।

আলী আশরাফ কপট নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বদনসীব আলী আশরাফ! তোমার কপাল যে ফাটা সেই ফাটাটাই!

ঃ মানে?

ঃ তোমার বাজার দর তো তাহলে ভয়ানক বেড়ে গেছে!

ঃ বটে!

ঃ এখন কত উঁচু তব্‌কার আমীর-উমরাহ শাদির পয়গাম পাঠাবে! আলী আশরাফের আর সেখানে পাত্তা কৈ?

ঃ হিংসা হচ্ছে?

ঃ হওয়াই তো স্বাভাবিক। তার উপর খুবসুরতটা ইতিমধ্যেই আরো যা বেয়ারা হয়ে উঠেছে–

ঃ মানে?

আলী আশরাফ হো হো করে হেসে উঠলো।

এতে লায়লা আকতারও হেসে ফেললো।

লায়লা আকতার নড়ে উঠলো। আলী আশরাফ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, আরে না - না, শুনো, আরো কথা আছে যে!

ঃ আপনার কথা এ জিন্দেগীতে শেষ হবে না।

ঃ দোওয়া করো, এ জিন্দেগীটা তোমার সাথে কথা বলেই যেন কাটিয়ে দিতে পারি।

ঃ হয়েছে। এবার বলুন, আর কি কথা?

ঃ তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করেছো কোন দিন?

লায়লা আকতার নীরব হয়ে গেলো। খানিক পরে নাখোশ কণ্ঠে বললো, এ কথাটা না তুললেই আমি খুশী হতাম।

ঃ কেন?

ঃ একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে ভাইজানকে নিয়ে তাঁর মকানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৎমা অর্থাৎ সেই দিল্লীওয়ালী এমন ব্যবহার করলেন যেন কোন চোর চোট্টা তাঁর মকানে এসে ঢুকেছে। আব্বা পাশেই ছিলেন। অথচ একটুকু প্রতিবাদও তিনি করলেন না। ক্ষোভে দুঃখে সেই যে ওয়াপস্ এলাম, আর কখনো যাইনি।

অনেক সময় অতিবাহিত হলো। বেঁধে রাখা ঘোড়া দুইটি ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। উভয়েই সজাগ হয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। লায়লা আকতার বললো, কিন্তু আপনি কেন সাধ করে এই আগুনের মধ্যে এলেন? কি গরজ ছিলো এই মসিবতের দিনে বাংলা মুলুকে আসার?

আলী আশরাফ বললো, এটা আমার ওয়াতন। আমার জন্মভূমি। মুসিবতের ভয়ে স্বদেশের খেদমত করতে আসবোনা তা কি হয়? আমি সিপাই। মুসিবতের মোকাবেলা করাই আমার ইবাদত।

ঃ কিন্তু দুশমনদের নজর এখন আপনার উপর নিবদ্ধ। আপনাকে খতম করতে

না-পারতক্ ওদের নজর আর দুস্‌রা দিকে যাবে না।

আলী আশরাফ ম্লান হাসি হেসে বললো, দুশমনদের জন্মই দুশমনী করার জন্যে। ওদের যতখানি সাধ্য ওরা তা করবেই। কিন্তু তুমি নিজেই তো সাক্ষী– রাখে আল্লাহ মারে কে?

ঃ কিন্তু আর তো আমি সাক্ষী হতে পারবো না।

ঃ কেন?

ঃ এরপর আপনি তো আর নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন না। আমার ব্যাপারে এতটুকু উৎসাহী হয়ে উঠলেই আমি ফেঁসে যাবো।

আলী আশরাফ গম্ভীর হলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি আগে সৈনিক, পরে প্রেমিক। সৈনিকের কর্তব্য পালনের পথে যে প্রেম বিপত্তি হয়ে দাঁড়ায়, সে প্রেমের প্রশ্রয় আমার কাছে নেই। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি যে, লায়লা আকতার আমার দীলের মধ্যে আছে, যতক্ষণ প্রয়োজন না ফুরাবে ততক্ষণ সে দীলের মধ্যেই ঢাকা থাকবে। বাইরে তার এতটুকু আভাসও কেউ তালাশ করে পাবে না।

লায়লা আকতার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললো, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন। এক চরম দুশ্চিন্তা থেকে আপনি আমাকে বাঁচালেন!

উভয়েই এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলো। আলী আশরাফ বললো, খুব সতর্কভাবে যাবে। মেয়ে মানুষের মুসিবত পদে পদে। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকেও হেফাজত করুন।

বিদায়ের আগে গড়দিয়ারের এ পথ পরিহার করার আর একদফা হুঁশিয়ারী দিয়ে লায়লা আকতার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আলী আশরাফও তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লাগামে টান মারলো।

আলী আশরাফের অনুগামী ফৌজ– অশ্বারোহী ফৌজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আলী আশরাফের বিরতিস্থানে এসে থেমে গেলো। আলী আশরাফ তার ফৌজকে পথ দেখানোর জন্যে প্রায় পোয়া ক্রোশ পর পর একটুকরো নিশানা ফলক ফেলে ফেলে এগুচ্ছিলো। এখানে এসে নিশানা ফলক না পেয়ে তারা হকচকিয়ে গেলো এবং আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে তালাশ করে দেখলো। কোথাও আর নিশানা ফলক না পেয়ে তারা পূর্বস্থানে ফিরে এলো এবং আলী আশরাফের জন্যে সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

লায়লা আকতারকে বিদায় দিয়ে আলী আশরাফ এদের মাঝে ফিরে এলো। এসেই সে জেব থেকে একখানা নক্সা বের করলো। সবার সামনে নক্সাটা মেলে ধরে বললো, ভাইসব আমরা ভুল রাহা ধরেছি। এ রাহা বদল করতে হবে। এবার আমরা ড়ান দিকে ঘুরে তকীগঞ্জ পেরিয়ে হলুদঘর হয়ে গড়দিয়ার যাবো। রাহা এতে আমাদের প্রায় আড়াই

গুণ বেড়ে যাবে। তবু নিরাপত্তার খাতিরেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এর ফলে রসদ যা ঘাট্‌তি পড়বে, তকীগঞ্জেই পূরণ করে নিতে হবে। এখন আর জুদা হওয়ার দরকার নেই। সবাই আমরা এক সাথেই যাবো। আসুন আমার পেছনে।

নক্সা জেবে গুঁজে আলী আশরাফ ঘোড়ায় উঠে বসলো এবং ডান দিকে ঘুরে ভিন্ন রাহায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

* * *

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছত্রছায়ায় রাজা গণেশের খাস কামরায় এক গোপন বৈঠক বসলো। এ বৈঠকে স্বজাতীয় লোক ছাড়া অন্য কেউ রইলো না। সহদেব রায়, দশরথ দেব, ভরত সিং, মৃত্যুঞ্জয়, শ্রীমাধব প্রমুখ পদস্থ হিন্দু উজির-সালারেরা এই বৈঠকে যোগ দিলেন। আলোচনার মাঝখানে সহদেব রায় বললেন, দাদা, সব কাজেই যেভাবে আপনি মুসলমান সালাদের একচেটিয়া ব্যবহার করছেন আর এতে করে এদের সাহস বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাতে শেষ রক্ষা হবে তো?

রাজা গণেশ বললেন, কি রকম?

ঃ সব কাজেই দৌলত খাঁ, মুরাদ বেগ, আরব আলী, বিন-বিল্লাহ, আব্দুল লতিফ--

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ শেষ পর্যন্ত এদের বাগে রাখা যাবে তো? কাজ উদ্ধার করার পর এরা নিজেরাই যদি মসনদ দাবি করে?

ঃ মসনদ অনেক দূরে আছে রায় সাহেব। আবর্জনাগুলো এদের দিয়ে সাফ করিয়ে নেয়াতে ক্ষতি কি? আসল কাজতো করতে হবে আমাদের নিজেদেরই। আমাদের জোয়ানদের সক্রিয় ভূমিকা হবে চরম মুহূর্তে। তারাই মারবে শেষ কোপ। এদের লাপাত্তা করে তারাই এগুবে আগে। এরা থাকবে আমাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল।

শ্রীমাধব খানিকটা অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলো, কবে আসবে সেই সক্রিয় ভূমিকার দিন?

রাজা গণেশ বললেন, সেদিন আদৌ নাও আসতে পারে। মিথিলা, অহোম আর কামরূপের শক্তি যদি পাণ্ডুয়ার বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মসনদে আমাদের হাত দেয়া যাবে না। কায়দা করে মসনদকে হাতের মধ্যে আনতে হবে।

ভারত সিং সংশয়ের সাথে বললো, সেই কায়দার কথাই আরো খোলাসা করে বলুন। সমগ্র কর্মপন্থা কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই আবছা থেকে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলের একটা সুনিশ্চিত ধারণা না থাকলে কাজ কামের সমন্বয় সাধনে জটিলতা দেখা দেবে।

দশরথ দেব বললেন, আজও কর্মপন্থা বা পরিকল্পনা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। পথ তো আমাদের দু'টি আর অত্যন্ত স্পষ্ট। অহোম, কামরূপ আর মিথিলা এই তিন শক্তির ত্রিমুখী আক্রমণে পাণ্ডুয়ার শক্তি পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে মসনদে সরাসরি

হাত দেয়া আমাদের পক্ষে মোটেই কোন কঠিন কাজ হবে না। মুসলমান গাদ্দারদের বড় বড় পদ আর মোটা অর্থের টোপ দিলে ওদের তলোয়ার সুলতানের পক্ষে কোন দিনই উঠবে না। ওদের নাড়ি নক্ষত্র চিনে ফেলেছি আমরা, বরং ওরাই সুলতানী ফৌজের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে, আমরা আমাদের ফৌজ নিয়ে অনায়াসে মসনদ দখল করতে পারবো। এখন সব কিছু নির্ভর করছে এই তিন শক্তির তৎপরতার আর তাদের সাফল্যের উপর। বাইরে থেকে তারা আর ভেতর থেকে আমরা এক সাথে সাঁড়াশি আক্রমণ চালালে পাণ্ডুয়ার মুসলমান হুকুমতের অপমৃত্যু অবধারিত।

শ্রীমাধব বললো, হিন্দু জাতির ভাগ্য উদ্ধারের খাতিরে এই হিন্দু তিন শক্তি তাদের যথাসাধ্য করবে না?

রাজা গণেশ বললেন, তা করার ইচ্ছে তো সব হিন্দু রাজন্যবর্গের অন্তরেই দুর্বার। সবই চান এই যবনদের উচ্ছেদ। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না। এত বড় একটা শক্তির বিরুদ্ধে হাত তোলার আগে অগ্রাশ্চাৎ অনেক কিছুই চিন্তা করতে হয়। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিপদের ঝুঁকি আছে। কৃতকার্য হতে না পারলে তাদের নিজের রাজ্যটাও এই দখলকারী বিজাতীয়দের পায়ের তলেই চলে যাবে। আট ঘাট ঠিক মতো বাঁধার আগে অগ্রসর হতে কেউ সাহস করবে না। যোগাযোগ ঠিক মতোই চলছে। এখন দেখা যাক।

ভরত সিং বললো, বহির্শক্তির তৎপরতায় সফলতা না এলে –

দশরথ দেব বললেন, এই পরোক্ষ নীতিই চলবে। সুলতানকে সরিয়ে আমাদের একজন হাতের লোককে বসাতে হবে মসনদে। আর সেজন্যে শাহজাদা হামজাশাহ তো আছেনই।

ঃ তারপর?

ঃ ঝোপ বুঝে কোপ! সুলতান গিয়াসউদ্দীনের হাত থেকে ক্ষমতা একবার সরিয়ে নিতে পারলেই ওটা আমাদের হাতে আসতে আর অধিক সময় লাগবে না।

শ্রীমাধব বললো, আমাদের তাহলে এখন নীরব ভূমিকা?

রাজা গণেশ বললেন, ঠিক নীরব বললে ভুল হবে। কাজের উদ্যোগটা পুরোপুরি আমাদেরই নিতে হবে। সম্পাদন করবে ঐ বেয়াকুফ গাদ্দারেরা। খুব সতর্কতার সাথে পর্দার আড়াল থেকে করতে হবে সব কাজ। ঐ বেয়াকুফদের বুঝতে দেয়া হবে না যে, তাদের ছাড়া আমাদের কোন স্বার্থ আছে এ কাজে। সুলতানকে বুঝতে দেয়া হবে না যে, এখানে কোন ভূমিকা আছে আমাদের। মাছ আমাদের ধরতে হবে, কিন্তু পানি ছোঁয়া চলবে না।

দশরথদেব বললেন, দাদা, মিথিলা রাজের খবর কিছু জানেন, তবে কামরূপ রাজ কিন্তু আগ্রহটা মন্দ দেখাচ্ছেন না। তাঁর গোপন হামলা তিনি এখনও অব্যাহত রেখেছেন।

রাজা গণেশ বললেন, এটা তাঁর আগ্রহ নয়, দুর্বলতা। তাঁকে আমরা জানিয়েছি. সুলতান তাঁর ফৌজের অর্ধেকটাও কাজের সময় পাবেন না। তিনি এটা বিশ্বাস করতে না পেরে জল নেড়ে জোঁকের পরিমাণ দেখছেন।

ঃ মানে?

ঃ মানে, গোপন হামলা চালিয়ে সুলতানের শক্তি পরীক্ষা করছেন।

শ্রীমাধব অবাক হয়ে বললো, বলেন কি! হামলাকরীরা তাহলে কামরূপ রাজেরই ফৌজ? ভেতরের কোন রাহাজান– লুটের নয়?

ঃ নিশ্চয়ই নয়। এ তরফ থেকে তেমন কোন তৎপরতা না দেখলে তবেই তাঁর সাহস বাড়বে। আর এ কারণেই সুলতানকে আসল খবর জানতে দেয়া হয় নি।

ঃ কিন্তু আলী আশরাফ গেছে যখন, তখন তো আসল খবর বেরিয়ে আসবে।

রাজা গণেশ মুসকি হাসলেন। বললেন, আলী আশরাফই বেরিয়ে আসুক আগে! তারপর দেখা যাবে!

গুপ্ত বৈঠকে বিঘ্ন ঘটলো। উজির মিয়া মোস্তাকের বান্দা এসে রাজা গণেশকে খবর দিলো, খুব এক জরুরী ব্যাপারে উজির সাহেব তাঁর সাথে কথা বলতে চান। তাঁকে না নিয়ে বান্দার ফিরে যাবার হুকুম নেই।

অগত্যা রাজা গণেশকে উঠতে হলো। তিনি যখন উজির মিয়া মোস্তাকের মকানে এসে হাজির হলেন, তখন জৌনপুরের জবরদস্ত সালার আফতাব খাঁ মিয়া মোস্তাকের দহলীজে অস্থায়ী মকান স্থাপন করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ দহলীজের ভেতর বাহির দখল করে নিয়েছেন।

সালার আফতাব খাঁ এখন চাকুরীচ্যুত। তাঁর সীমাহীন দুষ্কর্মের দরুন জৌনপুরের সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বরখাস্ত করেছেন এবং সরকারী বাসস্থান থেকে বহিষ্কৃত করে জৌনপুরের ত্রিসীমানা থেকে বের করে দিয়েছেন। আফতাব খাঁর পুত্র আফজাল এখন পঙ্গু। তার উচ্ছৃখল আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে জৌনপুরের কে বা কারা তার হাত পা ভেংগে চৌরাস্তার উপর ফেলে রেখে যায়। সালার আফতাব খাঁর কন্যা আকলিমা বেগমের জৌনপুর সমাজে খুব বদনাম। তার বেআব্রু আচরণ আর উশৃঙ্খল আদব-আখলাকের দরুন শত চেষ্টা করেও বাড়ন্ত চেহারার এই কন্যাকে আফতাব খাঁ পাত্রস্থ করতে পারেন নি।

জৌনপুর ত্যাগ করে বাংলা মুলুকে ঢুকেই তিনি সপরিবার ফৌজদার আতা খাঁর সীমান্তবর্তী ভ্রাম্যমান আস্তানায় দিন তিনেক থাকেন। ওখানেও এক অঘটন ঘটানোর দরুন আতা খাঁর আতিথেয়তা হারিয়ে তিনি সোজা এই পাণ্ডুয়ায় এসেছেন।

রাজা গণেশ হাজির হলে মিয়া মোস্তাক বললেন, রাজা সাহেব, ইনি বাংলা মুলুকেরই লোক। বড় মুসিবতে পড়ে আজ আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। সুলতানের দরবারে এর জন্যে একটা স্থান করতে না পারলে বালবাচ্চা নিয়ে বেচারাকে পথে বসতে হয়।

রাজা গণেশ বললেন, কি রকম?

আফতাব খাঁ এগিয়ে এসে মোসাহাফাহ করে হাসতে হাসতে বললেন, আমি

জৌনপুরের একজন নামকরা সালার। সুলতান নেহায়েত অবিবেচনা করে আমাকে পদচ্যুত করেছেন।

রাজা গণেশের কপালে ভাঁজ পড়লো। তিনি তা সামলে নিয়ে বললেন, আচ্ছা!

ঃ আপনাদের দরবারের খবরও আমি জানি। সালার দৌলত খাঁ আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি এখন পাণ্ডুয়ায় নেই বলেই আপনাদের কাছে আসতে হলো। আপনাদের দ্বারা আমার কোন উপকার হলে, আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ গোলাম কোন দিনই যাবে না।

মিয়া মোস্তাক বললেন, হ্যাঁ, ইনি দৌলত খাঁর রিস্তেদার। দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এর চাকুরীচ্যুতির খবর পেয়ে দৌলত খাঁ সাহেব এমন একটা সুপারিশ আমার কাছে আগেই করে রেখেছিলেন।

রাজা গণেশ বুঝলেন গাদ্দারের সংখ্যা আর একটা বাড়লো। এ সময়ে এদের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল। তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে কতদূর কি করতে পারবো জানি না। তবে শাহজাদাকে ধরতে পারলে এক কথায় কাজ হতো।

আফতাব খাঁ চিন্তিতভাবে বললেন, শাহজাদা কি আমার কথা শুনবেন?

শাহজাদার কথা শুনে আকলিমা বেগম নড়ে চড়ে বসলো। বললো, চলুন আব্বা, আমরা তাঁর কাছেই যাই। আমাদের পরিচয় পেলে নিশ্চয়ই উনি ব্যবস্থা একটা করে দেবেন।

আফতাব খাঁ বললেন, কিন্তু –

আকলিমা বেগম জোর দিয়ে বললো, চলুন না, আপনি বলতে না পারেন, আমিই তাঁর সাথে কথা বলবো। দেখি, উনি আমাকে ফিরিয়ে দেন কি করে?

আকলিমার কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর প্রতিধ্বনিত হলো। রাজা গণেশ তাজ্জব হয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজরে এই উগ্র লেবাসের মুখরা মেয়েটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, বেনীতে গোঁজা ফুল, চোখ কাজল আর ঠোঁটে আলতার পুরুষ্ট কারুকার্য স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। কোন মুসলমান ঘরে এমন লেবাসের যুবতী কমই দেখেছেন তিনি। বয়োবৃদ্ধ হলেও রাজা গণেশের বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না যে, এ মেয়েটির এত জোরের উৎস কোথায়। তাই তিনিও উৎসাহ দিয়ে আফতাব খাঁকে বললেন, ওটি আপনার বেটি নিশ্চয়ই। ও ঠিকই বলেছে। নিজের তদবীর নিজে করলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। আপনারা আগে তদবীর করে আসুন, আমরাও শাহজাদার কাছে জোর সুপারিশ করবো।

বেটির পীড়াপীড়িতে আফতাব খাঁ তখনই বেটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মিয়া মোস্তাক তাঁর মকানের এক অংশে এদের থাকার ব্যবস্থা করে লটবহরগুলো সেখানে পার করার জন্যে বান্দাদের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাজা গণেশকে এক পাশে ডেকে বললেন, রাজা সাহেব, আমরা গেলেই ভাল হতো। ওরা গিয়ে কি সুবিধে করতে পারবে?

রাজা গণেশ হেসে বললেন, মুরুব্বী, আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে– যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট, তাকে সেই ফুলই দিতে হয়। শাহজাদাকে তো জানেনই। ওরা গিয়ে কাজ না হলে জানবেন, আমরা গিয়ে মাথা ঠুকে পাকা মেঝে ফাটিয়ে দিলেও এ কাজ কখনও হবে না।

রাজা গণেশের সবই জানা। তার কথাই ফললো। পরের দিনই মিয়া মোস্তাক জানলেন, শাহজাদার নেক নজরের বদৌলতে আফতাব খাঁ শুধু সালারের পদ্‌ই পাননি, তিনি বাসস্থানও পেয়েছেন শাহজাদার মহলেরই এক অংশে।

* * *

আলী আশরাফের ফৌজ তকিগঞ্জে পৌঁছতেই সন্ধ্যে হয়ে এলো। ঘাটতি রসদ তকিগঞ্জেই পূরণ করে নিয়ে তারা সে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলো। পরের দিন সবেরে রওনা হয়ে হলুদঘর পেরিয়ে গড়দিয়ারের কাছাকাছি পৌঁছতেই আবার রাত লাগলো। সেখানেই এক বনের মধ্যে অপেক্ষা করার পর পরের দিন আলী আশরাফ মুসাফিরের বেশে গড়দিয়ার মৌজার মধ্যে ঢুকলো। সবার কাছে পরিচয় দিলো, সে একজন মুসাফির। তেজারতির বাজার খুঁজতে সে এখানে এসেছে।

গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে আলী আশরাফ জেনে নিলো, একদিন পর পর কামরূপের দিক থেকে একদল সশস্ত্র সেপাই এই দিকে আসে। আগে তারা এই অঞ্চলেই লুটপাট করতো শুধু। এখন তারা এখান থেকে আরো অনেক ভেতরে যায়। গত পরশু মাধব পুর, ইয়ার গাঁ আর চরখালীতে হামলা চালিয়ে গেছে। আলী আশরাফ এও জানলো, হামলাকারীরা সদলবলে গড়দিয়ারেই আসে। এখান থেকেই দুই তিন দলে ভাগ হয়ে দুই তিন দিকে যায়। আগে তারা রাত্রিকালে আসতো শুধু। এখন তারা সবেরেশাম সব সময়ই আসে।

এসব শুনে আলী আশরাফ প্রশ্ন করলো, তবুও এই গ্রামবাসীরা এই গ্রামে আছে কি করে?

তাদের একজন বললো, আগে বেশ কিছুদিন আমরা গ্রাম থেকে পালিয়ে থেকেছি। কিন্তু কতদিন আর ঘর সংসার ফেলে পালিয়ে থাকা যায়? কাজেই ওদের কাছেই আত্মসমর্পণ করে ওদেরকেই খাজনাপাতি দিয়ে একটা রফা করে নিয়েছি।

ঃ বলেন কি?

ঃ এছাড়া আর উপায় কি? এ এলাকাতো আর পাণ্ডুয়ার সুলতানের অধীনে নেই। এখানে ওরাই এখন রাজা।

অন্য একজন বললো, আপনি মুসাফির মানুষ। এ এলাকায় বেশীক্ষণ থাকবেন না। নতুন কোন লোক দেখলেই সুলতানের চর ভেবে ওরা তখনই তাকে সাবাড় করে দেয়। এ ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। কয়েকজন নির্দোষ মুসাফির এ কারণেই ওদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

এরপর আলী আশরাফ আশ্রয় ভিক্ষে করলে তা তারা সরাসরি অস্বীকার করে

বললো, কোন নতুন লোককে এখানে কেউই আশ্রয় দেবে না। এত সাহস কোন লোকের নেই। আপনি বরং সোজা ভেতরের দিকে যান। ক্রোশ দুয়েক পার না হলে আশ্রয় আপনি পাবেন না।

আলী আশরাফ সীমান্ত বরাবর উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা তাকে সাবধান করে দিয়ে বললো, খবরদার! কোনদিকেই সীমান্তের ধারে কাছে যাবেন না। সীমান্তের গোটা এলাকাটাই এখন ওদের দখলে। সব জায়গাতেই ওরা দলে দলে ঘুরছে।

এরা কারা এ প্রশ্ন করলে গ্রামবাসীরা বললো, আগে আমরা ভেবেছিলাম এরা সবাই এদেশেরই রাহাজান। কিন্তু এখন দেখছি এরা একজনও এদেশের লোক নয়। সবাই এরা বিদেশী লোক। সবাই এরা সিপাই।

আলী আশরাফ প্রশ্ন করলো, এরা কি কামরূপ রাজার সেপাই?

জওয়াবে একজন বললো, তা ছাড়া আর কি? তবে এরা নিজেদের কোন পরিচয়ও দেয় না, নিশান-পতাকাও উড়ায় না। লেনদেনের সময় বুঝতে পারি, কামরূপের লোকেরাই কর নিচ্ছে এখান থেকে।

নানা রকম কায়দা-কৌশল করে আলী আশরাফ এসব তথ্য যোগাড় করলো। তারপর সেই বনের মধ্যে ফিরে এসে ফৌজী লেবাস পরলো। সেপাইদের সশস্ত্র অবস্থায় সব সময় তৈরি থাকতে বলে সে অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে এলো। গড়দিয়ার মৌজার এক প্রান্তে আর একটা গভীর বন ছিলো। অশ্বটাকে সেই বনের মধ্যে বেঁধে রেখে অতি সন্তর্পণে সে বসতির দিকে এগিয়ে গেলো। সেখানে এক ঝোপের মধ্যে ঢুকে গা ঢাকা দিয়ে রইলো। গ্রামবাসীদের বিবরণ মতে হামলাকারীদের আজই আসার কথা। আজ না এলে কাল তারা আসবেই। রাতের বেলা সন্ধান নিতে মোটেই তকলিফ হবে না। ঝামেলাটা দিনেই।

বসে বসে চিন্তা করতেই বিরাট এক হৈ চৈ শুনে আলী আশরাফ সতর্ক হয়ে উঠলো। ঝোপ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো, তিনচার রশি দূরেই প্রায় দেড় দুই শ' সেপাইয়ের একটা দল এসে হাজির হলো। ওখানে ঐ খোলা ময়দানেই তারা তিনজন নেতার অধীনে তিন দলে ভাগ হলো। পঞ্চাশ-ষাটজন সৈন্যের এক এক দল নিয়ে এক একজন দলপতি এক এক দিকে রওনা হলো। আলী আশরাফ লক্ষ্য করে দেখলো, কোন দলেই ঘোড়ার সংখ্যা আট দশটার বেশী নয়। বাদবাকী সকলেই পদাতিক সৈন্য। অস্ত্র তাদের একমাত্র ঢাল-তলোয়ার।

আলী আশরাফের সাথে ছিলো বাছাই করা তিরিশ অশ্বারোহী সৈন্য। ঢাল-তলোয়ার ছাড়াও তাদের ছিলো নেজা-বল্লম ও তীর ধনুক। আলী আশরাফ বুঝলো, দীর্ঘদিন বিনা বাধায় বিচরণ করার ফলে শত্রুপক্ষ অস্ত্র সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আলী আশরাফ মতলব এঁটে নিলো। তিন দল তিন দিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আলী আশরাফ বেরিয়ে তার অশ্বের কাছে এলো এবং অশ্ব নিয়ে একদলের পিছু নিলো। কিছু দূর যাওয়ার পর শত্রুবাহিনী এক খোলা ময়দানে এসে হাঁক দিলো, হুঁশিয়ার!

ধাবমান দলটি তাদের পেছনে অচেনা এক ফৌজী লোক দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে তারাও আওয়াজ দিলো, তবেরে। ধর্ ব্যাটাকে এক্ষুণি।

এবার তারা আলী আশরাফকে পাল্টা ধাওয়া করলো। আগে আগে আলী আশরাফ আর পিছে পিছে দুশমনেরা একটানা ছুটতে লাগলো। যে বনের মধ্যে আলী আশরাফের সিপাই ছিলো আলী আশরাফ সেই দিকেই ছুটতে লাগলো এবং কায়দা করে দুশমনদের সেই দিকেই আনতে লাগলো। অশ্বারোহী আট দশ জন দুশমন আলী আশরাফকে তাড়িয়ে নিয়ে সেই বনের ধারে হাজির হলো। পদাতিক সেপাইরা খানিকটা পিছিয়ে পড়লো। আলী আশরাফের সেপাইরা আগে থেকেই তৈরি ছিলো। অশ্বারোহী দুশমনেরা বনের ধারে এলেই আলী আশরাফের ইঙ্গিতে তারা অলক্ষে থেকে তীর মেরে সব ক'টাকে শুইয়ে দিলো। আহত দলপতি আত্মসমর্পণ করলে আলী আশরাফ তাকে কয়েদ করে বনের মধ্যে নিয়ে গেলো।

দূরবর্তী পদাতিক দুশমনেরা কিছু অনুমান করতে না পেরে তারাও একটানা ছুটে বনের ধারে এলো। ব্যাপারটা তারা আঁচ করে ওঠার আগেই আলী আশরাফের ফৌজ বন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের চারদিকে থেকে ঘিরে ধরলো।

অশ্বারোহী ফৌজ আর তীর-ধনুক-নেজার সামনে পদাতিক দুশমনেরা এক লহমাও টিকে থাকতে পারলো না। এদের সাত-আটজন কয়েদ হলো আর বাদবাকীরা সকলেই তাদের অশ্বারোহী সাথীদের সাথে শেয়াল শকুনের আহার হয়ে সেই বনের ধারে পড়ে রইলো।

কয়েদীদের লেবাস দেখেই আলী আশরাফ অনুমান করে নিয়েছিল এরা কামরূপের সেপাই। কয়েক ঘা চাবুক মারতেই কয়েদীরা আত্মপরিচয় দিলো এবং দলপতি কামরূপ রাজের সমুদয় ইরাদার কথা ব্যক্ত করলো।

আলী আশরাফের উদ্দেশ্য আশার অধিক সফল হলো। তার কাজ ছিলো হামলাকারীদের সনাক্ত করা মাত্র। কারা এই হামলাকারী, সেই তথ্য যোগাড় করা। সে তথ্যের সাথে জীবন্ত প্রমাণ হাতের মধ্যে পেয়ে গেলো।

ফৌজ আর বন্দী নিয়ে আলী আশরাফ সরাসরি পাণ্ডুয়ার পথ ধরলো। এবারও সে সেই সরু রাস্তায় এলো না বা ছত্রায় ফিরে গেলো না। একটানা সফর করে সে পাণ্ডুয়ায় যখন পৌঁছলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ফৌজের হাওলায় বন্দীদের এক নিরাপদ জায়গায় রেখে আলী আশরাফ শাহী মহলে প্রবেশ করলো। মহলের প্রায় মোটামুটি তামাম রক্ষীরাই আলী আশরাফকে চিনতো। তাকে তারা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার ছেড়ে দিতে লাগলো। কিন্তু আলী আশরাফ আটকে গেলো সুলতানের বালাখানার সামনে এসে। বারাখালার বান্দা ইয়াকুত আলীও তাকে চিনতো। সে কুর্নিশ করে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করলো, জনাবের মতলব?

আলী আশরাফ বললো, আমি সুলতানে আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

ঃ কসুর মাফ করবেন জনাব। সুলতানের এখন সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

আলী আশরাফ বিঘ্নিত হয়ে বললো, কেন? রাত তো এখনও এমন কিছু হয়নি! মাগরিবের নামাজ এই একটু আগে শেষ হলো।

ইয়াকুত আলী বললো, সেজন্যে নয় জনাব। সুলতান বাহাদুর এখন কবিতা লিখছেন। তাঁকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।

ঃ বেশ, আমি তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।

ঃ তাতেও কোন ফল হবে না হুজুর। সুলতান আজ সাক্ষাত দিতেই নারাজ।

ঃ তাকে গিয়ে জানাও আলী আশরাফ এসেছে।

ঃ গোস্তাকী মাফ হয়। সুলতানের কড়া হুকুম, পাণ্ডুয়ায় মসনদ বাংলা থেকে বঙ্গোপসাগরে গেলেও তাঁকে তা বলতে গিয়ে বিরক্ত করা যাবে না।

শুনে আলী আশরাফ তাজ্জব বনে গেলো। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এই হুকুমাতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

ইয়াকুত আলী পুনরায় তাজিমের সাথে বললো, আগামীকাল দরবারে আসুন জনাব। এ রাতটা যেভাবে হোক সামলিয়ে নিন আপনারা।

আলী আশরাফ প্রশ্ন করলো, তিনি কোথায় বসে কবিতা লিখছেন, এই বালাখানায়?

ঃ জি না, আঁর খাসকামরায়।

ঃ একাই বসে লিখছেন?

ঃ না, তাঁর কয়েকজন পেয়ারের পরিচারিকা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। তাদের সাথেই বসে বসে আলাপ করছেন আর কবিতা লিখছেন।

ঃ আলাপ!

ঃ মানে রসালাপ।

আলী আশরাফ আকাশ থেকে পড়লো। যদিও বান্দার সাথে এ আলাপ অশোভনীয়, তবু আলী আশরাফ নিজেকে সংযত করতে পারলো না। বললো, আমরা তো এ যাবত জেনে এসেছি জনাবের এসব কসুর নেই। কিন্তু–

ইয়াকুত আলী অপ্রতিভ হলো। সে সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় কামড় খেয়ে বললো, তওবা। কথাটা আমি সে অর্থে বলিনি জনাব। আপনারা তাঁকে যেভাবে জানেন, তিনি ষোল আনাই তাই। দীল তাঁর আয়নার মতো সাফ। এই কয়জন পরিচারিকাকে তিনি মা-বোনের মতো মনে করেন। তিনি এদের এত বেশী পবিত্র বলে মনে করেন যে, তাঁর মউতের পর এরাই তাঁকে আখেরীগোসল করাবেন বলে এক সময় সুলতান বাহাদুর এক ঘোষণাও দিয়ে ছিলেন।

ঃ বলো কি?

ঃ এই পরিচারিকারাও সুলতানকে খুব দরদ করেন। এরাও তাঁর প্রতি খুব মমতাশীল। তাই সাহিত্য কবিতায় বসলেই সুলতান এদের ডেকে নেন। অনেক তত্ত্বকথা তফসীর করে শুনান। এরা সুলতানের কাব্যরসের সমঝদার।

আলী আশরাফের দীলটা তবু হাল্কা হলো। সাক্ষাৎ করার মোটেই কোন সম্ভাবনা নেই দেখে সে নাখোশ দীলে মহল থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাজধানীতে আলী আশরাফের নিজস্ব মকান ছিলো না। বাড়ী একটা বরাদ্দ করা থাকলেও সেখানে সে মকান খুলে বসেনি। রাত্রি যাপনের ইরাদায় সে দলবল নিয়ে সালার জহিরুদ্দীনের মকানে এসে হাজির হলো।

জহিরুদ্দীনও তাকে পেয়ে খুব খুশী হলো এবং তাকে উষ্ণ দীলে অভ্যর্থনা জানালো। তার কামিয়াবীর খবর শুনে জহিরুদ্দীন আত্মহারা হয়ে গেলো। আলী আশরাফের পিঠে একটা থাবা মেরে বললো, সাব্বাস দোস্ত। পাণ্ডুয়ার মসনদ আর একেবারেই এতিম নয়। তাকে হেফাজত করার জন্যে কয়েকটা শক্ত বাজুও আছে।

আলী আশরাফ আফসোস করে বললো, মালিক যদি নিজের মসনদ নিজে হেফাজত না করেন, বাইরে থেকে আমরা তার কতটুকু হেফাজত নিশ্চিত করতে পারি?

জহিরুদ্দীন প্রশ্ন করলো, আপনার এ কথার অর্থ?

আলী আশরাফ বললো, কামরূপ রাজ্যের সংলগ্ন আমাদের প্রায় গোটা সীমান্ত এলাকাটাই কামরূপ রাজ দখল করে নিয়েছে। প্রজাদের নিকট থেকে জুলুম করে খাজনা আদায় করছে। এমন এক গাদা বেঈমান আমীর-উমরাহের তোষামোদে সুলতান বেহুঁশ হয়ে আছেন, যারা তাঁকে এত বড় এক মারাত্মক ব্যাপারেও মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে সীমান্তের অবস্থা নিয়ে আমি গেলাম সুলতানের সাথে জরুরী আলাপ করতে, কিন্তু কবিতা লিখছেন বলে তামাম সাক্ষাৎ দর্শন বন্ধ করে তিনি দরজা এঁটে দিয়েছেন। আমি সাক্ষাৎ করতেই পারলাম না।

জহিরুদ্দীন মুসকি হেসে বললো, দোস্ত, কবিতা এমনি এক জিনিস সে যখন কাউকে পায়, তখন তাকে সে একাই আগলে রাখতে চায়। অন্যের কোন পাত্তাই থাকে না সেখানে। এটুকু আমাদের সহ্য করা উচিত।

ঃ মানে?

ঃ আমাদের আফসোস করা দিক ঠিক এটা নয়, সেটা অন্য।

ঃ কি রকম?

ঃ সুলতানের এও এক অদ্বিতীয় গুণ। কবিতা লিখার ব্যাপারেও তিনি অনন্য মেধার পরিচয় দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। তাঁর কবিতা ইতিমধ্যেই নানা মুলুকে সমাদৃত হয়েছে। ইরানের স্বনামধন্য শায়ের কবি হাফিজ ও তাঁর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে খত পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বাংলা মুলুকে আসার জন্যে সুলতানের দাওয়াত কবুল করেছেন। এত বড় কৃতিত্ব কয়জন রাজা বাদশাহ্ এ যাবত অর্জন করতে পেরেছেন?

ঃ কিন্তু আমাদের সুলতান তো কবি নন, তিনি সুলতান।

ঃ তিনি সুলতানও, কবিও। এ গুণ সব সুলতানের থাকে না।

ঃ আপনার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। সুলতানকে কবিতা লিখলে চলবে কেন?

ঃ এই ভুলই আমরা অনেকে করে থাকি হামেশাই। কারো কোন বাড়তি গুণ দোষের হতে পারে না। সুলতান হলেই কবিতা লেখা যাবে না, এ কথার কোন যুক্তি নেই। অন্য কোন সুলতানের এ হিম্মত প্রায়ই থাকে না বলেই আমরা এটাকে দোষের বলে মনে করি। সুলতান হয়ে বাইজী নিয়ে মওজ করা যায় যদি, শরাবের পেয়ালার তলে দিনের পর দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা যায় যদি, আর তা থেকেও সুলতানী করা যায় যদি, তাহলে কবিতা লেখা যাবে না কেন? কবিতা লেখা কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ?

ঃ তা অবশ্যি ঠিক। কিন্তু –

ঃ দোস্ত, শুনেছি, আপনি বহুৎ বহুৎ এলেম হাসিল করেছেন। এত বড় কেতাবী লোক হয়ে আপনি এত বড় সৈনিক হলেন কি করে? আসলে সকলেরই বাড়তি গুণ সবসময়ই প্রশংসার। তবে এই পান্ডুয়ার সালতানাতের একটা মস্ত বড় খোশ কিসমতি যে, এমন একজন দানেশমান্দ আর দরাজদীল মানুষকে সুলতান হিসাবে পেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কি ইচ্ছে তা জানিনে। সেই সাথে এই সালতানতের নিদারুণ বদনসীব যে, তিল পরিমাণ দূরদর্শিতা এই লোকটির মধ্যে নেই। এত গুণের সাথে একটু দূরদর্শিতা থাকতো যদি!

ঃ সেই কথা তো আমারও। আর যাই তিনি করুন, নিজের আখেরটা যে ক্রমেই আঁধারে দিকে গড়াচ্ছে একদিনও তা দেখতে চাইবেন না তিনি?

ঃ আমাদের আফসোসের দিক এটাই, আর এটাই আমাদের মস্ত বড় বদনসীব। তা যাক, আগে আসুন। দীর্ঘ পথ সফর করে আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আছেন। বিশ্রাম করবেন, আসুন।

সাত

শুরুতেই দরবারটা গরম হয়ে উঠলো। কিল্লাদার কানাইলালের গালে কড়া একটা চড় মেরেছে ফৌজদার আতা খাঁ। এর ব্যথায় কানাই লালের স্বজাতীয় শুভাকাঙক্ষীরা যতখানি তড়পাচ্ছিলেন, তার চেয়ে দশ গুণ অধিক পরিমাণ তড়পাচ্ছিলেন কানাইলালের বিজাতীয় বান্ধবেরা। সবচেয়ে অধিক ব্যথায় ব্যথিত ছিলেন শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা শাহ। তিনি আতা খাঁর ফাঁসি চান।

শাহজাদা হামজা শাহর আক্রোশ আর আফসোসের উৎস দুইটি। আফতার খাঁ তনয়া আকলিমা ঘটিত ব্যাপার এর একটি। আতা খাঁ একজন সুডৌল চেহারার সুনদর্শন নওজোয়ান। চাকরীচ্যুত হয়ে বাংলা মুলুকে এসে আতা খাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে আফতাব

খাঁর পরিবারের। সীমান্ত এলাকার হেফাজতি পরিদর্শন করার নিমিত্তে আতা খাঁ তখন এদিককার এক অস্থায়ী আস্তানায় বসবাস করছিলেন। একজন উঁচু তব্‌কার মানুষ চাকরিচ্যুত হয়ে অকস্মাৎ মুসিবতে পতিত হয়েছেন জেনে আতা খাঁ ঐ অস্থায়ী আবাসেই তাদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে পথের শ্রান্তি উপশম করে। তাদের একটা হিল্লে করার জন্যে সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করবে বলেও আশ্বাস দেয়। দুই তিন দিন ওখানে আফতাব খাঁ সপরিবারে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেন। আতা খাঁকে ঘিরে তিনি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করছিলেন তা আফতাব খাঁই জানেন, কিন্তু তাঁর কন্যা আকলিমা বেগম পিতার চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ফলে তৃতীয় রাত্রে কোন এক অজ্ঞাত কারণে আতা খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে আকলিমাকে যৎপরনাস্তি অপমানিত করে এবং পরের দিন সকালেই আফতাব খাঁকে সপরিবারে তার আস্তানা থেকে বের করে দেয়।

এই অপমানের জ্বালা আফতাব খাঁর চেয়ে আকলিমার দিলেই অধিক তীব্রভাবে বিঁধেছিলো। শাহজাদার নেকনজর পাওয়ার পরই সে মওকা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। মওকাটাও আচানকভাবে পেয়ে যাওয়ায় প্রেম মদিরা ঢেলে সে আগে শাহজাদাকে ছাগলের বাচ্চা বানালো। এরপর দিলো কর্ণমন্ত্র ঃ এই আতা খাঁ একজন হাড়ে হাড়ে খন্নাস আদমী। তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সে তাকে বেহুরমতি করার ইরাদায় তার উপর কয়েকবার হামলা চালায়। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার বলে আকলিমা তার ইয্‌যত হেফাজত করে কোন মতে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে। আতা খাঁ বেঁচে থাকলে তার ইয্‌যত নিরাপদ নয়। এমন লোকের পক্ষে কাউকে শুধু চড় মারা কেন, খুন করাও আদৌ বিচিত্র নয়। এসব লোকের ফাঁসি হওয়া উচিত।

অন্যটি রাজনৈতিক। খানিক পরেই হাজির হলেন রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাক। তারা শাহজাদাকে সমঝালেন, এরাই তাঁর আখেরাতের একমাত্র কাঁটা। এদের একে একে সরিয়ে দিতে না পারলে সুলতানকে যাদু করে এরাই পাণ্ডুয়ার মসনদ বিপন্ন করবে এবং শাহজাদার জানেরও নিরাপত্তা বলে কোন কিছুই থাকবে না।

ব্যাস্! শাহজাদা টপকে গেলেন। আতা খাঁর প্রাণদণ্ড নিশ্চিত করার ওয়াদা করে তিনি দরবারে এসে বসলেন।

পাণ্ডুয়ার মসনদ নিয়ে পাণ্ডুয়ার গাদ্দারদের মধ্যে কয়েকবার বানরের পিঠা ভাগ হয়েছে। ভাগ করেছেন রাজা গণেশ। গত রাতে রাজা গণেশ সে পিঠা ভাগ চূড়ান্ত করে ফেললেন। মসনদটা প্রবীণ উজির মিয়া মোস্তাকেরই হক। তিনি জিন্দেগীভর এই মসনদের খেদমতে আরাম-আয়েশ হারাম করে এসেছেন। রাজা গণেশ একজন আচারনিষ্ঠ মানুষ। মসনদের ঝুট-ঝামেলা তাঁর বিলকুল না-পছন্দ। উজিরে আলার পদটা পেলেই তিনি সবার গোলাম হয়ে খেদমত করবেন। দৌলত খাঁ সাহেব হবেন পাণ্ডুয়ার সিপাহসালার আর অন্যান্য সেনা-সৈন্য আমীর উমরাহ পাবেন আশাতীত পদোন্নতি এবং অপরিমিত আর্থিক সুবিধে।

পরিকল্পনাও পরিষ্কার। রাজা গণেশই এর প্রণেতা। এই সুলতানকে সরিয়ে সরাসরি মসনদে যাওয়া বিপজ্জনক।

গণমনেও নিদারুণ বিক্ষোভ দেখা দেবে এতে। তার চেয়ে এই অপদার্থ শাহজাদাকে সামনে এনে গণমনে কয়েকদিন প্রলেপ দেয়ার পর তাকেও সরিয়ে দিলে এই ভাগ বাটোয়ারার কাজ হবে একান্তাই নিরাপদ। অতএব, কাজ চলবে সেইভাবেই।

তালিকাপ্রাপ্ত সকলেই আগে থেকেই তৈরি ছিল। তালিমপ্রাপ্ত কানাইলাল ফরিয়াদ পেশ করতেই দরবারটা শুরুতেই গরম হয়ে উঠলো।

ফরিয়াদ শুনে মিয়া মোস্তাক দরাজ কণ্ঠে বললেন, জাঁহাপনা, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে আমরা সবাই এই সালতানাতের খেদমত খাশ দীলে করে আসছি। কেউ কাউকে কখনও জুদা করে দেখিনি। একজন মুসলমান ফৌজদার যদি একজন হিন্দু কিল্লাদারের গায়ে হাত তোলে, তাহলে কি এই প্রশ্নই সবার দীলে জাগে না যে, মুসলমানেরাই এই হুকুমাতের খাস লোক, হিন্দু এবং অন্য সকল ধর্মের লোকেরা এখানে জিম্মি?

দৌলত খাঁ বললেন, আর সেক্ষেত্রে আমার ভিন্নধর্মী ভাইদের দীলে যদি এই হুকুমাতের প্রতি অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় আর তার ফলে এই হুকুমাতের খেদমতে জান কোরবান করতে ইতস্তত করে, সেটা কি তাদের পক্ষে খুব বড় একটা দোষের কিছু হবে জনাব?

রাজা গণেশ বললেন, আলমপনা! এই হুকুমাতের একান্ত হিতাকাঙক্ষী সালার দৌলত খাঁ সাহেব যা বললেন, তা অত্যন্ত যুক্তির কথা। তবে এক্ষেত্রে হুজুরকে আমি এই আশ্বাসই দিতে চাই যে, এর চেয়ে চরমতম দুর্ঘটনা ঘটলেও এই দীল পেয়ারা হুকুমাতের খেদমতে আমাদের কারো এক বিন্দু গাফিলতি থাকবে না। এই সালতানাতের খেদমতে আমরা যেমন, হরওয়াক্ত জান বাজি রেখেছি, তেমনি আমরা জান বাজি রেখেই এই সালতানাতকে হেফাজত করে যাবো। আমার শুধু বক্তব্যটা এই যে, অপরাধের বিচারের জন্যে দেশে একটা কানুন আছে, সে বিচারের জন্যে খোদ সুলতান বাহাদুর আছেন। সুলতান বাহাদুরকে ও দেশের কানুনকে লাপাত্তা করে বিচার কেউ নিজের হাতে তুলে নেবে– এটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সবার কথা নিবিষ্টচিত্তে শুনলেন। তারপর তিনি বললেন, ফরিয়াদীর ফরিয়াদ আর সেই ফরিয়াদের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ তফসীরগুলো শোনা গেলো। এবার বিবাদীর বক্তব্য কি?

শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা শাহ অস্থির কণ্ঠে বললেন, এখানে বিবাদীর বক্তব্যের ফুরসুত তো দেখিনে। দেশের কানুন সে হাতে তুলে নিয়েছে। ব্যাস্, শুধু এই অপরাধের জন্যে তার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

পুত্রের দিকে সুলতান নাখোশ নজরে তাকালেন। পুত্রের কথায় আমল না দিয়ে তিনি আতা খাঁকে বললেন, ফৌজদার আতা খাঁর বক্তব্য আছে কিছু?

শাহজাদা এবার ক্রোধে ফেটে পড়লেন। উত্তেজিত হয়ে বলরেন, অপরাধ যেখানে যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে, যে অপরাধে সাক্ষী-সাফাইয়ের আদৌ কোন প্রশ্ন নেই, সেখানে এই পক্ষপাতিত্ব অসহ্য!

সুলতানও গোস্বা হলেন। বললেন, শাহজাদা কি বলতে চান?

ঃ আমি বলতে চাই, সুলতানের দরবারে এ ধরনের বিচার কখনও কাম্য নয়। এ বিচার অন্যায় বিচার।

সুলতানও ফেটে পড়লেন। হুংকার দিয়ে বললেন, খামোশ! অপরাধ যত অমার্জনীয়ই হোক, আসামীকে নিজ পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া কানুনেরই প্রথম ও চূড়ান্ত বিধান।

ঃ তার অর্থ?

ঃ অর্থ, বিচার ন্যায় হলো না অন্যায় হলো তা দেখার মালিক আমি, তুমি নও।

গোস্বায় ফুলতে ফুলতে শাহজাদা বললেন, আমি নই?

ঃ না। তুমি সেটা দেখতে আসবে তখন, যখন সুলতান হবে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে বিচার শেখাতে এসো না।

শাহজাদা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহলে এই দরবারে আমার থাকার আর প্রয়োজন কি?

ঃ প্রয়োজন মনে না করো, যেতে পারো। দরবারে তোমাকে ডাকা হয় সুলতানগিরি শেখার জন্যে, শেখানোর জন্যে নয়।

রাজা গণেশ ব্যস্ত হয়ে বললেন, হুজুর!

সুলতান হাত তুলে বললেন, থামুন।

শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা শাহ দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোটা দরবারটাই থম থম করতে লাগলো।

সুলতানও কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। নিজেকে সংযত করে নিতে তাঁর সময় লাগলো। এরপর তিনি বললেন, বিবাদীর বক্তব্য কি?

আতা খাঁ তাজিমের সাথে বললো, জনাব, আমি একজন নগণ্য ফৌজদার। জনাবের অশেষ মেহেরবাণীর কারণে এদিককার সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকির দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত আছে। ফৌজ নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে করতে মিথিলারাজ্য সংলগ্ন আমাদের সীমান্তে এসে হাজির হই। সেখানে দেখি, কিল্লাদার কানাইলালের কিল্লা থেকে পোয়া ক্রোশেরও কম দূরে আমাদের লালমাটি আর তালগাছি এই দুইটি মৌজা দাউ দাউ করে জ্বলছে। গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে এলোপাতাড়ি ছুটছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালো, কয়দিন আগে মিথিলার গুপ্তচরকে ধরে তারা প্রহার করে। সেই রাগে মিথিলার ফৌজ এসে তাদের গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বহুলোকের আর্তনাদ আর হৈ হুল্লোর সত্ত্বেও আমাদের কিল্লা থেকে কোন লোক তাদের উদ্ধারে আসেনি। কিল্লাতে লোক পাঠাও নি কেন– এ কথা বললে তারা জওয়াব দিলো যে, কিল্লাতে তখন আমাদের ফৌজের সাথে মিথিলার ফৌজ এক সাথে

ফুর্তি মৌজ করছিল, সংবাদ দিতে যে গিয়েছিলো তাকে তারা ধরে বেদম প্রহার করে তৎক্ষণাৎ কিল্লা থেকে বের করে দিয়েছে।

আতা খাঁ থামলে সুলতান বললেন, তারপর?

আতা খাঁ ফের বললো, আমি এতটা বিশ্বাস করতে পরিনি। আমার ফৌজকে আমার পেছনে আসতে বলে আমি আগেই কিল্লাতে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, কথা তাদের এক বর্ণও মিথ্যা নয়। মিথিলার ফৌজ নিয়ে কেল্লার ফৌজ বাইরে বসে আর মিথলার সেনাপতি বীরবাহুকে নিয়ে কিল্লাদার কানাইলাল পাশেরই এক কক্ষে বসে পানপাত্র হাতে নিয়ে মওজের সাথে সমানে হাসি-ঠাট্টা করছেন।

আমার খবর পেয়ে ওরা দুইজনই বাইরে এলো এবং আমাকে একা দেখে অবিশ্বাস্যভাবে ওরা আমার উপর হামলা চালালো। আমার দীলে কখনও এ কল্পনা আসেনি, আমাদের কিল্লাদার আমার উপরই হামলা চালাবে। কিল্লার সভাপতি ওদের পক্ষের ফৌজ। অগত্যা আত্মরক্ষা করতে করতে আমি কিল্লার বাইরে চলে এলাম। সেপাইদের তলব দিয়ে এবার তারা সদলবলে ধাওয়া করলো আমাকে। কিন্তু আমার ফৌজ ইতিমধ্যেই কিল্লার কাছে এসে গেছে। তাদের পরিমাণ দেখেই বীরবাহু তার ফৌজ নিয়ে মিথিলায় পালিয়ে গেলো। কানাইলালও পালানোর কোশেশ করলো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরে তাকে কয়েদ করলাম। এ সবের হেতু কি জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করেও আসল কথা পেলাম না। কয়েদীকে তখন চাবুক মারার জরুরত দেখা দিলো। কাছে কোন চাবুক না থাকায় আমি তাকে চড় মেরেছি জনাব।

আতা খাঁ নীরব হলো। সুলতান তাঁর বক্তব্য শুনে বিস্মিত নজরে গোটা দরবারের দিকে চেয়ে রইলেন। বিরোধী পক্ষ উমরাহরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এটাকে তাঁরা নিছক একটা আষাঢ়ে গল্প বলে এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। তাঁরা যুক্তি খাড়া করলেন যে, ফরিয়াদীকে কয়েদ করার যে প্রসঙ্গ আতা খাঁ সাহেব এনেছেন তার কোন ভিত্ই নেই। আতা খাঁ সাহেব নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছেন। কারণ ফরিয়াদী কয়েদ হয়ে আতা খাঁ সাহেবের কয়েদ খানায় নেই, হুজুরের সামনে ফরিয়াদ নিয়ে দণ্ডায়মান। উনি তাহলে কয়েদ করলেন কাকে?

সুলতান এ যুক্তি পছন্দ করলেন এবং আতা খাঁকে জবাবদিহি করতে বললেন।

আতা খাঁ তখন লা-জওয়াব। সে তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলো, কয়েদীসহ রাজধানীতে প্রবেশ করতেই যে মিয়া মোস্তাকের নির্দেশে কানাইলালকে সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, সেই প্রবীণ উজির মিয়া মোস্তাকও এই প্রশ্ন তুলেছেন।

সুলতানের তাকিদে আতা খাঁ মিয়া মোস্তাকের নির্দেশের কথা তুলে ধরলো। কিন্তু মিয়া মোস্তাক সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে এ কথা অস্বীকার করে বসলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আবার পাল্টা ফরিয়াদ এনে বললেন যে, আসামীর মতলব সাধু নয়। নিজের অপরাধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় উনি দিশেহারা হয়ে একটানা মিথ্যা কথা বলছেন এবং মানী লোকদের মান সম্মানে হাত দিয়ে আর এক অপরাধ সংঘটিত করছেন।

মিয়া মোস্তাক সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন পেয়ে গেলেন। তাঁর সমর্থনে দরবারে আফসোসের তুফান উঠলো। এসব দেখে সুলতান খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি এবার আসামীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ফরিয়াদির উপর স্থাপন করলেন বললেন, আসামীর বক্তব্য সবই শুনলেন। বলুন, তাঁর কথা সত্যি না মিথ্যে?

জবাবে কানাইলাল বললো – মিথ্যা হুজুর

ঃ বিলকুল?

ঃ জি হুজুর, বিলকুল।

ঃ লালমাটি আর তাল গাছিমৌজা জ্বলেনি?

ঃ এক বিন্দুও জ্বলেনি।

ঃ এর আশে পাশের?

ঃ আশেপাশেরও কোন মৌজা জ্বলেনি জনাব।

ঃ সাচ্?

ঃ বিলকুল সাচ্। এ ছাড়া আমি চিন্তা করে পাইনে, আমার কিল্লার পাশের মৌজাই যদি দুশমন এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে, তাহলে আর কোন কাজে আছি আমি ওখানে? এই সালতানাতের নেমকের কোন দামই নেই আমার কাছে?

এরপর আর স্বভাবতই বলার কিছু থাকে না। শির উঁচু করে সুলতান এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আতা খাঁর মুখের উপর স্থির করলেন। সকলেই বুঝতে পারলো আতা খাঁর উপর এখন এক বদ হুকুম হতে যাচ্ছে।

এমন সময় এক আচানক কাণ্ড ঘটে গেলো। দরবারের দ্বাররক্ষী হন্তদন্ত হয়ে দরবারে প্রবেশ করলো এবং সুলতানকে কুর্নিশ করে বললো, হুজুর, আমাদের লালমাটি আর তালগাছি মৌজার প্রায় দুই শ' লোক হুজুরের দর্শনপ্রার্থী। এই দুইটি গ্রামই নাকি মিথিলার সেপাই এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। মিথিলার সেপাইরা নাকি আমাদের কিল্লাতে বসেই এ কাণ্ড করে গেছে। আমাদের কিল্লাদার নাকি সব জেনেও তাদের উদ্ধারে যায় নি। স্ত্রী পুত্রদের গাছতলায় রেখে সারারাত হেঁটে তারা হুজুরের কাছে এসেছে।

সুলতান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! বললেন, কোথায় তারা?

দ্বাররক্ষী বললো, ফটকের বাইরে। তারা সেখানে হৈ চৈ শুরু করেছে। ফটক ভেঙ্গে তারা হুজুরের কাছে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে আর এক রক্ষী ছুটে এলো। বললো, হুজুর লালমাটি আর তালগাছি মৌজার লোকদের কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বালবাচ্চা নিয়ে তারা নাকি সেই থেকেই ভুখা আছে। হুজুরের সাক্ষাৎ না পেলে–

হাত তুলে সুলতান তাকে থামিয়ে দিলেন। বাইরের কোলাহলের কিঞ্চিৎ রেশ দরবারেও ভেসে এলো। সুলতান তাদের ধীর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, খাজাঞ্চিকে

বালো, ওদের খাবার আর ক্ষতিপূরণের জন্যে এক্ষুনি প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে। নিজে আমি ওদের গ্রামে আসছি।

রক্ষীরা বেরিয়ে গেলো, সুলতানের মুখ ইতিমধ্যেই পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে।

প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপট ঘুরে গেলো কানাইলালের দুই পা থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তার সমর্থক গোষ্ঠী দুই চোখে আঁধার দেখতে লাগলো। পরিস্থিতি আঁচ করে রাজা গণেশ তৎক্ষণাৎ চাল বদল করলেন। কুর্নিশ করতে করতে অত্যন্ত তাজিমের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর। এরপর আর সন্দেহের তিল পরিমাণ অবকাশ নেই। ফৌজদার আতা খাঁ সাহেব সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর বিরুদ্ধে সমুদয় অভিযোগ নাকচ করার জন্যে আমি দরবারে করজোড়ে আরজ পেশ করছি।

রাজা গণেশ দুই হাত জোর করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আর কানাইলাল?

রাজা গণেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ওটা একটা গিদ্দর। একটা সুরামত্ত লম্পট। ওকে পদচ্যুত করে জিন্দান খানায় প্রেরণ করা হোক।

সুলতান কিছুটা নরম হলেন। ফের তিনি সওয়াল করলেন, রাজা সাহেব বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন ও আপনার স্বজাতি।

ঃ স্বজাতির মুখে যে চুন কালি মেখে দেয় এমন স্বজাতির জন্যে আমার দীলে দরদের লেশমাত্র নেই জনাব। আমার কাছে মুনিব আগে, মুনিবের হুকুমাতের স্বার্থ আগে। কোন গোত্রীয় স্বার্থ নয়।

সুলতানের দীলের দৃঢ়তা উবে গেরো। রাজা গণেশের এ কথায় তিনি পানির মতো গলে গেলেন। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে প্রসন্ন দীলে বললেন, রাজা গণেশের এ দৃষ্টিভঙ্গি তারিফ পাওয়ার যোগ্য। তাঁরই সম্মানে কানাইলালের প্রতি কোন কঠিন আদেশ দিলাম না। তাকে কিল্লাদারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে শাহী সামানের হেফাজতদার হিসাবে নিয়োগ করা হলো।

দরবার আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মিয়া মোস্তাকও মুখ খুললেন। সাফাই গেয়ে বললেন, কয়েদীকে আজাদ করার নির্দেশ তিনি কখনো দেননি। তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ হয়তো বেঈমানী করে থাকবে। ব্যাপারটা তিনি তদন্ত করে দেখবেন।

নিছক একটা অভিনয়ের এই বিপুল সাফল্য দেখে উজির আজম খাঁ প্রমুখ কয়েকজন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। দুঃখে ও অভিমানে ফৌজদার আতা খাঁ সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

আলী আশরাফ যখন দরবারে প্রবেশ করলো তখন দরবারটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। সুলতান আলী আশরাফের কথা ইতিমধ্যেই তুলেছিলেন। জওয়াবে মিয়া মোস্তাক

আফসোস করে বলেছিলেন, কাজটা তো কঠিন কাজ জনাব। যে কাজে সে গেছে, দিমাগ ঠান্ডা করে না চললে হর কদম চরম দুর্ঘটনার আশংকা । আলী আশরাফ জেদী ছেলে। সে জান নিয়ে ওখান থেকে ওয়াপস্ আসতে পারে কিনা, এ চিন্তায় আমি বড় পেরেশানীতে আছি।

কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবু আলী আশরাফ ফিরে আসছে না দেখে দরবার কক্ষে তখন অনুচ্চস্বরে নানা রকম কানা-ঘুষা চলছে। এরই মাঝে প্রবেশ করলো আলী আশরাফ। তাকে দেখে সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। খোশ আমদেদ জানিয়ে তিনি বললেন, এসো, এসো। তোমার চিন্তায় আমরা বড় পেরেশানীতে আছি। ওদিকের খবর কি বলো?

আলী আশরাফকে জীবন্ত ফিরতে দেখে দরবারটা হঠাৎ প্রাণহীন হয়ে পড়লো। মিয়া মোস্তাক আর রাজা গণেশ গোপনে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চকিতে তামাম কিছু লক্ষ্য করে আলী আশরাফ বললো, জনাবের আন্দাজই ঠিক। ওরা কামরূপ রাজারই ফৌজ।

সুলতান উৎসাহিত হয়ে বললেন, বটে! তুমি সত্যিই এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ?

ঃ আমি সন্দেহ অনুমানের উর্ধ্বে থেকেই বলছি জনাব। কামরূপরাজের ফৌজ আমাদের গোটা সীমান্ত এলাকা দখল করে নিয়েছে। ও এলাকার কর এখন তারাই আদায় করছে

সুলতানের দুইচোখে রক্ত উঠে এলো। তিনি বললেন, কতদিনের ব্যাপার এটা?

ঃ হামলা চলছে প্রায় পাঁচ ছয় মাস ধরে। কর আদায় শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে থেকে।

ঃ এত বড় একটা খবর আমার তামাম ফৌজের কেউ সংগ্রহ করতে পারলো না?

ঃ সীমান্তের যে কোন জায়গায় হাজির হয়ে গ্রামবাসীদের সওয়াল করলে এ খবর সংগ্রহ করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। আমার বিশ্বাস একজন আদনা আদমীও পারে তা। কাজেই কেন যে কেউ পারলেন না, এর জওয়াব আমার দেয়া সম্ভব নয়।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তবে আমি গিয়েছিলাম গড়দিয়ার এলাকায়। সেখানে আমি যা জেনেছি, তাতে পান্ডুয়া হুকুমাতের কোন লোকই এ যাবত গড়দিয়ার বা তার আশেপাশে কখনও তসরীফ আনেন নি। আর সেজন্যে আমাদের অনুগত প্রজাদের দীলে আফসোসের ধ্বনি তীব্র হয়ে উঠেছে।

সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের দুর্বলতা দুস্‌রা দফা উলঙ্গ করার খায়েশ মিয়া মোস্তাকদের ছিলো না। ফরে আলী আশরাফের বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ কোনদিক থেকেই এলো না। এসব দরবারীরা চুপ চাপ নত মস্তকে বসে রইলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার জানার মধ্যে গলতি যদি না থাকে,

তাহলে আর আমাদের হাত পা গুটিয়ে আয়েশ করার ফুরসৎ নেই। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব অচিরেই আমাদের দিতে হয়?

সুলতানের দীল এখনও সত্য মিথ্যার আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে দেখে আলী আশরাফ বললো, সন্দেহের কোন ফুরসৎ এখানে নেই জনাব। কামরূপের কয়েকজন সেপাইকে কয়েদ করে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। হুজুরের আদেশের এন্তেজারে তারা এখন দরবারের বাইরে দন্ডায়মান।

আলী আশরাফের এতটা সাফল্য সুলতান কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি বিহ্বল কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, আলী আশরাফ!

ঃ হুজুরের মর্জি মাফিক তাদের সওয়াল করলে কামরূপ রাজার বদনিয়াতের তামাম হদিস্ এক্ষুণি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঃ সাব্বাস!

সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের দরবারে আনা হলো। তাদের সওয়াল করে কামরূপ রাজের ইরাদা সম্পর্কে সুলতান নিঃসন্দেহ হলেন। কয়েদীদের কয়েদখানায় প্রেরণ করার হুকুম দিয়ে তিনি সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের এখন বুঝতে নিশ্চয়ই কোন তকলিফ পেতে হচ্ছে না যে, আমার আন্দাজই ঠিক। বৃহৎ উদ্যোগের আগে ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিয়ে কামরূপ রাজ আমার তাকদ পরীক্ষা করছে। তার এই বদনিয়াতের উচিত জওয়াব দিতে চাই। আপনারা লড়াইয়ের আনযাম করুন।

ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উপস্থিত সালারেরা এক সাথে জওয়াব দিলেন, আমরা তৈয়ার জনাব। এ লড়াইয়ের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা হচ্ছে, শুধু এইটুকু আমাদের জানিয়ে দিন।

প্রত্যুত্তরে সুলতান বললেন, কার উপর এ দায়িত্ব দিলে আপনারা খুশী হন?

কয়েকজন তরুণ সালার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যে কৃতিত্ব আলী আশরাফ সাহেব দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর উপর এ দায়িত্ব দিলেই কামিয়াবীর সম্ভাবনা অধিক জনাব। তাকেই আমরা চাই।

যে কোন দৃঢ় চিত্তের সুলতান হলে এই প্রস্তাবই তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে সবার মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ অধিক ভাল মানুষী দেখাতে গিয়ে এর জের টেনেই চললেন। বললেন, আমার উজির সাহেবদের এ ব্যাপারে মন্তব্য কি?

উজির আজম খাঁ সাহেব অত্যন্ত দানাদার মানুষ। ফালতু কথা কম বলেন। ষড়যন্ত্র, হীনমন্যতা এসব তাঁর না-পছন্দ। কিন্তু তিনি দেখলেন সুলতানের যে দুর্বল মানসিকতা তাতে কথা না বললে এমন একটা সঠিক সিদ্ধান্তও বানচাল হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কামিয়াবীর দরওয়াজা যে একবার উন্মুক্ত করতে পেরেছে,

তাকেই সেই দরওয়াজা বরাবর এগিয়ে যাবার এযাযত দেয়া হোক জনাব। কর্তব্য পালনে যে দৃঢ়তা তার মধ্যে বরাবর লক্ষ্য করে আসছি, তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, সাল্‌তানাতের ইজ্জত অক্ষুণ্ন রেখে আলী আশরাফ এবারও ওয়াপস্ আসতে পারবে।

স্বভাবজাত চরিত্র বশে সুলতান এখানেও থামলেন না। রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাককে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের কি এতে কিছু বলার আছে?

মিয়া মোস্তাক আর রাজা গণেশ পাশাপাশি বসেছিলেন। রাজা গণেশ এই মওকার সদ্ব্যবহার করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! হাওয়া যখন একদিকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তার বিরোধিতা করাটা দৃষ্টিকটুও বটে, অপ্রিয়ও বটে। তবু সাল্‌তানাতের সার্বিক কল্যাণে হক কথা বলতে কারো শরমিন্দা হওয়ার অবকাশ নেই। এ লড়াই একেবারে ফালতু লড়াই নয় জনাব। আমার খেয়াল, কামরূপরাজ আক্রান্ত হলে অহোম রাজ চুপ করে থাকবেন না। নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনিও কামরূপ রাজের পক্ষ নেবেন। ফলে এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের। তরুণ মুহাফিজ আলী আশরাফ সাহেব নিঃসন্দেহে একজন জানবাজ ও কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক। বিজ্ঞ উজির আজম খাঁ সাহেবের সাথে এখানে আমি একমত। কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা লড়াইয়ের দায়িত্ব একজন অরুণের উপর ন্যস্ত করা কোনক্রমেই সমীচীন হবে বলে আমি চিন্তা করতে পারছিনে। লড়াইএ উদ্যমের প্রয়োজন আছে জনাব, কিন্তু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। কাজেই আমার অভিমত, এ লড়াইয়ের দায়িত্ব একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সালারের উপর ন্যস্ত করা হোক। এতে আদেশ পালনের শৃংখলাও অক্ষুণ্ন থাকবে।

এই এক বক্তৃতায় রাজা গণেশ সুলতানের মনোভাবকে ঘায়েল করে দিলেন। সুলতান কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থেকে ভাবলেন। অতঃপর বললেন, বিজ্ঞ উজির রাজা সাহেবের এ যুক্তি ফালতু নয়। সোচ্ করে দেখার মতো এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। কাজেই এ লড়াইয়ের সিপাহ সালারের দায়িত্ব আমি অভিজ্ঞ সালার দৌলত খাঁ সাহেবের উপর অর্পণ করলাম। সহকারী সালার হিসাবে কাজ করবেন আলী আশরাফ আর আতা খাঁ। আপনারা তৈয়ার হয়ে যান। অকারণে কালক্ষয় আমি বরদাস্ত করতে অপারগ।

সুলতান দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন। সালার জহিরুদ্দীন আজম খাঁ সাহেবের দিকে বিপন্ন নজরে এক পলক তাকালেন। আজম খাঁ সাহেব এবারও অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন।

সেই রাতেই শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা শাহ সালার দৌলত খাঁর মকানে এসে আচমকা হাজির হলেন। খোদ শাহজাদাকে দেখে দৌলত খাঁ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শাহজাদা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাজা গণেশ মিয়া মোস্তাক আর সহদেব রায়কে তখনই হাজির করতে বললেন। অপমানিত হয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই

তিনি অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। এর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আহার নিদ্রাকে তিনি হারাম করে ফেলেছেন। সাবাই এসে হাজির হলে শাহজাদা অশান্ত কণ্ঠে বললেন, বিজ্ঞ রাজা সাহেব, আমাকে আর কতদিন এক ফালতু ভরসার উপর রাখবেন? উজির মিয়া মোস্তাক সাহেব আর কতদিন আমাকে এইভাবে অপদস্ত হতে দেখবেন? আমি আজ জানতে চাই। এর ত্বরিত কোন ফয়সালা করতে আপনারা রাজী কিনা?

রাজা গণেশ বললেন, আপনি যদি চান তো যে কোন সময় ফয়সালা আমরা করতে পারি। আমরা তো সবাই আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছি।

ঃ আর চেয়ে থাকা, অপেক্ষা করা, এসব বাহানা আপনারা ছাড় ন। মসনদ আমার অতি সত্বর চাই। আমি শুনে খুশী হয়েছি যে, কামরূপ অভিযানের সালার হয়ে দৌলত খাঁ সাহেব কামরূপ যাত্রা করছেন। কামরূপ জয় হলো কিনা ও নিয়ে আমার থোড়াই পরোয়া আছে। আমি চাই, ঐ কামরূপের ময়দানই হবে আলী আশরাফ আর আত খাঁর কবর। সালার দৌলত খাঁ সাহেবকে আমি এ কথা বিশেষভাবে খেয়াল করিয়ে দিতে চাই।

দৌলত খাঁ বললেন, আমার উপর বিশ্বাস রাখুন আলীজা। কামরূপ থেকে ওরা দুইজন আর জিন্দা ফিরে আসছে না। এলে ওদের লাশ দুটোই আসবে শুধু।

ঃ সেই সাথে রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাক সাহেবের ভূমিকা আরো জোরদার দেখতে চাই। আমাকে আপনারা আপনাদের খেদমতে সব সময়ই পাবেন। কিন্তু আপনাদের কার্যক্রম এমনই শানদার হওয়া চাই, যাতে করে দৌলত খাঁ সাহেব কামরূপ থেকে ফিরে এসে দেখেন – পাণ্ডুয়ার মসনদে নয়া সুলতান বসেছে।

আবেগে আর অস্থিরতায় শাহজাদা বিপুল বেগে কাঁপছিলেন। তাকে অতি কষ্টে সুস্থির করে সবাই বসে পরিকল্পনা পাকা করে ফেললেন। সুলতানী ফৌজ বাইরের লড়াইয়ে যত বেশী জড়িয়ে পড়বে, ততই মঙ্গল। আলী আশরাফ আর আতা খাঁ সাবার হয়ে গেলেই সুলতান রদবদলের কাজে হাত দেবেন তাঁরা। শাহজাদাকে যত সত্বর সম্ভব মসনদে বসিয়ে তবেই ক্ষান্ত হবেন সকলে।

যুক্তি-শলা ঠিক করে শাহজাদা সাইফুদ্দীন যখন নিজ মহলে ফিরলেন তখন অনেক রাত। সকলে বিদায় হওয়ার পর সহদেব রায় রাজা গণেশকে এক ফাঁকে বললেন, তাহলে পরোক্ষ পথেই শেষ পর্যন্ত এগুতে হলো আমাদের?

রাজা গণেশ মুচকি হেসে বললেন, যো আপ্‌ছে আপ্‌ আতা হ্যায়, উস্‌কো আনে দো।

* * *

লড়াইয়ের আন্‌যাম শুরু হয়ে গেছে। আলী আশরাফ আর ছত্রায় যেতে পারেন নি। কাজের চাপে পাণ্ডুয়াতেই থাকতে হচ্ছে তাকে। সালার জহিরুদ্দীনের মকানই তার

আবাসস্থল। প্রস্তুতির তদারকি সেরে জহিরুদ্দীনের মকানে ফিরে আসার পথে দৌলত খাঁর নওকর বৃদ্ধ মুহব্বত খাঁর সাথে এক সরু গলির মোড়ে আলী আশরাফের দেখা হলো। মুহব্বত খাঁ হন্ত দন্ত হয়ে আলী আশরাফের কাছে এসে সালাম দিয়ে বললো, আমি কয়দিন থেকেই আপনার তালাশ করছি বাপজান। ছত্রায় আপনার কাছে একজন লোকও পাঠিয়েছি। আপনি যে এখনও এখানেই আছেন তা জানিনে।

আলী আশরাফ বললো, কেন চাচা, কোন গরম পয়গাম আছে?

জায়গাটা প্রায় নির্জন ছিলো। তবু আরো বেশী নিরাপদ স্থানে সরে এসে মুহব্বত খাঁ বললো, ষড়যন্ত্রের উনুনে যেখানে জাল পড়ছে হরদম, যেখানে গরম পয়গামের অভাব থাকে বাপ? হর লহমা গরম গরম নয়া পয়গামের পয়দা হয় আপনার জান নাশের ব্যাপারে আমার আগের হুঁশিয়ারীটা কেমন গরম ছিলো তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পেয়েছেন। এবার যে পয়গাম আছে সেটা আরো মারাত্মক।

ঃ কি রকম?

ঃ এবার শুধু আপনাদের জানই নয়, সুলতানের জানও বিপন্ন। যতদূর বুঝতে পারছি, অচিরেই এই পান্ডুয়ার মসনদে নয়া সুলতান বসছেন। মতলব একদম পাকা।

আলী আশরাফ অতি বিস্ময়ে বললো, চাচা!

মুহব্বত খাঁ বললো, খামাখা আর আপনারা এই মুসিবতের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন কেন? সুলতানই যদি না বাঁচে, তাহলে কার জন্যে পেরেশান হচ্ছেন আপনারা? এছাড়া আপনাদেরই বা বাঁচতে দিচ্ছে কে? চাচা!

সুলতান খোয়াবের মুলুকে বাস করছেন। তাঁর অন্তিম যে একেবারেই ঘনিয়ে আসছে তা কিছুতেই তিনি আন্দাজ করতে পারছেন না। আপনি সোচ্ করে হয়রান হবেন, যারা তাঁর জান নিতে তৈয়ার, তাদেরকেই তিনি বুকের কাছে টেনে নিচ্ছেন। আর যাঁরা তাঁকে হেফাজত করতে চান, তাদের দিচ্ছেন সরিয়ে।

ঃ কাকে আবার সরিয়ে দিলেন?

ঃ উজির খান জাহানকে দেখতে পাচ্ছেন আজকাল?

ঃ নাতো! কথাটা আমার খেয়াল হয়েছে। জিজ্ঞেস করবো করতে করতে ভুলে গেছি। কোথায় এখন তিনি?

ঃ এই বিরাট শাহী মহলে হুট করে কখন কি ঘটে যাচ্ছে তামাম খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমার মুনিবের মকানটা সব খবরের ঘাঁটি বলে কিছু কিঞ্চিৎ পাই আমি। উজির খান জাহান এখন মক্কা শরীফের পথে।

ঃ মানে?

ঃ পবিত্র মক্কা শরফি কিছু মূল্যবান উপহার পাঠানোর আর সেখানে নিজ খরচে কিছু মাদ্রাসা স্থাপনের খায়েশ হয়েছে সুলতানের। সেই কাজেই নিয়োগ করেছেন তাঁকে। অবশ্য কাজের ধরন হিসাবে খান জাহানের মতো সাদা দীলের মানুষের কাজ

এটা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ যে এখানে ছিলো তাঁর, এ হুঁশটা সুলতানকে দেয় কে?

ঃ চাচা!

ঃ আমি গোলাম হলেও তো আমারও কান আছে দুটো, চোখ আছে কপালে, দীল আছে সিনার মধ্যে। এ দরবারের ভাব সাব বুঝতে আমার কমতি কিছু নেই। দরবারের প্রায় মোটা মোটা মাথাগুলোই কাজ করছে সুলতানের বিরুদ্ধে। সংখ্যায় তারা বিপুল। বাদ বাকীরা সুলতানের বিপক্ষে না হলেও তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর হিম্মত এই বাদবাকীদের নেই। থাকার মধ্যে আছেন নখে-গনা আপনারা কয়টি মাত্র লোক। তার আবার মাথা বলতে উজির খান জাহান আর আজম খাঁ সাহেব এই দুইজন মাত্র লোক। তারই যদি একজনকে সরিয়ে দেন উনি, তাহলে আর তাঁর কবর খোঁড়ার কাজে খুব বেশী দিন এন্তেজারে থাকতে পারে?

আলী আশরাফ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো তারই অভিজ্ঞান আর অনুভূতিটা ব্যক্ত হচ্ছে মুহব্বত খাঁর মুখ দিয়ে। তবু তার চাঞ্চল্যকে শান্ত করার লক্ষ্যে আলী আশরাফ বললো, আমার খেয়াল, আপনি সম্ভাবনার চেয়েও খুব বেশী সোচ্ করছেন চাচা! যা ভাবছেন তাতো নাও ঘটতে পারে!

মুহব্বত খাঁ ম্লান হাসি হাসলো। বললো, আমি দেখে দেখেই চুল পাকিয়েছি বাপজান। আমি আলামত দেখেই ফলাফল বলতে পারি। এই হুকুমাতের হালচাল তিন পুরুষ ধরে দেখে আসছি আমি। যা ভেবেছি, কোনদিন তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবারও যে এর ব্যতিক্রম ঘটবে না, তা আমার নজরে না দেখলে কাউকে সমঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এখন প্রায় বারো আনা আমীর-উমরাহই সুলতানের পতন চায়। এদের সংখ্যা চৌদ্দ আনা, পনের আনা হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। যেদিকটা দলে ভারী সেই দিকটায় গড়িয়ে পড়া তো অধিকাংশ ইনসানের স্বভাবগত অভ্যাস। আমি একজন গোলাম হয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারি আর সুলতান তা পারেন না বা পারার কোশেশ করেন না। তাঁর আর বেঁচে থাকার হক কোথায়?

ঃ তা মানে !

ঃ সুলতান দেখুন জৌনপুরের! শয়তানী করতে গিয়ে কেমন শক্ত লাথি খেয়েছে আফতাব খাঁ।

বৃদ্ধের এই আধিক্যে আলী আশরাফ জাররা পরিমাণ বিব্রতবোধ করলো। বললো, উজির নাজির সালারেরা কেউ যদি এ নিয়ে না ভাবেন, আপনি এত আফসোস্ করে করবেন কি?

মুহব্বত খাঁ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো। বললো, বাপজান আমি তো আর কোন পদ-পদবীর আশা নিয়ে ভাবছিনে? ভাবছি এ মুলুকে আমাদের কওমের আখের নিয়ে, আমাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত নিয়ে। এই বাংলার মুসলমানদের আশা-ভরসা বলতে

একমাত্র এই সুলতান। তার আমলেই যদি এই সালতানাতের হেফাজতি সুনিশ্চিত না হয়, গাদ্দার আর, মোনাফেকদের নির্মূল করা না হয়, তাহলে ঐ অপদার্থ শাহজাদার আমলে আর ভরসা কি? সেতো এই সালতানাতকে দুই দিনও ধরে রাখতে পারবে না। মুসলমানদের ইয্যত সে দু'দিনেই বিকিয়ে দেবে?

মুহব্বত খাঁ দম নিয়ে ফের বললো, কিন্তু সে আশা আর এক বিন্দুও নেই। জ্বলন্ত আগুন এখন মুসলমানদের ঘরের চালের নয্দিকে পৌঁছে গেছে। চালের খড় ছুঁই ছুঁই করছে। এখন শুধু ঐ ছোঁয়াটুকুই বাকী।

অভিভূত আলী আশরাফ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, সবই তো বুঝি চাচা কিন্তু–

মুহব্বত খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, না বাপজান! কিন্তুর কোন ফুরসৎ আর নেই। আপনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় সাবেক মুনিবের আওলাদ। আপনার জান আমার চোখের সামনে কুকুর বেড়ালের মতো খতম হয়ে যাবে, এ আমি বরদাস্ত রতে পারবো না। আর যদি কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকতো, আমিই আপনাকে এখানে থেকে গিয়ে জেহাদ করার অনুরোধ করতে আসতাম। কিন্তু সে আশা আর কিছুমাত্র নেই। কাজেই আমার আরজ বাবা, আপনি শিগগিরই এ মুলুক ত্যাগ করুন। শিগগির – খুব শিগগির।

ঃ চাচা!

ঃ আর যদি একান্তই শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে চান, নিজের জানের হেফাজতি দশ গুণ বাড়িয়ে দিন। যে কোন সময় দুশমনেরা চড়াও হবে আপনার উপর। আর এইটুকু বলার জন্যেই এত তালাশ করছি আপনাকে। হুঁশিয়ার বাপজান, হুঁশিয়ার...

লোকজনের ভিড় বৃদ্ধি পাওয়ায় মুহব্বত খাঁ দ্রুত পদে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো।

মাগরিব নামাজ অন্তে মসজিদ থেকে ফেরার পথে উজির আজম খাঁ সাহেবের সাথে জহিরুদ্দীন বললো, জনাব, এই মুহূর্তে আপনার কিছু নসিহৎ ছাড়া তো আমরা কোন দিশে খুঁজে পাচ্ছিনে?

উজির সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, কি নসিহৎ করবো! কামরূপ জয়ের সম্ভাবনা তো সুলতান দরবারেই কোরবানী করে দিলেন। দৌলত খাঁ রাজা গণেশের ডান হাত। কামরূপ রাজের স্বার্থেই তারা জেনে শুনেই সবকিছু গোপন করে গেছে। যুদ্ধে যাওয়ার নামে দৌলত খাঁ কামরূপ রাজের মেহমান খানায় তোফা একটা ভোজ গ্রহণের মওকা পেলো এই আর কি!

আলী আশরাফ বললো, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু উজির সাহেব জোর দিয়ে বললেন, শুধু ঠিকই নয়, এইটেই চরম সত্যি কথা। লড়াইয়ের সিপাহসালার সে। তলোয়ার কোষমুক্ত করা না করা তার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। অধীনস্ত তোমাদের কি করার থাকবে সেখানে? যুদ্ধ জয় খতম। এখন রাজধানী হেফাজতের কাজে জহিরুদ্দীনের সামনে একটা মস্ত বড় তুফানের আশংকাই দেখতে পাচ্ছি শুধু। ময়দানের স্থগিত বীরত্বটা সবান্ধব এসে রাজধানীতে জাহির করার কোশেশ্ যে করবে না,এটা হলপ করে

বলা কঠিন।

জহিরুদ্দীন আফসোস্ করে বললো, আমি চিন্তা করে পাইনে। এই সুলতান একজন পাগল না মাতাল? দোস্ত দুশমন ফারাক করার এতটুকু অন্তর্দৃষ্টি থাকবে না তাঁর?

আজম খাঁ বললেন, থাকবে না। গণেশ প্রীতি তাঁর দীলে এতই দুর্বার যে, তাকে ছাড়া নিজে তিনি কিছুই বুঝতে চাইবেন না। শুনে তোমরা তাজ্জব হবে, তার আর মিয়া মোস্তাকের যুক্তি শুনেই সুলতান নির্দ্বিধায় উজির খান জাহান সাহেবকে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভাবতেও গেলেন না, তিনি তাঁর শুভকাংখী ও মুসিবতের দিনে পাশে দাঁড়ানোর ব্যক্তি। অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগানোর স্পৃহাটাই যাঁর নেই, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থাকা না থাকা এক কথা।

আলী আশরাফ বললো, এর কি কোন সুরাহা নেই?

উজির সাহেব বললেন, আছে এক্ষুনি সুরতানকে বন্দি করে শাহজাদা হামজা শাহসহ তামাম গাদ্দার আর মতলববাজদের নির্মূল করতে পারলে একটা সুন্দর ফয়সালা হয়ে যায়। কিন্তু এতটা তো আর সত্যি সত্যিই সম্ভব নয়।

জহিরুদ্দীন বললো, তাহলে আমরা করি কি এখন?

উজির সাহেব উদাস নজরে তার দিকে তাকালেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন, এক কথায় এর জবাব যদি আমার কাছে চাও, তাহলে হয় লড়াই করো, নয় আপসে আপ্ কেটে পড়ো।

ঃ পরিস্থিতি তোমাদের সামনে পরিষ্কার। এটা অস্পষ্ট কিছু নয়। এখন তোমরাই স্থির করবে কোনটা তোমাদের কর্তব্য, কি তোমাদের করা উচিত। জোর করে কিছু বলার আর অবস্থা এখন নেই।

আলী আশরাফ বিব্রত কণ্ঠে বললো, তা না থাকলেও বুযদীলের মতো পালিয়ে যাওয়া যায় কি করে? পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখেই শেষ চেষ্টা না করে জান নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেরেফ স্বার্থপরতাই তো নয়, ঈমান আর নিয়াতের অবমাননাও বটে।

উজির সাহেব বললেন, সে তো অবশ্যই।

ঃ কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আজই যদি হাল ছেড়ে দেই আমরা, তাহলে যে বাংলা মুলুকের মুসলমানদের আখেরকে আজকেই ভাসিয়ে দেয়া হয়।

ঃ আচ্ছা!

ঃ যে রুগী মুমূর্ষু-মরবেই যে খানিক পরে, তবু মওতের আগেই তার মুখের উপর মুর্দার আবরণ টেনে দেয়া কি করে সম্ভব?

ঃ এই তো, তোমরা তো তোমাদের কর্তব্য পয়চান করেই নিয়েছো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নেক নিয়াত নিয়ে লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত লড়ে যাও, এরপর আল্লাহ ভরসা।

ঃ জনাব!

ঃ তাতে কামিয়াব হতে না পারলেও আত্মগ্লানির পীড়ায় কাউকে তকলিফ পেতে হবে না।

জহিরুদ্দীন বললো, ঠিক আছে। শেষ পর্যন্ত লড়েই দেখি, কি আছে এই নসীবে!

উজির সাহেব বললেন, সাব্বাস্। বাদ এশা তোমরা একবার এসো আমার মকানে। দুশমনদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আমাদেরও থাকা উচিত।

প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে সালার দৌলত খাঁ আচানক প্রচার করলেন, যুদ্ধযাত্রা করতে এখনও এক দেড় হপ্তা লাগবে। জায়গীরদারদের ফৌজ যথাসময়ে হাজির না হওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আলী আশরাফের কাজ এখানে শেষ। তার উপর নির্দেশ হয়েছে, সে ছত্রায় ফিরে গিয়ে তার নিজের ও জায়গীরদার আব্দুল লতিফের ফৌজ নিয়ে এন্তেজারে থাকবে। বাহিনী তৈরি হলে দৌলত খাঁ ফৌজ নিয়ে ঐ পথেই কামরূপ যাত্রা করবেন। ফৌজ নিয়ে আলী আশরাফকে পথিমধ্যে তাদের সাথে সামিল হতে হবে।

একমাত্র জায়গীরদার আব্দুল লতিফের ফৌজ ছাড়া আর কোনই জায়গীরদারের ফৌজ গরহাজির নেই। আব্দুল লতিফের ফৌজও রাস্তাতেই সামিল হবে– এ ব্যবস্থা অনেক আগের। তবু এই গড়িমসি কেন? দৌলতখাঁর পদক্ষেপ আলী আশরাফকে ভাবিয়ে তুললো। তাকে আন্দাজ করতে তকলিফ পেতে হলো না যে, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। এই মতলবটা কি, আলী আশরাফ শুধু সেইটেই হাতড়িয়ে ফিরতে লাগলো। মুহব্বত খাঁকে এই সময় কাছে পেলে হদিস কিছু পাওয়া যেতো। কিন্তু তার পক্ষে তো হামেশাই যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। আলী আশরাফ আরো একদম আকাশ থেকে পড়লো যখন জহিরুদ্দীন তাকে জানালো, কামরূপ রাজের প্রস্তুতির হদিস নিতে রাজা গণেশকে ইতিমধ্যেই সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। দৌলত খাঁর সুপারিশেই রাজা গণেককে এই কাজের উপযুক্ত মনে করে সুলতান তাকে পাঠিয়েছেন।

এই খবর শুনে আলী আশরাফের মনে হলো, নিজের মাথার চুলগুলো নিজেই সে ছিঁড়ে ফেলে দুই হাতে। সেই সাথে তার মনে হলো উজির আজম খাঁ সাহেবের দেয়া পরিকল্পনার কথা ঃ গাদ্দারদের গাদ্দারীতে যুদ্ধ জয় না হলে ফিরে এসেই শেষ চেষ্টা নিতে হবে। পরাজিত সুলতানী ফৌজ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। সেই ফাঁকে সালার জহিরুদ্দীন, ফৌজদার আতা খাঁ আর আলী আশরাফ– তিনজনের তিন বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালিয়ে গাদ্দার আর মতলববাজদের খতম করে দেবে। অতঃপর সুলতানের মনঃপূত না হলে তাঁকে আখেরী সালাম জানিয়ে সবাই তারা বাংলা মুলুক ত্যাগ করবে। এতে আর যা হোক, বাঙলা মুলুকে কওমের আখেরটা পানির দামে বিক্রি হয়ে যাবে না।

আলী আশরাফের মনে হলো, ফিরে এসে নয়, নিজ বাহিনী তৈরি থাকলে এখনই সে

ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন-মরণপণ করে। ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে অস্থির হয়ে আলী আশরাফ কিছুক্ষণ ইতস্তত ছুটোছুটি করলো। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে শয্যার উপর শুয়ে পড়লো। আগামীকাল সবেরেই সে ছত্রায় ফিরে যাবে। ইতিমধ্যে এদিকে আবার কোন কাণ্ড ঘটে যাবে, কে জানে! বাহিনী তৈয়ার করে দৌলত খাঁ বসে আছে। এক-দেড় হপ্তার পর আদৌ সে কামরূপ যুদ্ধে যাবে কিনা, তাই– বা কে বলতে পারে? যদি বিপরীত কিছু ঘটে, তাহলে ঝুঁকি পড়বে জহিরুদ্দীন আর আতা খাঁ এই দুইজনের উপর। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সে লড়ার মওকা পাবে না।

এরই মধ্যে তার দীলের কোণে উঁকি দিলো লায়লা আকতারের মুখ। আম্মা তার অসুস্থ। ওয়াপস্ গিয়ে লায়লাই বা কি অবস্থায় আছে, সে খবরও তার কাছে অদ্যাবধি অজ্ঞাত।

নানা কেসিমের চিন্তা-ভাবনায় হাবুডুবু খেতে খেতে আলী আশরাফ ঘুমিয়ে গেলো এক সময়। তার ঘুম ভাঙ্গলো আসর নামাজের আযানে। ক্ষিপ্র হস্তে অজু সেরে সে মসজিদে গিয়ে আসর নামাজ আদায় করলো। মসজিদ থেকে বেরিয়ে আর আস্তানায় ফিরে এলো না। সে ধীরে ধীরে পা বাড়ালো শাহী মহলের দিকে।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বালাখানায় বসে একাকী তসবিহ তেলোয়াত করছিলেন। বালাখানার বান্দা ইয়াকুত আলী। আলী আশরাফের আগমন বার্তা জানালে সুলতান তাকে ভেতরে আনার নির্দেশ দিলেন। ইয়াকুত আলীর মুখে নির্দেশ পেয়ে আলী আশরাফ বালাখানায় প্রবেশ করে তাজিমের সাথে কর্নিশ করে দাঁড়ালো। তসবীহখানা এক পাশে রেখে সুলতান হাসি মুখে বললেন, এই যে আলী আশরাফ, এসো এসো। কেন যেন এতক্ষণ আমি তোমার এন্তেজারই করছিলাম।

আলী আশরাফকে ডেকে সামনাসামনি বসিয়ে সুলতান ফের খোশদীলে বললেন, তোমাদের জন্যে একটা মস্তবড় খোশ পয়গাম আছে।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আলী আশ্‌রাফ বললো, জনাব!

ঃ কামরূপ যুদ্ধ জয় নিয়ে যতখানি পেরেশান আছো তোমরা সে পেরেশানীর আর কিছুমাত্র কারণ নেই। এখন জয় আমাদের মুঠোর মধ্যে।

ঃ মেহেরবানী করে আর একটু খোলাসা করে বললে–

ঃ রাজা সাহেবের ভয় ছিল, কামরূপ রাজের সাথে অহোম রাজও যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে। শুনে তুমি খুশী হবে যে, সেই অহোমরাজই এখন কামরূপের সাথে লড়ছে।

ঃ কারণ কি জনাব?

ঃ কারণটা সম্পূর্ণ পারিবারিক। অহোম রাজার স্ত্রী একজন নষ্ট চরিত্রের আউরাত। তার কুকীর্তি ধরা পড়লে অহোমরাজ সুদক্ষফা রাণীর উপপতি তাইসুলাইকে পাকড়াও করার কোশেশ্ করেন। তাইসুলাই পালিয়ে আসে কামরূপ রাজ্যে। কামরূপরাজ সব

জেনে শুনেও তাইসুলাইকে আশ্রয় দেন। অহোমরাজ তাইসুলাইকে ফেরত চাইলে কামরূপরাজ তা অস্বীকার করে বসেন। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে শুরু হয়েছে লড়াই।

ঃ আল্লাহ তায়ালার শান! বুঝলে আলী আশরাফ, নিয়াত নেক হলে আল্লাহ তায়ালাই কামিয়াবীর রাহা খোলাসা করে দেন।

আলী আশরাফ এতক্ষণে বুঝতে পারলো, কেন দৌলত খাঁর এই গড়িমসি। সেই সাথে সে আন্দাজ করতে পারলো, কেনই বা রাজা গণেশের সেখানে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। আলী আশরাফ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো। পরে সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, তা ঠিকই জনাব। আল্লাহ তায়ালা নেক নিয়াতের পক্ষে সব সময়ই থাকেন। তবে নির্বুদ্ধিতার পক্ষে তিনি থাকেন কিনা, তা আমার জানা নেই।

ঃ মানে?

ঃ গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! রাজা গণেশ সাহেবকে ঐ সীমান্ত এলাকায় পাঠানোর মতলবটা কি?

ঃ পরিষ্কার মতলব। যুদ্ধ আমাদের হিন্দু মুলুকের সাথে। রাজা গণেশ হিন্দু মানুষ। সেখানে গুপ্তচর লাগিয়ে কাজ করতে হলে রাজা গণেশই উপযুক্ত মানুষ। অনেক হিন্দুদের তিনি কাজে লাগিয়ে ভেতরের খবর নিতে পারবেন।

আলী আশরাফ এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অপেক্ষাকৃত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, তা অবশ্যই পারবেন জনাব। তবে আমার আফসোস্ ভেতরের খবর দিতেও তিনি পারবেন।

সুলতান এবার তীক্ষ্ণ নজরে আলী আশরাফের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, তার অর্থ?

ঃ অর্থটা অন্যকিছু নয়, জনাব! আমাদের এতই বদনসীব যে, আগুন লেগে লেবাস আমাদের পুড়ে ভস্মীভূত না হওয়া তক, আমরা কেউ খেয়াল করতেই চাইবো না যে, গায়ে আমাদের আগুন লেগেছে!

এ কথায় সুলতান বিস্ময়ের সাথে বললেন, আলী আশরাফ, তোমাকে আজ খুব পেরেশান বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তুমি প্রকৃতিস্থ নও। তুমি বেখেয়াল হয়ে গেছো?

ঃ আমি খেয়ালেই আছি জনাব।

ঃ তাহলে কি বলতে চাও খোলাসা করে বলো।

আলী আশরাফ কাতর কণ্ঠে বললো, বাংলা মুলুকে মুসলমানদের আশা-ভরসা বলে কি কিছুই থাকবে না হুজুর?

সুলতান এবার গোস্বা হলেন। বললেন, না থাকার কারণ কি দেখলে তুমি?

ঃ কসুর মাফ হয় জনাব। তা থাকার যদি তিল পরিমাণ সম্ভাবনা থাকে তাহলে যারা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে ছুরি ধরে তাল ঠুকে বসে আছে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারাই কি করে নিয়োজিত হয়? যারা পাণ্ডুয়ার মসনদ নিয়ে হামেশাই সওদাবাজি করছে

তাদের উপরই মসনদের হেফাজাত কি করে ন্যস্ত হতে পারে?

আলী আশরাফের দুঃসাহস দেখে সুলতান তাজ্জব বনে গেলেন! পর পর কয়েকটা কুঞ্চনের রেখা ললাটে তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আলী আশরাফ, তুমি আস্‌গার চাচার ছেলে। সে কারণে তোমার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে ঠিকই। কিন্তু আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, তুমি কি করে ভুলে যেতে পারলে যে, যার সাথে কথা বলছো সে এ মুলুকের সুলতান আর যা নিয়ে কথা বলছো, তা তোমার সম্পূর্ণ এক্তিয়ারবহির্ভূত?

ঃ আমার তা বেখেয়াল হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই জনাব। আপনাকে আমি আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক হিসাবেই জানি, অন্যকোন হিসাবে নয়। আমি জানি আপনার একটা ইঙ্গিতে আমার শির যে কোন সময় জমিনের উপর গড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু জান, মাল আর ইয্‌যত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার এক্তিয়ার প্রত্যেক মানুষেরই আছে। অন্যের ভুলে বা উদাসীনতার কারণে কেউ মুখ বন্ধ করে সর্বস্ব কোরবানী দিতে পারে না।

সুলতান অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে বললেন, তাহলে তুমি বলতে চাও, আমার ভুলের জন্যেই তোমার সর্বস্ব কোরবানী হতে চলেছে?

জওয়াবে আলী আশরাফও দীপ্ত কণ্ঠে বললো, সত্যের অপলাপ না করলে আমাকে বলতেই হয় জনাব, শুধু আমার একার নয়, বাংলা মুলুকের তামাম মুসলমানের সর্বস্ব কোরবানী হতে চলেছে। আপনাকে বা আপনার হুকুমাতকে নিয়ে আমার কথা বলার এক্তিয়ার নেই ঠিকই, কিন্তু আপনি এমনই একজন মানুষ, আপনার হুকুমাত এমনই একটা হুকুমাত, যার সাথে জড়িত আছে এ মুলুকের তামাম মুসলমানের আখেরাত। আপনার সামান্য একটা ভুল, সামান্য একটু গাফিলতি আর কিঞ্চিৎ উদাসীনতার কারণে এ মুলুকের মুসলমানদের সর্বস্ব বিরান হয়ে যেতে পারে। আর ব্যাপারটা এ রকম না হলে আমি এতবড় গোস্তাকী কখনও করতাম না। জনাব, যে মুলুকের, যে কওমের স্বার্থ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, আমি সেই মুলুকের, সেই কওমের একজন। আমার কণ্ঠস্বর তাদেরই কণ্ঠস্বর। আমি তাদেরই একজন হয়ে আপনার কাছে একান্ত আরজ নিয়ে এসেছি। মেহেরবানী করে এ কওমকে আপনি বাঁচান। আমি দাবি নিয়ে এসেছি, আপনার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী আর চিন্তা-ধারার কারণে তাদের ভবিষ্যৎ মিস্‌মার করার কোন অধিকার আপনার নেই।

বিরাগ আর বিস্ময়ে দিশেহারা সুলতান একই রকম কণ্ঠে পুনরায় বললেন, আমি ভেবে তাজ্জব বনে যাচ্ছি, তোমার এ ধারণা কি করে হলো যে, কওম নিয়ে তোমার যে চিন্তা আছে আমার তা নেই? কওমকে আমি বাঁচতে দিতে চাইনে?

ঃ জনাব, আবার আমি মাফী চেয়ে বলছি, দোস্ত-দুশমন নিরূপণে আপনার নিদারুণ ব্যর্থতাই আমার এই ধারণার কারণ।

সুলতান ফেটে পড়ে বললেন, আলী আশরাফ!

ঃ প্রাণদণ্ডের আদেশও আমাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না জনাব!

ঃ কারা সেই দুশমন?

ঃ যাদেরকে ছাড়া আপনি এক ধাপও চলেন না, সেই রাজা গণেশ, মিয়া মোস্তাক আর দৌলত খাঁর দল। এরা যে আপনার দোস্ত নয়, পরম দুশমন, এ খেয়াল আপনার দীলে কিছুতেই স্থান পাচ্ছে না কেন?

ঃ যদি বলি, তোমরাই দুশমন হিসাবে আমার দীলে স্থান পেয়েছো আগে, সেই কারণে?

ঃ আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এমন কোন কার্যকলাপ সুলতান বাহাদুর আজতক পাননি, যা থেকে এ ধারণার পয়দা হতে পারে।

ঃ তাদেরই বা কি এমন কার্যকলাপ আছে যা থেকে এ ধারণার পয়দা হবে দীলে আমার?

ঃ একটা নয় জনাব, এমন শত শত অপকীর্তি তাদের পেছনে আছে। এ ধরনের অপকর্ম তারা হামেশাই নির্দ্বিধায় সম্পাদন করে যাচ্ছে। অভাব শুধু সন্ধানী নজরে তা দেখার।

ঃ তোমার নজর যদি এতটাই সন্ধানী হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে তা প্রমাণ করতে হবে।

ঃ জনাবের এযাযত নিয়েই আমি তাহলে বলছি– কামরূপ অভিযানে আমাদের অহেতুক বিলম্বের যুক্তি কি জনাব? হপ্তাদেড়েক ধরে আনযাম সম্পন্ন করার পরও আবার দেড় হপ্তার এন্তেজার কি কারণে? অহোমরাজ আর কামরূপ রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দের জন্যে নয় কি? তাদের সমঝোতায় এসে জোট বাঁধার সুযোগ দেয়ার জন্যে নয় কি? গুপ্তচরবৃত্তিতে রাজা গণেশের হঠাৎ এই উৎসাহ কেন? স্বজাতীয় রাজাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের অছিগিরি করার উদ্দেশ্যে নয় কি? বার বার গিয়েও সীমান্তের এই তাজা খবর দৌলতখাঁ বা সেই গোষ্ঠীর না জানার ভান করার কারণ কি? কামরূপ রাজ্যের দ্বারা এদেশ বিপন্ন হোক, সেইজন্যে নয় কি? হিন্দু কিল্লাদার কানাই লালের কিল্লায় শত্রুরাজ্য মিথিলার হিন্দু সালার বীরবাহু এসে মওজ করার মওকা পায় কি কারণে? মুসলমান সালতানতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পাকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয় কি? চোখের সামনে আমাদের দুইটি গ্রাম ভস্মীভূত হতে দেখেও কানাইলাল নীরব থাকে কি কারণে? শত্রু শক্তিকে সহায়তা করার জন্যে নয় কি? এই দুর্বৃত্ত ও বিশ্বাসঘাতক কানাইলালের পক্ষে ন্যায়নিষ্ঠ আর দেশপ্রেমিক আতা খাঁর বিপক্ষে রাজা গণেশের দল এত সোচ্চার হয় কোন্ স্বার্থে? দলীয় দুষ্কৃতিকে চাপা দেয়ার জন্যে নয় কি? নিছক একটা অভিনয়ের চাতুর্যে রাজা গণেশ কানাইলালের ন্যায্য শাস্তি প্রাণদণ্ড বানচাল করে কোন্ উদ্দেশ্যে? দলীয় কর্মীকে রক্ষা করার জন্যে নয় কি? সর্বোপরি শাহী বংশের

প্রতিটি খুন-খারাবীর ঘটনাস্থলে যে একই দলকে বার বার পাওয়া যাচ্ছে। সেই দলকেই রাজা গণেশের পুনঃপুনঃ একতরফা সমর্থন দেয়া থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, রাজা গণেশই তামাম চক্রান্তের শিরোমণি? রাজা গণেশই এই গোষ্ঠীর কর্ণধার?

জাহাপনা, আমার নিজের জানের উপরও যে বার বার এত হামলা আসছে, তার কারণও ব্যাখ্যা করলে ঐ একই উত্তর পাওয়া যায়। আমি এখানে নয়া আদমী। বৈষয়িক কোন কোন্দল আমার কারো সাথেও নেই। আমি এখানে আমার কওমী হুকুমাতের খেদমত করতে এসেছি। আমার সাধ্যমতো এই হুকুমাতকে আমি হেফাজত করতে এসেছি। তবু আমার উপর এই আক্রোশ কার? জৌনপুর থেকে কোন ভাড়াটিয়া দুশমন এখানে আসেনি! কামরূপ রাজের সিপাই ছত্রায় এসে বসে নেই? কারা আমার বিরুদ্ধে সাপ লেলিয়ে দিচ্ছে? অলক্ষ্যে থেকে তীর ছুঁড়ে মারছে? গড়দিয়ারের পথের ধারে সসৈন্যে ওঁৎ পেতে থাকছে? আমার কাছে পয়গাম আছে জনাব, এরা ঐ রাজা গণেশ আর মিয়া মোস্তাকের গোষ্ঠী। তাদের বদ নিয়াত হাসিলের পথে আমি প্রতিবন্ধক কেউ না হয়ে যদি অনুকূল কেউ হতাম– এসব বালা-মুসিবত আমার ধারে কাছেও আসতো না। যেমন আসে না গণেশ দলের একজনেরও বিরুদ্ধে। আমার বড় উম্মিদ ছিল, জনাবের নেক নিয়াতের বদৌলতে নিশ্চয়ই এসবের কারণ উদ্‌ঘাটিত হবে। কিন্তু যখন দেখলাম, ছত্রার জায়গীরদার আব্দুল লতিফের মকান মসনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এত বড় মশহুর একটা ঘাঁটি হওয়া সত্ত্বেও দরবারের বিশিষ্ট উমরাহগণ রাজধানী ত্যাগ করে রাজ্যের এই এক প্রান্তে এসে পুনঃপুনঃ বৈঠক দেয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের উলুল-অমর নীরব, তখন বুঝলাম, আমার এ উম্মিদ কতখানি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যাক সে কথা। দুর্যোগের বুলন্দ গর্জনে তামাম মুলুক যেখানে তটস্থ, সেখানে কিছুই হুজুরের কর্ণগোচর না হলে ছুরি শানানোর তৎপরতায় দরবারের বারো আনাই যেখানে ব্যতিব্যস্ত, সেখানে কিছুই জনাবের দৃষ্টিগোচর না হলে সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য! আমি এ নিয়ে আর জনাবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। আমি শুধু বিনীতভাবে আরজ করে যাবো, কওমের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার হক কোন সুলতানের নেই। এ খেলা বন্ধ করুন জনাব! ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

আলী আশরাফের একটানা এই দীর্ঘ বক্তৃতা সুলতান নীরব হয়ে আগাগোড়া শুনলেন। তাঁর মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখে বোঝা গেলো প্রতিবাদ করার বা ক্ষীপ্ত হবার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। পক্ষে-বিপক্ষে কোন মন্তব্য না করে তিনি আলী আশরাফকে প্রশ্ন করলেন, ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক। আমার সালতানাত এখন চরম হুমকির সম্মুখীন। সেক্ষেত্রে আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে।

আলী আশরাফ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো, যদি একটা মাত্র আলী আশরাফকেও হাতের কাছে পেতাম, নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়তাম দুশমনের মোকাবেলায়।

ঃ অর্থাৎ?

আলী আশরাফ অনুনয়ের সাথে বললো, সুলতানকে আমি তকলিফ করতে বলবো না। আমার একান্ত আরজ, আমাকে শুধু একবার এযাযত দিন জাহাপনা, পাণ্ডুয়ার তামাম গদ্দার আর মতলববাজদের আজই আমি খতম করে দিয়ে আসি।

ঃ এবং এসে বলো, হুজুর আমাকে এযাযত দিন, ঐ মসনদে একটু বসি!

সুলতানের এ উক্তি আলী আশরাফের কলিজায় তীরের মতো বিঁধলো। সে আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে পাথর হয়ে গেলো। সুলতান ফের বললেন, তুমি এখন যেতে পারো। তবে তোমাকে আমি ভরসা দিচ্ছি যে, তোমার কথাগুলো আমি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার কোশেশ করবো। তোমার সাথে আমি যদি একমত হতে পারি, তলোয়ার যেন খাপমুক্ত থাকে! তোমাকেই তাহলে যেতে হবে দুশমনদের মোকাবেলায়। মসনদ তুমি চাইবে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো না।

আলী আশরাফ ধরা গলায় বললো, আলী আসগারকে আরো বেশী জানার চেষ্টা করলে সুলতান বাহাদুর সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন, কওমের খেদমত ছাড়া তাঁর রক্তে মসনদের কোন দাগ চিহ্নও নেই।

আলী আশরাফ উঠে দাঁড়ালো। সুলতান এবার ভারি গলায় বললেন, বিপদে আসগার চাচা শত বঞ্চনার মাঝেও আমার পাশ থেকে সরেনি। বিদায়ের আগে তার আওলাদকে এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আলী আশরাফ লহমা খানেক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বিলম্বে সব চিকিৎসাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় জনাব, হেকিমের সদিচ্ছার তোয়াক্কাই কিছু থাকে না।

কুর্নিশ করে আলী আশরাফ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো।

আট

হতাশা আর নিরুৎসাহে অবসন্ন আলী আশরাফ পরের দিনই ছত্রাদুর্গে রওনা হলো। এই পতনোন্মুখ ইমারতকে যে কিভাবে ধরে রাখা যায়, আলী আশরাফ সোচ করে তার কূলকিনারা পেলো না। চরম পন্থা সুলতানের না-পছন্দ। গাদ্দারদের প্রতি তাঁর দুর্বার মোহটা কিঞ্চিৎ কমজোর হয়ে পড়লেও সুলতানের দীল থেকে তা নির্মূল হয়ে যায়নি।

ষড়যন্ত্রের ধূম্রজাল ভেদ করে সুলতান তাঁর দুশমনদের পয়চান করতে পারবেন– এ আশাও ক্ষীণ। সুলতানের অনুভূতি সাবেক অবস্থায় ধরে রাখতে রাজা গণেশের এক লহমার তেলেসমাতিই যথেষ্ট। এমন একটা নাজুক অবস্থায় পড়তে হবে তাকে, বাংলা মুলুকে আসার আগে আলী আশরাফ তা কল্পনাও করেনি। দুশমনেরা খুব পরাক্রমশালী, হরকদম তাকে ভীষণ ঝুঁকির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে– এ আন্দাজ তার ছিলো। কিন্তু যে মসনদের হেফাজতি তার লক্ষ্য, সেই মসনদের মালিকই তার সবচেয়ে বড় বিপত্তি হবে– এটা কল্পনা করে কে!

দুর্গে ফিরে আলী আশরাফ তার প্রাথমিক কাজগুলো দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করলো। দুর্গের সেপাইরাই আলী আশরাফের নিজ বাহিনীর সেপাই। এদের সংগঠিত করার কাজে এক সহকারীকে লাগিয়ে দিয়ে সে পা বাড়ালো আব্দুল লতিফের মকানের দিকে।

জায়গীরদার আব্দুল লতিফের সেপাইদের আলী আশরাফের ফৌজের সাথে সামিল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত দৌলত খাঁ যেদিন ব্যক্ত করেন, সেইদিনই আলী আশরাফের দীলের কোণে একটা সম্ভাবনার আলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। আব্দুল লতিফের মকানে যাওয়ার আর কাজের বাহানায় সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার মওকা তার চোখের সামনে দীপ্ত হয়ে উঠে। অকারণে আর অহেতুক আলী আশরাফ যেতে পারে না সেখানে। তাতে লায়লা আকতার শংকার সাথে বিব্রতবোধ করবে। আব্দুল লতিফও মেহমানদারীর অনীহাসহ তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। কাজ নিয়ে গেলে আর কোন অস্বত্বির অবকাশ কোন পক্ষেরই থাকবে না।

দুর্গে ফেরার পর থেকেই আলী আশরাফ এই আগ্রহে উন্মুখ হয়েছিলো। প্রাথমিক কাজ শেষ করেই সে আব্দুল লতিফের মকানের দিকে রওয়ানা হলো।

সেখানে তার কাজটাও কম ছিলো না। জায়গীরদারদের ফৌজ মানে আনাড়ি সেপাইয়ের দল। কালে ভদ্রে জায়গীরদাররা তলব দেন সেপাইদের। প্রশিক্ষণ দেন কদাচিৎ। জমির বদলে সেপাই নেয়ার এ একটা আদি গলদ। লড়াইয়ের আগে এদেরকে পুরোদস্তুর ঝালাই করে নিতে হয়। ঝালাইটা অবশ্য আব্দুল লতিফেরই ইতিমধ্যে করে রাখার কথা। সে তা করে রাখলেও সেপাইদের বুঝে নিতে অনেক সময় লাগবে। একের জায়গায় একাধিক দিনও লাগতে পারে।

একটানা ছুটে এসে আলী আশরাফের ঘোড়া আব্দুল লতিফের দহলীজের সামনে এসে থামলো। ঘোড়া থেকে নেমে আলী আশরাফ তার ঘোড়াটাকে একটা খুঁটির সাথে বাঁধলো। তারপর সে ধীরে ধীরে দহলীজের দিকে এগুলো। ছত্রার জায়গীরদারের সুউচ্চ ইমারত! লায়লা আকতারের নানার আমলে তৈরি। বিরাট এক এলাকা জুড়ে গোটা মকানটার অবস্থান। বাগ-বাগিচা-ইমারতাদি নিয়ে মকানটি ছত্রা জায়গীরের ঐতিহ্য বহন করছে।

আলী আশরাফ এগুতেই একজন নওকর এসে সালাম দিয়ে বললো, হুজুরের কোথা

থেকে আগমন?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, ছত্রা দুর্গ থেকে। আমি ছত্রা দুর্গের মুহাফিজ।

নওকরটি ব্যস্ত হয়ে বললো, আসুন হুজুর, আসুন। মেহেরবানী করে তসরীফ রাখুন।

দহলীজে ঢুকতে ঢুকতে আলী আশরাফ বললো, তোমার মুনিব কোথায়? উনি কি উপরে?

ঃ আমার মুনিব?

ঃ হ্যাঁ, আব্দুল লতিফ সাহেব?

ঃ তিনি এখন মকানে নেই হুজুর, গোয়ালপাড়ায় গেছেন।

ঃ কেন, গোয়ালপাড়ায় কেন?

ঃ কি যেন জরুরী কাজ আছে হুজুর। একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, কেউ এলে তাঁকে দহলীজে বসিয়ে রেখো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরবো।

আলী আশরাফ কি যেন একটু চিন্তা করলো! তারপর বললো, আচ্ছা, ঝি-চাকর ছাড়া তোমার মুনিবের আর কে কে থাকেন এখানে?

ঃ হুজুরের বহিন আর আম্মা।

ঃ তাঁরা সবাই ভাল আছেন?

ঃ জি না হুজুর। আম্মা হুজুরের তরিয়ত খুব খারাপ। অনেকদিন ধরে তিনি বিমারে ভুগছেন। ইদানীং তাঁর বিমার খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। উনি হয়তো আর বাঁচবেন না হুজুর।

আলী আশরাফ চমকে উঠলো। বললো, সে কি! চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছো তোমরা?

ঃ কিছু করাই আর বাকি নেই। কত দাওয়াই খাওয়ানো হচ্ছে, কত হেকিম আসছে যাচ্ছে, কিন্তু দিন দিন খারাবী ছাড়া কোন খোশ আলামত আদৌ দেখা যাচ্ছে না।

ঃ বলো কি?

ঃ হ্যাঁ, হুজুর। এ মুলুকের কোন হেকিম আর বাদ নেই। একটু আগেও বুযুর্গ দুই হেকিম এসে দেখে গেলেন।

আলী আশরাফের দীল ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ভদ্র মহিলার কতই না আগ্রহ ছিলো তাকে একটু দেখার। সেই দেখা করার মওকা কি আর সে পাবে না! নওকরটি বললো, হুজুর মেহেরবানী করে তশরীফ রাখুন। আমার মুনিব অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন।

খানিকটা অজ্ঞাতেই আলী আশরাফ একটা কুরসীর উপর বসলো। নওকরটি ফের বললো, আপনি আরাম করুন হুজুর! আমি এক্ষুনি আপনার খেদমতে আবার আসছি।

নওকরটি বেরিয়ে গেলো। তার শেষের কথাগুলোর একটাও আলী আশরাফের

কর্ণগোচর হলো না। তার শুধু ভাবনা ঃ কি করবে সে এখন! চলে যাবে এখান থেকে? না যাবে একবার উপরে। আব্দুল লতিফ মকানে নেই। এই ফাঁকে গিয়ে একবার সাক্ষাৎ করা যায় কিনা! আবার তার ভাবনা– উপরের খবর কিছু না জেনে সেই যাওয়াই বা যায় ওখানে কি করে? ওরা ছাড়া অন্য লোকও তো থাকতে পারে ওখানে? যদি কেউ দেখে ফেলে? আবার আচানক ভাবে গেলে তারাই বা ভাববেন কি? তার আগমন বার্তা কাউকে দিয়ে লায়লা আকতারকে দিতে পারলে সুরাহা হয়তো হয় একটা। কিন্তু সে কথা সে বলবেই বা কাকে? এদের সাথে তার পরিচিতির তিল পরিমাণ আভাসও তো দেয়া যাবে না বাইরে।

এমন সময় ভেতর থেকে একটা বোরকা পরা ঝি এসে সালাম দিয়ে বললো, হুজুর আপনি উপরে আসুন। আপামনি তলব করেছেন আপনাকে।

আলী আশরাফ থতমত খেয়ে গেলো। বললো, আমাকে?

ঃ জি হাঁ।

দহলীজের সাথেই উপরে যাবার সিঁড়ি। আলী আশরাফ তৎক্ষণাৎ উঠে ঝিয়ের পেছনে হেঁটে সিঁড়ি ভাংতে লাগলো। লায়লা আকতার আর তার আম্মা এখানে থাকলেও এটা একটা শত্রুর মকান। কখন কোন মুসিবত হবে, কিছু বলা যাবে না। নিজের অজ্ঞাতেই তার একটা হাত অস্ত্রের উপরে এলো। অস্ত্রশস্ত্র যথাস্থানে আছে কিনা হাতখানা তা যাচাই করে নিলো।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে কয়েকটা মোড় ঘুরে ঝি তাকে বালাখানায় নিয়ে এলো। সেখানে তাকে বসিয়ে রেখে ঝিটা অন্দর মহলে চলে গেলো।

এই সেই বালাখানা। একটা প্রশস্ত হল ঘর। এই ঘরেই পাণ্ডুয়ার আখেরসহ অনেকের নসীব বিকিকিনি হয়। আলী আশরাফ একটা কুরসীর উপর বসে এসব কথা ভাবতেই বোরকা পরা লায়লা আকতার তার সামনে এসে দাঁড়ালো। সে ক্ষুব্দ কণ্ঠে বললো, শেষ পর্যন্ত পারলেনই না কথা রাখতে?

আলী আশরাফের দীল আনন্দে নেচে উঠলো। সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তা মানে–

লায়লা আকতার বললো, আমার খোঁজে আপনাকে এখানে আসতে বার বার নিষেধ করা ছিলো,তবু আপনি এলেন? আপনার মতো দানেশমান্দ্ ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব হলো কি করে? মুসিবত একটা না ঘটালেই নয়?

আলী আশরাফ ব্যস্তকণ্ঠে বললো, না মানে আমি তো তোমার খোঁজে আসিনি। তোমার ভাইজানের সাথে আমার কাজ আছে। তুমিই তো আমাকে উপরে ডেকে মুসিবত পয়দা করেছো।

ঃ ভাইজানের সাথে কাজ?

ঃ কামরূপের সাথে লড়াই আমাদের আসন্ন। তোমার ভাইজানের ফৌজ আমার অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। আমি সেই ফৌজ নিতে এসেছি।

লায়লা আকতার আশ্বস্ত হলো। প্রসন্নদীলে বললো, ও তাই নাকি? আমি তো ভাবলাম–

ঃ তোমার মুহব্বতে দীওয়ানা হয়ে আমি তোমাকে লুটে নিতে এসেছি! বলে আলী আশরাফ হেসে ফেললো।

লায়লা আকতার শরমিন্দা কণ্ঠে বললো–ধ্যেত্!

আলী আশরাফ সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললো, কিন্তু এভাবে এখানে আমাদের কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে? কেউ যদি দেখে ফেলে?

ঃ সে আশংকা আপাতত নেই। ভাইজানের ফিরতে অনেকটা বিলম্ব আছে। কোন ঝি-চাকরের উপরে আসার হুকুম নেই। যে নওকর আর ঝি আপনি দেখলেন এরা আমার অত্যন্ত অনুগত। এদের দ্বারা মুসিবত কিছু ঘটবে না।

ঃ নওকরটা কোথায় যেন গেলো! সে যদি আমার আসার কথা বলে বেড়ায়?

ঃ বলবে না। তাকে সমঝে দিতে ঝিটাকে ফের পাঠিয়েছি। সে দহলীজের দ্বার পাহারা দিতে থাকবে। কাউকে আসতে দেখলেই পয়গাম পাঠাবে উপরে।

ঃ তুমি এরই মধ্যে এতটা করে ফেলেছো?

ঃ এটুকু না করতে পারলে এখানে টিকে আছি কি করে? মকানটাতো মকান নয়, এটা একটা হিংস্র পশুর গহ্বর। শ্বাপদের পদচারণায় এ মকান সর্বক্ষণ গরম। অত্যন্ত সতর্ক না থাকলে যে কোন সময় চরম মুসিবত ঘাড়ের উপর চেপে বসবে।

ঃ তুমি শুধু হিম্মতওয়ালীই নও, বুদ্ধিমতিও বটে।

ঃ তোয়াজ করতে শুরু করলেন নাকি?

ঃ এটুকু না করলে কোন সুন্দরী আর এলেমদার সাহেবজাদী মফুত তার দীল কাউকে দেয়?

ঃ আপনি তালকানা হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু!

ঃ তাল আমার ঠিকই আছে। এবার তুমি বলো, আমি যে দহলীজে এসে বসে আছি, তুমি তা জানতে পারলে কি করে?

ঃ আমাকে চারদিকেই নজর রাখতে হয়। ছাদ থেকে দেখতে পেলাম কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ভাবলাম, কোন গাদ্দার। কিন্তু নিকটে আসতেই দেখতে পেলাম, গাদ্দার নয়, আপনি।

ঃ অর্থাৎ একটা গিদ্দর!

ঃ আমার বিশ্বাস, সেরেফ তামাসা করার সময় এটা নয়।

আলী আশরাফ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো। ম্লান হাসি হেসে বললো, জানি তা নয়। কিন্তু এ জিন্দেগীতে এ সময় আর কখনও আসবে কিনা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

এবার চাচী আম্মার কথা বলো। তিনি কেমন আছেন এখন?

ঃ তাঁর হালত দিন দিন খুব খারাবীর দিকে যাচ্ছে। বাঁচার আশাই আর তাঁর নেই।

ঃ তাঁর সাথে কি এখন একটু দেখা করা যায় না?

ঃ আমি সেইজন্যেই আপনাকে উপরে ডেকে এনেছি।

ঃ তাহলে শীগগির সে ব্যবস্থা করো। এত বড় মওকা আর হয়তো পাবো না।

ঃ আসুন–

আলী আশরাফকে নিয়ে লায়লা আকতার তার আম্মা লতিফা খাতুনের কক্ষে প্রবেশ করলো। আলী আশরাফ দেখলো, একটা পালঙ্কের উপর কয়েকখানা হাড় চাদর দিয়ে ঢাকা। বিশীর্ণ ও বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডল বাদে লতিফা খাতুনের মাথার উপরও আবরণ টেনে দেয়া। চোখ তার অর্ধোন্মিলিত। লায়লা আকতার পালঙ্কের পাশে একটা কুরসী পেতে আলী আশরাফকে বসতে দিলো। তারপর সে মায়ের কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চস্বরে বললো, আম্মাজান, উনি আপ্‌নাকে দেখতে এসেছেন।

লতিফা খাতুন আধো নিঁদে আধো জাগরণে ছিলেন। মেয়ের ডাকে তাঁর চোখ দুটি আস্তে আস্তে খুলে গেলো।

লায়লা আকতার আবার বললো, উনি আপনাকে দেখতে এসেছেন।

লতিফা খাতুন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কে?

ঃ ঐ যে, উনি। জৌনপুরের সেই সালারজাদা।

লতিফা খাতুন সচকিত হয়ে বললেন, সালারজাদা! কে? আলী আশরাফ?

লতিফা খাতুনের মরা দেহে নতুন শক্তি ফিরে এলো। কৈ, কোথায় আশরাফ? বলেই তিনি ধড়মড় করে উঠতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না।

আলী আশরাফ ব্যস্ত হয়ে বললো, আহা! করেন কি– করেন কি? উঠবেন না। এই যে আমি এখানে। আপনার একদম কোলের কাছে।

লায়লা আকতার তাঁকে ধরে শোয়ায়ে দিয়ে বললো, এই যে উনি। আপনি শুয়ে থেকেই কথা বলুন।

লতিফা খাতুনের নজর এবার আলী আশরাফের উপর নিবদ্ধ হলো। তিনি তাঁর অস্থিচর্মসার একখানা হাত টেনে এনে আলী আশরাফের মাথার উপর রাখলেন। তার চোখে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে আপ্লুতকণ্ঠে বললেন, আলী আশরাফ! তুমি এসেছো বাপজান? আহা! সেই যে কবে তোমাকে দেখেছি!

আলী আশরাফ ধরা গলায় বললো, চাচী আম্মা!

ঃ তোমাকে দেখার কত যে আকাঙ্ক্ষা আমার এই দীলে, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পাবো না। শেষ পর্যন্ত এই ধারণাই হলো যে, এই জিন্দেগীতে এ মুখখানা আর আমি

দেখতে বুঝি পেলাম না!

তিনি আলী আশরাফের মুখমণ্ডলে অবিরাম হাত বুলাতে লাগলেন। আলী আশরাফ বিহ্বল কণ্ঠে বললো, চাচী আম্মা!

ঃ কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কি শান দেখো, শেষ অবধি তিনি আমার সে উম্মিদ পূরণ করে দিলেনই!

লতিফা খাতুনের চোখ দিয়ে আঁসু ঝরে পড়লো। আলী আশরাফ বললো, আপনি পেরেশান হবেন না চাচী আম্মা। আপনার অবস্থা খুব খারাপ। এ অবস্থায় চঞ্চল হলে মুসিবত ঘটতে পারে।

লতিফা খাতুন ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, বালামুসিবতের এখন আমি অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি বাবা। আমি খোলাসাভাবে বুঝতে পারছি, আর সময় আমার নেই। এই মুহূর্তে তোমাকে পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার, জবানে তা আমি প্রকাশ করতে পারবো না। আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর, তিনি আমার তামাম উম্মিদ পূরণ করে দিলেন।

এক সঙ্গে এত কথা বলে লতিফা খাতুন হাঁপাতে লাগলেন। একটু দম নিয়ে ফের তিনি বললেন, লায়লা আকতার, এদিকে একটু কাছে আয় তো মা।

লায়লা আকতার আলী আশরাফের কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি লায়লা আকতারের ডান হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আলী আশরাফের হাতের উপর রাখতে রাখতে বললেন, আর হয়তো সময় পাবোনা বাপজান! এটাকে আগাগোড়া তুমিই হেফাজত করেছো, তুমিই একে ইয্যতের সাথে মানুষ হওয়ার মদদ জুগিয়েছো, এই অভাগী মেয়েটার আখেরী হেফাজতির দায়িত্ব তোমার উপরই দিয়ে গেলাম। তোমার চেয়ে এর বেশী আপন এই দুনিয়ায় কেউ নেই। বাপ-ভাইয়েরা থেকেও এর নেই। একে যেন তুমি ফেলে দিয়ো না বাপজান!

উভয়ের হাতের স্পর্শে উভয়ের দীল বিদ্যুৎপৃষ্টের ন্যায় এক অনবদ্য শিহরণে অবশ হয়ে গেলো। মোহাবিষ্টের মত লহমা কয়েক নিশ্চল হয়ে থাকার পর লায়লা আকতার তার হাতখানা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে শরমিন্দা কণ্ঠে বললো, ছিঃ আম্মা, আমাকে গুনাহগারী করবেন না। উনি এখনও বেগানা।

লতিফা খাতুনের ক্লিষ্ট মুখে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, সবই দীলের ব্যাপার মা! সাফ দীল আর পাক নিয়াত কাউকে কখনও গুনাহগার করে না।

আলী আশরাফ অজ্ঞাতেই বলে উঠলো, আম্মাজান!

ললিফা খাতুন বললেন, ছেলেকে পেয়ে ভাবলাম, এই অভাগীর গতি হলো একটা, এর উম্মিদ ভাইয়েই পূরণ করবে। কিন্তু এখন দেখছি, গতি তো নয়, চরম এক দুর্গতির

মধ্যে রেখে যাচ্ছি মেয়েটাকে। যত শীগগির সম্ভব তুমি একে এখান থেকে সরিয়ে নাও বাপজান। এই দুর্গতি থেকে মুক্ত করো অভাগীকে।

ইতিমধ্যে ছাদ থেকে ঝিটা ছুটে এসে বললো, আপামণি, সাহেব ফিরে আসছেন। মকানের একেবারে নযদিকে এসে গেছেন!

নওকরটাও ছুটতে ছুটতে দরজার পাশে এসে ঐ একই পয়গাম দিলো। আলী আশরাফ আর লায়লা আকতার এক সাথে চমকে উঠলো। লায়লা আকতার বললো– আম্মাজান, ভাইজান এসে গেছেন। এঁকে এখনই সরিয়ে নিতে হবে।

লতিফা খাতুন ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, এ্যাঁ! তাই নাকি? যাও – যাও, শীগগির একে দহলীজে নিয়ে যাও। আব্দুল লতিফ কিছুই যেন বুঝতে না পারে!

আলী আশরাফকে নিয়ে নকরটি সঙ্গে সঙ্গে দহলীজে নেমে এলো। আলী আশরাফকে একটা কুরসীর উপর বসিয়ে তারা বাত চিৎ জুড়ে দিলো। ভাবখানা এই যে, আলী আশরাফ এই মাত্র মকানে এসে পৌঁছেছে।

আলী আশরাফ বললো, ওহো, তোমার নামটাতো জানা হয়নি?

জওয়াবে নওকরটি বললো, গোলামের নাম আদম আলী হুজুর।

ঃ তোমার মকান?

ঃ এই বাংলা মুলুকের একদম পশ্চিম সীমানায়।

ঃ তোমার সাহেবের কি ফিরতে এখনও দেরী হবে?

ঃ বেশী দেরী হবে না হুজুর। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে যাবেন।

ইতিমধ্যেই আব্দুল লতিফ দহলীজের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। তা লক্ষ্য করে আদম আলী উচ্চ কণ্ঠে বললো, ঐযে হুজুর, আমার মুনীব এসে গেছেন।

বাইরে ঘোড়া দেখেই আব্দল লতিফ বুঝেছিলো, মেহমান কেউ তার এন্তেজারে আছেন। এ ছাড়া আদম আলীর কথাটাও সে শুনতে পেলো। দহলীজে ঢুকতে ঢুকতে সে হাঁক দিয়ে বললো, আদম আলী, কে এসেছেন?

আদম আলী দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, ছত্রাদুর্গের মহাফিজ সাহেব হুজুর। তিনি আপনার সাথে মোলাকাত করতে এসেছেন।

আব্দুল লতিফের দীল নাখোশ হয়ে গেলো। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে সে হাসতে হাসতে দহলীজে প্রবেশ করলো এবং মোসাফাহার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আরে, এই যে আপনি! কখন এসেছেন?

মোসাফেহা করতে করতে আলী আশরাফ বললো, এই তো একটু আগে।

আলী আশরাফের পাশের এক কুরসীতে বসতে বসতে আব্দুল লতিফ বললো, বলুন, কি খেদমত করতে পারি আপনার।

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, অন্য কিছুই নয়। আপনার সেপাইদের ব্যাপারে–

ঃ ও, হ্যাঁ, ওদের আমি তালিম দিয়ে তৈরি করে রেখেছি। পাণ্ডুয়া থেকে ফিরে আসতে আপনার দেরী দেখে ওদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি। আগামী কালই ফিরে আসবে সবাই। ফিরে এলে আমি নিজে তাদের আপনার দুর্গে পৌঁছে দেবো।

ঃ আপনার অশেষ মেহেরবানী।

ঃ ও জন্যে কিছু ভাববেন না। ওরা খুবই সুশৃঙ্খল। দেখবেন, আমার ফৌজ তামাম ফৌজের চেয়ে কেমন চোখা আর হিম্মতদার!

ঃ বহুৎ খুব!

আব্দুল লতিফ এবার মৌখিক ভদ্রতার খাতিরে আদম আলীকে বললো, আরে মেহমানকে শুধু শুধু বসিয়ে রেখছো কেন? নাস্তা পানির ব্যবস্থ কিছু করো!

আলী আশরাফ নড়ে চড়ে বললো, আপনার খোশ নিয়াতের শোকর গোজারি করছি। কিন্তু ভাই সাহেব, আমার আর এক লহমাও অপেক্ষা করার ফুরসৎ নেই। আপনি মেহেরবানী করে আপনার ফৌজ পৌঁছে দিতে না চাইলে আর এখনই তা বুঝে নিতে বললে, আমি মাফি চেয়ে বলতাম, আগামী কাল আসবো আবার।

ঃ আচ্ছা?

ঃ আমি আজ সেরেফ খবরটা নেয়ার জন্যেই এসেছিলাম।

ঃ তাহলে––

ঃ মেহেরবানী করে আজ আমাকে ওঠার এযাযত দিন। আর একদিন এসে আপনার মেহমানদারি কবুল করবো।

ঃ যা আপনার মর্জি।

আব্দুল লতিফ আর পীড়াপীড়ি করলো না। সে খাহেশ তার ছিলো না। আলী আশরাফ বেরিয়ে এসে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

লায়লা আকতারের হাতের পরশ আলী আশরাফের হাতে তখনও উষ্ণ। সেই হাতে তলোয়ার ধরে রণাঙ্গনে ছুটে চলেছে আলী আশরাফ। নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে আগে ছুটছেন দৌলত খাঁ, তার পেছনে আলী আশরাফ আর সবার শেষে আতা খাঁ। আব্দুল লতিফের চোখা ও হিম্মতদার ফৌজ নিয়ে আলী আশরাফের হয়েছে এক বিপত্তি। অনভ্যস্ত কামিন মজদুর নিয়ে তৈরি এই ফৌজ না পারছে আলী আশরাফের নিজ বাহিনীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, না পারছে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। তাল-গোল পাকিয়ে তারা এলোপাতাড়ি ছুটছে আর আতা খাঁর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছে। একটানা পাণ্ডুয়ার ফৌজ এসে কামরূপের সীমান্তবর্তী কুণ্ডালীর ময়দানে ছাউনি ফেললো। আর মাত্র রশি কয়েক পর থেকেই কামরূপ রাজ্যের শুরু। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখলো, সীমান্ত একদম ফাঁকা। কামরূপ রাজ্যে তাদের প্রবেশ পথে বাধা দেয়ার

মতো ক্রোশখানেকের মধ্যেও কোন সেপাই নেই।

রাত্রিটা তাঁবুর মধ্যেই কেটে গেলো। সবেরেই তাদের ফৌজ কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করবে আলী আশরাফের এই ধারণাই ছিলো। কিন্তু আলী আশরাফের সে ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করে দুপুর তক তামাম ফৌজ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলো। আলী আশরাফ দৌলত খাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন, চর পাঠিয়ে খোঁজ-খবর না নিয়ে অন্য রাজ্যে ফৌজ হাঁকিয়ে তিনি বিপদে পড়তে রাজী নন।

এই কুণ্ডালীর আশেপাশেই রাজা গণেশের থাকার কথা। সে ব্যাপারেও দৌলত খাঁর কোন উৎসাহ দেখা গেলো না। আলী আশরাফ গোপনে তার বাহিনীর কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিশ্বস্ত চরকে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিলো। সাঁঝওয়াক্তে দৌলত খাঁ এলান দিলেন, সীমান্তের ওপারে পোয়া ক্রোশের মধ্যেই কামরূপের বিপুল বাহিনী খাদকেটে ওৎ পেতে বসে আছে। ওদের পরিমাণ ও অবস্থান ঠিক ভাবে না জেনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কয়েকদিন তাদের এখানেই থাকতে হবে।

সন্ধ্যার খানিক পরই আলী আশরাফের প্রেরিত চরেরা ফেরত এলো। তারা জানালো, সীমান্ত থেকে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে কামরূপ রাজ্যের কোথায়ও কোন সেপাই ফৌজের চিহ্ন নেই। দৌলত খাঁ প্রদত্ত এলান সম্পূর্ণ মিথ্যা। কামরূপের তামাম ফৌজ অহোম রাজকে সামাল দিতেই পেরেশান। তারা অহোমের সীমান্তেই মহাব্যস্ত আছে। এদিকে নজর দেয়ার সময় ও সাধ্য আদৌ তাদের নেই।

আলী আশরাফ মোটেই অবাক হলো না। যে রকমটি হওয়ার কথা ঠিক সেই রকমই হচ্ছে। ব্যতিক্রম কিছুই ঘটেনি। সে আর উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ বসে রইলো।

আর একটা দিন কেটে গেলো। এরপর আরেক দিন। তার পরের দিন আধা ক্রোশের মধ্যে কয়েকজন সেপাইকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলো। আতা খাঁ গোপনে নিজে গিয়ে দেখে এলো– এদের সংখ্যা এত কম এবং প্রস্তুতি এত নিম্নমানের যে, তাদের যে কোন একজনের বাহিনীর যে কোন এক অংশের সামনে এদের কয়েক লহমার অধিককাল টিকে থাকার সাধ্য নেই।

আতা খাঁ আলী আশরাফকে বললো, কি করা যায় এখন বলুন তো ভাই সাহেব? লড়াই করতে এসে জয় নিশ্চিত জেনেও তাঁবুর মধ্যে আর শুয়ে থাকি কতদিন?

আলী আশরাফ বললো, ফৌজদার সাহেব, ব্যাপারটা যে এমনি হবে, এতো জানা কথা। সামান্য সন্দেহ যা একটু ছিলো, তাও এখন কেটে গেলো। শত্রুর সাথে না লড়েই সোলতানী ফৌজ পরাজিত হয়ে এখান থেকে ওয়াপস যাবে– এই হচ্ছে নীল নক্সা। সম্ভব হলে কামরূপের ফৌজ ডেকে নিয়েই পাণ্ডুয়ায় ফিরে যাবে দৌলত খাঁ।

ঃ তাহলে আমরা এখন করবো কি?

ঃ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করে নিয়ে সতর্কভাবে চুপচাপ এন্তেজারে থাকুন। এরপর দেখা যাক পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়।

ঃ লড়াই যদি আদৌ না করতে হয় আমাদের, তাহলে আর আমরা শুধু শুধু–

আতা খাঁকে থামিয়ে দিয়ে আলী আশরাফ বললো, আমার যা আন্দাজ, তাতে লড়াই আমাদের করতেই হবে ভাই সাহেব। অত্যন্ত মারাত্মক এক লড়াই লড়তে হবে আমাদের। দৌলত খাঁ তার তরবারি রাঙ্গা করে না নিয়ে এখান থেকে যাবে না।

ঃ কি রকম?

ঃ কামরূপের ফৌজ যেদিন শক্তিশালী হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে, সেদিন এগিয়ে যাওয়ার হুকুম আমরা পাবোই। সেদিন একদিকে কামরূপের ফৌজ অন্যদিকে দৌলত খাঁর অধীনে তামাম সুলতানী ফৌজ – এই দুই ফৌজের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়ের জন্যে না হলেও বাঁচার জন্যেই প্রাণপণে লড়তে হবে আমাদের।

ঃ মুহাফিজ সাহেব!

ঃ আমাদের খতম করার এত বড় মওকা দৌলত খাঁ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

আতা খাঁ অবাক হয়ে একদৃষ্টে আলী আশরাফের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এরপর বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আপনার আন্দাজ আর আমার আন্দাজ যে একদম মিলে যাচ্ছে ভাই সাহেব! কয়দিন ধরে এমন একটা পরিস্থিতির আশংকা আমিও চিন্তা করছি। সেই সাথে ভাবছি, এক কাজ করি– আমরা না হয় আমাদের ফৌজ নিয়ে ফিরে যাই!

আলী আশরাফ ম্লান হাসি হেসে বললো, একেবারে নাবালকের মতো কথা বললেন ভাই সাহেব। এই বাংলা মুলুকের সীমানা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে অবশ্য মুসিবত নেই। কিন্তু পাণ্ডুয়ায় ফিরে গেলে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে দু'জনকেই। লড়াই এর আগেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করার কসুর কেউ মাফ করবে না।

পরের দিন দৌলত খাঁকে সবাই মিলে তাকিদ দিলো। দৌলত খাঁ এবার নয়া বাহানা ধরলেন। বললেন, রাজা গণেশ নিশ্চয়ই কামরূপ রাজ্যের মধ্যেই দুশমনদের শক্তির হদিস করে বেড়াচ্ছেন। তিনি ফিরে না আসা তক কাউকেই এক ধাপও সামনে যাবার এযাযত দেয়া যাবে না।

রাজা গণেশ একদিন সত্যি সত্যিই ফিরে এলেন। এসেই তিনি দৌলত খাঁকে ডেকে কি কি যেন বুঝিয়ে দিলেন! তারপর সবাইকে ডেকে বললেন, আর দু'এক দিনের মধ্যেই এগিয়ে যাবে তোমরা। দুশমন এখন একেবারেই কমজোর। আর দিন দুয়েক পর তোমরা এগুলে তোমাদের রোখার মতো কোন তাকদই তাদের থাকবে না।

রাজা গণেশ সেইদিনই পাণ্ডুয়ায় ফিরে গেলেন। আলী আশরাফ এ সম্বন্ধে নিশ্চিত

হওয়ার জন্যে তার চরদের আবার কামরূপে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। একদিন এক রাত অমানুষিক খেটে এবং চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আলী আশরাফের চরেরা তথ্য সংগ্রহ করে ছাউনিতে ফিরে এলো।

আলী আশরাফ জিজ্ঞেস করলে তাদের মুখপাত্র বললো, ভয়ানক দুঃসংবাদ হুজুর! দুশমনদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ আর দুর্বার মনোবল লক্ষ্য করা গেছে।

আলী আশরাফ অবাক হয়ে বললো, এটা কি করে সম্ভব? তারা তো এখন অহোমের বিরুদ্ধে লড়তেই পেরেশান হয়ে আছে।

ঃ না জনাব। সে লড়াই আর এখন নেই। ওটা আকস্মিকভাবে থেমে গেছে।

ঃ থেমে গেছে!

ঃ জি হাঁ। অহোমরাজ আর দুশমন নয় কামরূপ রাজের। তিনি এখন কামরূপ রাজের জামাই।

ঃ কি বলছো?

ঃ ঘটনা সত্য জনাব। সঠিকভাবে সন্ধান নিয়ে আমরা জেনেছি, অহোমরাজের সাথে কামরূপ রাজ তার কন্যার বিয়ে দিয়ে আচানকভাবে তাদের গোলমাল রফা করে নিয়েছে। এখন অহোমরাজ আর কামরূপরাজ একত্রে দুই মুলুকের তামাম ফৌজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে।

নিজের সব অনুমান এমন ঠিক ঠিকভাবে ফলতে দেখে আলী আশরাফ নিজের কাছে নিজেই তাজ্জব বলে গেলো। সেই সাথে ভাবতে লাগলো রাজা গণেশের ঐ নির্জলা মিথ্যাচারের কথা আর কামরূপ রাজ্যে তার এতদিন হারিয়ে থাকার কারণটা। মোকসুদ হাসিল করে তবেই ফিরে এসেছে ধড়িবাজ!

খবর দিয়ে গুপ্তচরেরা চলে গেলো। খানিকপর আতা খাঁকে ডেকে এনে খবরটা ব্যাখ্যা করে শুনিয়ে আলী আশরাফ বললো, তৈয়ার হয়ে যান ফৌজদার সাহেব, সেই মহাতুফান এবার আমাদের নযদিকে এসে গেছে। দীল্টাকে এবার শক্ত করে নিন। আর দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের নসীবের চরম পরীক্ষা শুরু হবে।

আতা খাঁ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আল্লাহ ভরসা! রাখে আল্লাহ, মারে কে?

অত্যন্ত সজাগ হয়ে তারা সেই তুফানের এন্তেজার করতে লাগলো।

* * *

রাজা গণেশ সীমান্ত থেকে পড়িমরি পাণ্ডুয়ায় ওয়াপস্ এসেই চূড়ান্ত বৈঠক দিলেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা। রাজা গণেশ জানালেন– তাঁর

কামরূপ যাত্রা সর্বোতভাবে সফলকাম হয়েছে। অহোমরাজ আর কামরূপ রাজের মধ্যে একটা অত্যন্ত সন্তোষজনক সম্পর্ক স্থাপনে তিনি কামিয়াব হয়েছেন। তারা এখন কেউ করো দুশমন নন। এখন তারা শ্বশুর-জামাই। দুই রাজ্যের বাহিনী এখন একজোটে সুলতানী ফৌজের মোকাবেলায় ছুটে আস্‌ছে। এদিকে আছেন সালার দৌলত খাঁ সাহেব। পরিস্থিতি যা তৈরি করে এসেছি, তাতে কুণ্ডালীর মাঠই হবে আলী আশরাফ আর আতা খাঁর গোরস্তান। ওখান থেকে সুলতানের পক্ষে আর একখানা তলোয়ারও পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসবে না। ফিরে যে সব আসবে, তা তামামই হবে জনাবে আলা শাহজাদার হাতিয়ার! বিবরণ শুনে শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজা রাজা গণেশের একটানা গুণগান করলেন। এর পর বললেন–রাহা তো তাহলে পরিষ্কার। এখন দৌলত খাঁ সাহেব ওয়াপস্ এলেই আমরা একযোগে চূড়ান্ত আঘাত হানবো।

রাজা গণেশ বললেন, না। দৌলত খাঁর ওয়াপস্ আসার এন্তেজারে বসে থাকলে চলবে না। চূড়ান্ত আঘাত হানার এখনই মোক্ষম সময়। এর চেয়ে বড় মওকা আর আমাদের আসবে না। সুলতান এখন একদীলে কামরূপের জয় পরাজয়ের এন্তেজারে আছেন। অন্যকোন চিন্ত-ভাবনাই তাঁর মগজে নেই এখন। ওখান থেকে দৌলত খাঁ যখন ফিরে আসবেন তখন ফলাফলটাও আসবে। দৌলত খাঁ পাণ্ডুয়ায় পৌঁছার আগেই তা আসবে। আর ফলাফল যখন আসবে তখন শুধু বিপর্যয়ের খবরটাই আসবে না, কেন বিপর্যয় হলো, সে খবরও আসবে। প্রকাশ্য ময়দানে দৌলত খাঁর ভূমিকাটা পাণ্ডুয়ার তামাম ফৌজ আর সুলতানের গুপ্তচর ছাড়াও হাজার জনে জানবে। ফলে তার মতলবের সাথে আমাদের তামাম মতলব ফাঁস হয়ে যাবে।

সকলেই সমস্বরে বললো, ঠিকই তো, ঠিকই তো।

রাজা সাহেব বলেই চললেন, আর তা ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে প্রজ্জ্বলিত দাবানলের মতো সুলতান তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেন। জহিরুদ্দীনের সাথে শাহী মহলের ফৌজসহ নিজেই তিনি আমাদের বিরুদ্ধে ছুটে আসবেন খোলা তলোয়ার হতে নিয়ে।

এ কথায় শাহজাদা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, রাজা সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন। সে ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটারই আশংকা পূর্ণ পরিমাণ। তাঁকে কিছু বুঝতে দেয়ার আগেই আমাদের আকস্মিকভাবে কাজ হাসিল করতে হবে।

মুরাদ বেগ বললো, তাহলে আদেশ দিন আলীজা! আমাদের ফৌজ নিয়ে এখনই আমরা জহিরুদ্দীনেকে ঘিরে ফেলি। তাকে খতম করে হামলা চালাই শাহীমহলের উপর অযথা অপেক্ষা করা ঠিক নয়। বিলম্বে অনেক বিপত্তি ঘটতে পারে।

শাহজাদা রাজা গণেশের মুখের দিকে চাইলেন। ভরত সিং, শ্রী মাধব, আরব আলী প্রমুখ সহকারী সালারেরা মুরাদ বেগকে সমর্থন দিয়ে বললো, ঠিক ঠিক। মুরাদ বেগ সাহেবের কথা আমরাও সমর্থন করি। আদেশ দিন আলীজা, আমরা তৈয়ার।

উজির মিয়া মোস্তাক বললেন, ভাল করে ভেবে দেখো। জহিরুদ্দীনের বাহিনীটাকে তুচ্ছ ভাবার কারণ নেই। তালিম দিয়ে দিয়ে জহিরুদ্দীন তার সেপাইদের ইস্পাত বানিয়ে রেখেছে। এ ছাড়া সুলতান বাহাদুরের নিরাপত্তা বাহিনীতেও সেপাইয়ের সংখ্যা কম নয়। এর সাথে আছে মহলরক্ষী সেপাই শান্ত্রী। এদের সবাইকে তোমরা এঁটে উঠতে পারবে কি না, সেটা আগে খুব ভাল করে ভেবে দেখো। সবার সাথে আমিও একমত যে, এই সময়টাই কাজে লাগাতে হবে। এর অপচয় করা চলবে না। কিন্তু এই পথেই যাবো আমরা, না অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করবো, সেটা আরো সোচ্ করে দেখা উচিত।

শাহজাদা বললেন, আপনি বিজ্ঞ লোক। আপনার সুচিন্তিত মতামত কিছু থাকলে তা ব্যক্ত করুন।

মিয়া মোস্তাক বললেন, মতামত আমার আলাদা কিছু নয়। হৈ চৈ করে এইভাবে এগিয়ে কামিয়াব হওয়া যাবে কি না, সে সম্বন্ধে আগে সুচিন্তিত হতে হবে। যদি কোন কারণে এই পথে ব্যর্থ হই আমরা মোকসুদ হাসিল পড়ে মরুক, আমাদের লাশগুলোর সদগতির আশাটুকুও থাকবে না। সবগুলো ভাগাড়ের শেয়াল কুকুরের পেটে যাবে।

উপস্থিত সৈন্যাধক্ষেরা তাদের কামিয়াবী সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করলেন। কিন্তু রাজা গণেশ ভিন্নপথ ধরলেন। বললেন, আপনাদের হিম্মত সম্বন্ধে আমার কোন খাটো ধারণা নেই। তবু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বলের চেয়ে বুদ্ধি সব সময়ই বড়। বুদ্ধি থাকতে বল খাটানোর পক্ষপাতী আমি নই।

শাহজাদা অধৈর্য হয়ে বললেন, তাহলে সে বুদ্ধির কথাটা সরাসরি ব্যক্ত করুন না আপনার। ফালতু সময় নষ্ট করছেন কেন?

রাজা গণেশ বিনয়ের সাথে বললেন, আলীজা, আপনার অভয় না পেলে সেটা আমাদের বলার সাধ্য নেই।

শাহজাদা জোর দিয়ে বললেন, বলুন, কোন সংকোচ করবেন না।

ঃ কাজটার কিছুটা দায়িত্বও যদি আপনি মেহেরবানী করে নেন, তাহলে বলাটা আরও সহজ হয়।

শাহজাদা অত্যধিক অস্থির হয়ে বললেন, আপনারা অকারণেই আমার ধৈর্যের উপর জুলুম পয়দা করছেন। বলুন, কি করতে হবে আমাকে? মোকসুদ হাসিলের জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতেও তৈয়ার।

রাজা গণেশ এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন, সুলতানকে গুপ্ত হত্যা করতে হবে। তাঁকে হত্যা করার পরপরই আপনাকে মসনদে বসতে হবে। নিজেকে পাণ্ডুয়ার সুলতান হিসাবে ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই জহিরুদ্দীনকে পদচ্যুত করে তাকে নিরস্ত্র করতে হবে। সুলতান হিসাবে মসনদে একবার বসলে আর কোন সেপাই-সৈন্য বিরোধিতা করার

সাহস করবে না। যেহেতু মসনদের আর কোন উত্তরাধিকার নেই, সেহেতু আপনাকে মসনদে দেখলে কেউ বিরোধিতা করতে আসবেও না। এছাড়া মসনদ আপনাকে পেতে হলে সুলতানকে হত্যা করেই পেতে হবে, তাঁর জীবদ্দশায় পাবেন না। সুতরাং এই পথে এগুলে একটি মাত্র হত্যার মাধ্যমেই নির্ঝঞ্ঝাটে সব ফায়সালা হয়ে যায়। আর কোন মুসিবতের মোকাবেলাই করতে হয় না।

শাহজাদা লাফিয়ে উঠে বললেন, এটা তো আমারই দীলের কথা। এ নিয়ে এতো সংকোচ করছেন কেন? লড়াই করে কামিয়াব হওয়ার পরও তো তাঁকে হত্যা না করলে মসনদ আমি পাবো না। কয়েদ করে রেখে মসনদে বসলে নিজের কবর খুঁড়ে রেখেই মসনদে বসা হবে। বলুন, এ ব্যাপারে কি আমাকে করতে হবে! ছুরি হাতে নিজেই আমি--

বিনয়ে গলে গিয়ে রাজা গণেশ বললেন, তওবা, তওবা! আপনি নিজের হাতে তা করতে যাবেন কেন? আপনার মদদটাই যথেষ্ট। শাহী মহলের সেপাই শান্ত্রীদের আর সুলতানের নিরাপত্তা বাহিনীকে হাত করার ব্যাপারে আপনার অগ্রণী ভূমিকা দরকার। সেই সাথে শাহী মহলের মধ্য থেকেই ঘাতক বাছাই করতে হবে। বাইরের কোন ঘাতক গিয়ে তাল করতে পারবে না। এই গুপ্ত ঘাতক বাছাইয়ের ব্যাপারেও আপনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দরকার। এটুকু করলে, আমরা নিজেরাই কাজ উদ্ধার করে দেবো।

অত্যন্ত উৎসাহের মধ্য দিয়ে সুলতানকে গোপনে হত্যা করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো। কথা হলো, শাহজাদার সাথে রাজা গণেশ এ ব্যাপারে আলদাভাবে বসবেন এবং যথাসত্বর সম্ভব, কাজ উদ্ধার করবেন।

* * *

কুণ্ডালী ময়দানের ওপারে কামরূপের এলাকা রাজা গণেশের প্রত্যাবর্তনের পর আরো দিন দুয়েক যেমন নীরব ছিলো, তেমনই নীরব ও নির্জন হয়েই রইলো। তৃতীয় দিন ঐ এলাকা সোচ্চার হয়ে উঠলো অগণিত সেপাইয়ের পদচারণায় ও তুমুল রণবাদ্যে। অহোমরাজ আর কামরূপরাজ তাদের বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে কুণ্ডালী থেকে আধাক্রোশ দূরে সারি সারি ছাউনি ফেলে রণহুংকার হাঁকতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষ এসে তাদের অবস্থান শক্ত করে না নেয়া তক দৌলত খাঁর কোন তৎপরতাই রইলো না। আলী আশরাফ আর আতা খাঁর পুনঃপুনঃ তাকিদ ও প্রতিবাদের মুখে তিনি শুধু টালবাহানা করে কাল কাটিয়ে গেলেন। অবশেষে যখন দুশমনেরা সগর্জনে পাণ্ডুয়ার ছাউনির দিকে রওনা হলো, দৌলত খাঁ তখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সেপাইদের তৈরি হতে বললেন। আলী আশরাফ আর আতা খাঁকে ডেকে বললেন, আলী আশরাফ সাহেব, আপনি আপনার ফৌজ নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যান। সামনাসামনি হামলা না করে দক্ষিণ দিক থেকে এসে দুশমন বাহিনীর দক্ষিণ প্রান্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন আপনি। আর আতা খাঁ সাহেব, আপনি উত্তর দিকে গিয়ে দুশমন বাহিনীর উত্তর প্রান্তের উপর হামলা সৃষ্টি করবেন। আমি আমার ফৌজ নিয়ে

মাঝখানে দুশমনের একদম মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছি। সম্মুখ ভাগের তামাম এলাকা একাই আমি দেখবো। যান আপনারা, এক্ষুণি রওনা হন।

দুশমনের মুখোমুখী দাঁড়ানোটা সব চেয়ে অধিক ঝুঁকির ব্যাপার। দৌলত খাঁ নিজে এই ঝুঁকি নিতে আগ্রহী দেখে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ তাজ্জব বনে গেলো। এত বড় দরাজদীল তিনি নন যে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এই ঝুঁকি নিজেই নিচ্ছেন তিনি। এর মধ্যে যে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে দৌলত খাঁর, তার তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো। কিন্তু তবু তারা নিরুপায়। এ লড়াইয়ের সিপাহসালার দৌলত খাঁ। তাঁর নির্দ্দেশ্যই চূড়ান্ত । প্রতিবাদ এখানে অর্থহীন। কাজেই তারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রওনা হলো।

শুরু হলো লড়াই। ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো আলী আশরাফ আর আতা খাঁ শত্রু বাহিনীর উভয় পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুই দলে তুলকালাম লড়াই চলতে লাগলো। আলী আশরাফ আর আতা খাঁর প্রচণ্ড মারের মুখে উভয় প্রান্তের দুশমনেরা অধিকক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। তারা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে মাঝের দিকে সরে আসতে লাগলো। মধ্যভাগে দণ্ডায়মান দৌলত খাঁর সেপাইদের তামাম তরবারি তখনও খাপবদ্ধ থাকায় দুশমন বাহিনী বিনা বাধায় সামনের দিকে এগুতে লাগলো। দুইপ্রান্তের পিছু হটা দুশমনেরাও মাঝখানে সরে এসে ক্রমেই সামনের দিকে এগুতে শুরু করলো। এহেন প্রক্রিয়ায় আলী আশরাফ আর আতা খাঁ ক্রমেই শত্রু বাহিনীর পেছনের দিকে পড়তে লাগলো। এই প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ চলার পর দেখা গেলো, শত্রু বাহিনী সামনের দিকে সরতে সরতে সীমান্ত পার হয়ে বাংলা মুকুকে ঢুকে দৌলত খাঁর ফৌজের সাথে এক কতারে দাঁড়িয়েছে আর আলী আশরাফ ও আতা খাঁ নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে কামরূপের জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়ালো যে, আলী আশরাফ আর আতা খাঁর ফৌজই যেন কামরূপ রাজের ফৌজ। আর দৌলত খাঁর ফৌজের সাথে এক কাতারে সামিল অহোম আর কামরূপের ফৌজই যেন বাংলার সুলতানী ফৌজ।

লাড়াইয়ের মোড়টাও সেইভাবেই ঘুরলো। পলকের মধ্যে দৌলত খাঁর সেপাইদের খাপবদ্ধ তলোয়ার খাপ মুক্ত হয়ে সূর্যালোকে ঝল্‌সে উঠলো। এরা দুশিমনদের সাথে এক হয়ে সবাই মিলে আলী আশরাফ আর আতা খাঁর ফৌজকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। দৌলত খাঁর ফৌজ শত্রু দলে যোগ দেয়ায় শত্রুবাহিনী আকারে এত বৃহৎ হলো যে, সে তুলনায় আশরাফ-আতার ফৌজ হাতির সামনে মুষিকের মতো নগণ্য হয়ে গেলো। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পলায়ন উদ্যোগ করলেও আশী আশরাফ আর আতা খাঁকে এখন শত্রু রাজ্যের আরো গভীরে ঢুকতে হয়। স্বদেশে প্রত্যবর্তনের কোন রাহাই আর তাদের সামনে নেই। অহোম রাজের সেনাপতি, কামরূপ রাজের সেনাপতি আর দৌলত খাঁ স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে একযোগে আলী আশরাফ আর আতা খাঁকে লক্ষ্য করে ক্রমেই সামনাসামনি হতে লাগলো।

পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ায় আলী আশরাফ আর আতা খাঁ মরিয়া হয়ে উঠলো। আলী আশরাফ বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, ভাইসব! আমরা এক চরম বেঈমানীর সম্মুখীন। আমরা এখন দুশমনের রাজ্যে অগণিত দুশমনদের আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। বেঈমান দৌলত খাঁও এখন ঐ দুশমনদের দলে। এখন সামনে আমাদের দুইটি মাত্র পথ--হয় দুশমনদের মেরে নিজে বাঁচা, নয় দুশমনের হাতে মরা। হয় শহীদ, নয় গাজী! বিকল্প কিছুই নেই। অতএব, জান বাজি রেখে সকলেই আখেরী কোশেশ করুণ। মেরেই আমাদের বাঁচতে হবে। আল্লাহু আকবার!

সঙ্গে সঙ্গে আলী আশরাফ আর আতা খাঁর ফৌজের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ পুনঃপুনঃ ধ্বণিত হতে লাগলো। তাদের এক একটা সেপাই গুলিখাওয়া বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে জানের মায়া ছেড়ে দিয়ে দুশমনদের উপর আঘাত হানতে লাগলো। মওতের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আঘাতের পর আঘাত হানা ছাড়া দুস্‌রা কোন ধ্যান-ধারণা আর কারো এদের ছিলো না। আব্দুল লাতিফের ভাড়া করা অনভ্যস্ত ফৌজ লাড়াইয়ের শুরুতেই ঝড়ে গিয়েছিল। আলী আশরাফ আর আতা খাঁর নিজস্ব সেপাইরা লৌহদন্ডে রূপান্তরিত হয়ে দুশমনদের উপর মরণ আঘাত হানতে লাগলো। এক পলকে লড়াইটা তীব্রতম হয়ে উঠলো।

যে নিয়াত, মনোবল আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে আশরাফ-আতার ফৌজেরা লড়ছিলো, দুশমনদের মাঝে তার এক আনাও ছিলো না। এমন চরমতম প্রতিক্রিয়া আর প্রত্যাঘাতের কল্পনাও দুশমনেরা করেনি। আশরাফ-আতার ফৌজের একই আকস্মিক ও বেপরোয়া হামলায় তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেসামাল হয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে ক্রমেই চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। এই বিশৃঙ্খলার পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে আশরাফ-আতার ফৌজ হামলার বেগ দুইগুণ বাড়িয়ে দিলো। ফলে মুশমনেরা একধারছে ধরাশায়ী হতে লাগলো। ইতিমধ্যেই আলী আশরাফের এক আকস্মিক আঘাতে কামরূপের সেনাপতি ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। ঠিক এই মুহূর্তে আতা খাঁর বর্শার ঘায়ে মারাত্মকভাবে যখম হয়ে অহোমের সেনাপতি আতংকগ্রস্ত অবস্থায় রণস্থল ত্যাগ করে ছাউনির দিকে ছুটলো। সেনাপতিদের কাউকেই সামনে না দেখে তাদের সেপাইরা আতংকে দিশেহারা হয়ে গেলো এবং আশরাফের ফৌজদের হাতে বেশুমার মার খেয়ে পড়ি-মরি জান নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলো। রণস্থলে রইলো শুধু ফৌজ নিয়ে দৌলত খাঁ একা।

দৌলত খাঁর ফৌজের মধ্যেও তখন চরম বিশৃঙ্খলা আর আতংক বিরাজমান। শত্রু সংখ্যা একেবারে কমে যাওয়ায় আশরাফদের ফৌজের মধ্যে নয়া উদ্যম পয়দা হলো। 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ দিয়ে তারা দৌলত খাঁর ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে একধারছে খতম করে ফেলতে লাগলো। তা দেখে দৌলত খাঁ আঁতকে উঠে সেপাইদের ফেলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে কামরূপের ছাউনিতে আশ্রয় নিলো। তার দিশেহারা সেপাইরা যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গোলো।

খতম হলো লড়াই। আলী আশরাফ আর আতা খাঁর পক্ষেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বড় কম ছিলো না। তাদেরও প্রায় সিকি পরিমাণ সেপাই এই লড়াই এ শহীদ হলো। অবশিষ্ট সীমিত শক্তি নিয়ে কামরূপের ছাউনির উপর হামলা চালানো নির্বুদ্ধিতা ভেবে তারাও তাদের ছাউনিতে ফিরে এলো।

এই ঘটনার পর আলী আশরাফ আর আতা খাঁর দীলে অনুমান-সন্দেহের উর্ধ্বে এটা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের সর্বাঙ্গ পচে একদম গলে গেছে। চিকিৎসা করার তিল পরিমাণ জায়গাও আর নেই। কাজেই সে চেষ্টা এখন একেবারেই পণ্ডশ্রম। সামনে তাদের এখন একটাই মাত্র কাজ। আর তাহলো-- যথাসম্ভব গাদ্দারদের খতম করে এ মুলুকের পাপ খানিকটা কমিয়ে দিয়ে যাওয়া। জহিরুদ্দীন রাজধানীতেই আছে। এখন তারা গিয়ে তার সাথে যোগ দিলেই চেষ্টা একটা নেয়া যায়। দৌলত খাঁ ফসকে গেলে যাক। বাদ বাকীরা রাজধানীতেই। তাদের নিকেশ নেয়ার পর সুযোগ থাকলে দৌলত খাঁর কথাও ভেবে দেখা যাবে। পাণ্ডুয়ায় ফিরে গিয়ে আচমকা গাদ্দারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব শয়তানের দোসরদের আখেরী এলেম দিতে হবে। এরপরও সুলতানের সুমতি না ফিরলে তাঁকে শেষ সালাম জানানোই হবে তাদের সর্বশেষ কর্তব্য।

ছাউনিতে ফিরে এসে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। অতঃপর কুন্ডালীর ময়দানে দৌলত খাঁ শূন্য শিবির শূন্য রেখে তারা তাদের ফৌজ নিয়ে পাণ্ডুয়ার দিকে রওনা হলো।

রণের ক্লান্তি রাত্রিকালে পথের মধ্যেই জিরিয়ে নিয়ে পরের দিন সকালে তারা ছত্রার উপকণ্ঠে চলে এলো। আগে ছুটছে আলী আশরাফের ঘোড়া তার পেছনে আতা খাঁর। এদের পেছনে ছুটছে উভয়ের অশ্বারোহী ফৌজ। পদাতিক সৈন্যরা পেছনে আছে অনেক। তারা ধীরে সুস্থে ছত্রাদুর্গে ফিরে যাবে।

ছত্রা জায়গীরের ভেতরে এসে খানিক দূরে এগুতেই আলী আশরাফের ঘোড়ার সামনে ছুটে এলো আদম আলী। আব্দুল লতিফের মকানের সেই নওকর আদম আলী। অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে সে বললো, হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে। শীগগির আসুন।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে আলী আশরাফ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, মানে?

আদম আলী বললো, আপনার খোঁজেই আমি এ রাস্তা পাহারা দিচ্ছি। আপনি শীগগির আসুন! আপামণিকে বাঁচান।

আলী আশরাফ চমকে উঠলো। অশ্ব থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে বললো, বাঁচান মানে? কি হয়েছে তার?

ঃ আপামণি এখন কয়েদ হয়ে আমাদের জিন্দানখানায় আবদ্ধ আছেন। আমার মুনিব তাঁকে খতম করেই ফেলতেন! শুধু শাহজাদা মাঝখানে হাত দেয়ার ফলে এখনও কয়েদ হয়ে জিন্দা আছেন। কিন্তু আজকালের মধ্যেই শাহজাদার ফৌজ এসে আপা- মণিকে

নিয়ে গিয়ে শাহজাদার হাতে তুলে দেবে। শুনেছি, তিনি একজন লম্পট। হত্যা তো তাকে করবেনই, কিন্তু তার আগে ঐ লম্পট তাকে বেহুরমতি না করেও ছাড়বেন না।

আলী আশরাফের শিরায় শিরায় আগুন ধরে গেলো। সে আতা খাঁর দিকে তাকাতেই আতা খাঁ তাকে বললো, আমাদের তামাম ফৌজ দাঁড়িয়ে গেছে। ঘটনাটা আগে আপনি ভাল করে জেনে নিন। এরপর আমরা সেই মোতাবেক এগুবো।

আলী আশরাফ আদম আলীকে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, জিন্দানখানায় বন্দী আছে, আর কেউ তোমরা বের করতে পারলে না? তোমরা তো জানি তাকে দীল দিয়ে ভালবাসো!

জওয়াবে আদম আলী বললো, কি করে বের করবো হুজুর আমার মুনিব যে জিন্দানখানা সেপাই দিয়ে ঘিরে রেখেছে!

আলী আশরাফ বললো, ঘিরে রেখেছে! অপরাধ কি তার?

ঃ সে অনেক কথা হুজুর! এক কথায় জওয়াব দেবো কি করে? আলী আশরাফ অধীর হয়ে বললো, তাড়াতাড়ি সব বলো। ঘটনাটা আমাকে আগে বুঝতে দাও।

আদম আলীর এলোমেলো ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্যগুলো এক করলে যে কাহিনী দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ ঃ

পাণ্ডুয়ার দরবারে এমনও কিছু উমরাহ আছেন যাদের কাজ নেই কিছুই, অথচ পদ, বেতন আর প্রতাপ আছে পুরোদস্তুর। এদের মধ্যে পয়লা নম্বর আফতাব খাঁ আর দ্বিতীয়তে আতিকুল্লাহ। হাতে কোন কাজ না থাকলে তামাম অকাজ আর কুকাজ এসে ভর করে ঘাড়ের উপর। আতিকুল্লাহ শরাব আর আউরাতের পেছনে বিরাণ করেছেন সংসার, বিনাশ করেছেন স্বাস্থ্য। তিনি অবশ্য নিজ পরিবারের বাইরে অন্য কারো ক্ষতি করতে যান নি। আফতাব খাঁ তার চেয়েও সাংঘাতিক। হাতে কোন কাজ না থাকায় তিনি সরাদিন হৈ হৈ করে সারা মুলুক ঘুরে বেড়ান আর লাউয়ের বোঁটা কুমড়ায় এবং কুমড়ার বোঁটা লাউয়ে এন্‌তার লাগিয়ে যান। দিনে অন্তত দু'একটি অঘটন না ঘটাতে পারলে রাত্রিকালে কোনদিন তাঁর সুনিদ্রা হয় না। তাঁর 'বাপ্‌কা-বেটি' তনয়া আকলিমা বেগম এই গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। শাহজাদার ছত্র-ছায়ায় আসমানী ঘোড়ার মতো কখনও সে একা আর কখনও তার পিতার সাথে একইভাবে ছুটে বেড়ায় আর এইসব অঘটনের কাঁচামাল যোগাড় করে। বাংলা মুলুকে আসার পর এই অল্পদিনের মধ্যেই এহেন এলাকা নেই, যেখানে এই আসমানী ঘোড়া সফর করে বেড়ায়নি আর কমপক্ষে একটা করে অপকীর্তি করেনি। আলী আশরাফ এখানে ছত্রাদুর্গের মুহাফিজ জেনে দীলে তার নয়া ইশ্‌কের পয়দা হয়। পিতার উপর অপরিসীম চাপসৃষ্টি করে তাকে নিয়ে নয়া ভ্রমরের সন্ধানে ছত্রাদুর্গে চলে আসে। আলী আশরাফ একদিন আগে কামরূপ অভিযানে যাত্রা করায় তার দিদার সে পায় না। অবশেষে বিবিজান পেরেশানী দীলে দুর্গ থেকে

বেরিয়ে আসে এবং জায়গীরদার আব্দুল লতিফের দিদার দিয়ে ক্ষতিপূরণের খাহেশ করে। ঐদিনই ওখান থেকে সে আব্দুল লতিফের মকানে এসে হাজির হয় আর এখানেই সে ঘটায় এ দুর্ঘটনা।

আব্দুল লতিফও মকানে সেদিন ছিলো না। সে ছিলো পাণ্ডুয়ায়। আব্দুল লতিফের মকানে বাপ-বেটি একসাথে নওকর-নফর নিয়ে খানিকক্ষণ রংবাজী করার পর আকলিমা বেগম জেনানা মহলে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্যে উপরে যায়। সেখানে গিয়ে লায়লা আকতারকে দেখেই বিগ্‌ড়ে যায় তার দিমাগ। আলী আশরাফের মেহবুবা লায়লা আকতার আব্দুল লতিফের মকানে! সে সংগে সংগে ছুটে আসে নীচে এবং দহলীজে উপবিষ্ট আফতাব খাঁকে ফলাও করে এ ঘটনা জানায়।

শুনে আফতাব খাঁও তাজ্জব বনে যান! যে লায়লা আকতারকে অপহরণ করার জন্যে ফৌজ পাঠান তিনি, সেই লায়লা আকতার আব্দুল লতিফের মকানে! আরো বেশী তাজ্জব ব্যাপার সে আব্দুল লতিফের বহিন! সবার অধিক তাজ্জবের ব্যাপার, আব্দুল লতিফের বহিন এই লায়লা আকতারই আব্দুল লতিফের মহা শত্রু আলী আশরাফের দীলের টুকরো– দীল!

সংগে সংগে পাণ্ডুয়ায় ফিরে এসে আফতাব খাঁ আব্দুল লতিফকে তামাম খবর জানালেন। তাকে বুঝিয়ে দিলেন–তাদের তামাম মতলব ফেঁসে যাওয়ার মূলে এই লায়লা আকতার। লায়লা আকতার মনে-প্রাণে আলী আশরাফের মঙ্গল চায়, আর ধ্বংস চায় আব্দুল লতিফসহ তাদের সকলের।

শুনেই আব্দুল লতিফের মাথায় আগুন ধরে গেলো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, আলী আশরাফকে খতম করার তামাম কোশেশ বরবাদ হয়েছে কেন? গোস্বায় ক্ষিপ্ত হয়ে পাণ্ডুয়ায় থাকতেই সে তরবারি কোষমুক্ত করে আবার তা কোষবদ্ধ করলো। ঐ বহিনরূপী কসবি আর কমিনা আউরাতকে খতম করার দুর্বার খাহেশে সে অধীর হয়ে পড়লো এবং ক্ষিপ্রবেগে পাণ্ডুয়ার কাজ-কর্ম শেষ করে দ্রুতবেগে ছত্রার দিকে ছুটে চললো।

কিন্তু শেষ অবাধি তার খাহেশ সে পূরণ করতে পারলো না। আফতাব খাঁ এ পয়গাম শুধু আব্দুল লতিফকে দিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেন নি। পয়গামটা শাহজাদা সাইফুদ্দীন হামজার কানেও দিলেন। বললেন, ঐ কস্‌বিকে খতম করতে পারলেই আলী আশরাফ শিকড়কাটা লতার মতো নুইয়ে পড়বে। গর্দ্দান সোজা করে তোলার মতো কোন শক্তি আর থাকবে না।

এটুকুতেও দীলের খাহেশ পূরণ হলো না আফতাব খাঁর। অতীত আক্রোশ চরিতার্থের উম্মিদে শাহজাদাকে জালালেন, লায়লা আকতারের মতো এত অধিক সুন্দরী আউরাত গোটা জৌনপুর আর বাংলা মুলুকে দুসরাটি নেই। আসমানী হুর-পরীও তার

কাছে তুচ্ছ। এমন আউরাত শাহজাদার প্রমোদ কক্ষেই মানায়।

মাতালের সামনে মদের মজলিস। শাহজাদা মেতে উঠলেন। তিনি আব্দুল লতিফকে পথিমধ্যেই জানিয়ে দিলেন যে, লায়লা আকতারকে কয়েদ করা পর্যন্তই তার এক্তিয়ার। এর অতিরিক্ত আর কোন পদক্ষেপ শাহজাদা বরদাস্ত করবেন না। ঐ বেঈমান আউরাতের তামাম ব্যবস্থা তিনি নিজে হাতেই করবেন। আব্দুল লতিফের কাজ হবে তাকে কয়েদ করে জিন্দান খানায় ফৌজী পাহারায় রাখা, যাতে করে সে পালিয়ে যেতে না পারে। শাহজাদা এখন ব্যস্ত থাকায় তাকে পাণ্ডুয়ায় নিয়ে আসতে হপ্তা খানেক দেরী হবে। একহপ্তা পরই শাহজাদার ফৌজ গিয়ে লায়লা আকতারকে পাণ্ডুয়ায় নিয়ে আসবে। শাহী ফৌজ দেখলে তাকে পথের মধ্যে কেউ ছিনিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করবে না।

আদম আলীর কাহিনী শেষ হলে আলী আশরাফ আক্রোশের সাথে বললো, বটে! এতদূর! আফতাব খাঁর গুনাহগারীর তামামশোধ না করে এই আলী আশরাফ এ মুলুক থেকে যাবে না! তা যাক, এবার বলো, লয়লা আকতারের আম্মা কেমন আছেন? এ ব্যপারে তিনি কি করছেন?

আদম আলীর শির মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে বললো, তিনি আর ইহ দুনিয়ায় নেই হুজুর। আপনাদের কামরূপ যাত্রার ক'দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আলী আশরাফ আর্তনাদ করে উঠলো। বললো, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন!

আলী আশরাফের হাত আবার তরবারির বাঁটের উপর স্থাপিত হলো। সে আতা খাঁকে বললো, ভাই সাহেব, সামনে শুধু জেহাদ আর জেহাদ। আমাকে একটু সাহায্য করবেন আসুন।

আবার তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। বিপুল বেগে ছুটে এসে আলী আশরাফ আর আতা খাঁর সম্মিলিত বাহিনী আব্দুল লতিফের মকানে সরাসরি ঢুকে পড়লো। আব্দুল লতিফ মকানে না থাকায় প্রবেশ পথে কোন বাধাই তারা পেলোনা। কিন্তু জিন্দান খানার সামনে আসতেই পাহারাদার সিপাইরা হাতিয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালো। সংগে সংগে শুরু হলো দুই পক্ষের সংঘর্ষ। কিন্তু এই সম্মিলিত ও সুশিক্ষিত বাহিনীর সামনে পাহারাদার বাহিনীর কোন অস্তিত্বই ছিলো না। প্রচণ্ড মার খেয়ে কয়েক লহমার মধ্যেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে গেলো।

অতঃপর জিন্দানখানার দুয়ার ভেঙ্গে ফেলা হলো। আলী আশরাফ সংগে সংগে জিন্দানখানায় প্রবেশ করে লায়লা আকতারকে মুক্ত করে নিয়ে এলো। ইয্যত আর জানের আশা লায়লা আকতারের আর তিল পরিমাণ ছিলো না। আলী আশরাফের হঠাৎ

এই উপস্থিতিতে জিন্দেগীর তামাম উম্মিদ সে আবার ফিরে পেলো। আলী আশরাফকে দেখেই সে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং সশব্দে কেঁদে ফেললো।

আলী আশরাফ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আল্লাহ তায়ালার প্রতি যতক্ষণ আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকবে, ততক্ষণ কোন মুসিবতই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আফসোস করার সময় এটা নয়। তোমার আপত্তি না থাকলে আমার সাথে এক্ষুণি তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

লায়লা আকতার ধরা গলায় বললো, আপত্তি! আপনার সাথে যেতে আমার আপত্তি! আমি তৈয়ার। কিন্তু তার আগে আসুন একটু আমার সাথে। আমার কক্ষ তালাবদ্ধ থাকলে এক্ষুণি ওটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন করার সময় নেই। আলী আশরাফ লায়লা আকতারের পেছনে পেছনে উপরে উঠে গেলো। অন্যান্য দাস দাসী প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে। আছে শুধু লায়লা আকতারের শুভাকাঙ্খী কয়েকজন। ইতিমধ্যে আদম আলীও সেখানে এসে হাজির হলো। লায়লা আকতারের কক্ষটা তালাবদ্ধই ছিলো। আলী আশরাফ কক্ষের তালা ভেঙ্গে ফেললো। লায়লা আকতার দ্রুতপদে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে তার প্রয়োজনীয় কয়েকখানা পরিধেয়, আর অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিলো। এরপর সে দেরাজ খুলে বিশ্বস্ত ঝি-চাকরদের আশাতীত ইনাম দিয়ে বললো, তোমাদের ঋণ এ জীবনে শোধ করার সাধ্য আমার নেই। এ জিন্দেগীতে তোমাদের সাথে আর আমার মোলাকাত হবে কিনা জানি না। এই অর্থ নিয়ে এখনই তোমরা এ মুলুক ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। এক দন্ডও আর এখানে থেকো না। আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুন!

এরপর একটা তাজী অশ্বে সওয়ার হয়ে লায়লা আকতার বোরকা মাথায় আলী আশরাফের পেছনে মকান থেকে বেরিয়ে এলো। তাকে নিয়ে আলী আশরাফ আর আতা খাঁর ফৌজ পুনরায় পাণ্ডুয়ার পথে ছুটতে লাগলো।

একটানা অনেক দূর এসে এক স্থানে আহার-বিশ্রামে বসে আতা খাঁ আলী আশরাফকে বললো, আমাদের সামনে এখন এক অত্যন্ত দুরূহ কাজ! আমাদের এ বহিনটিকে আমরা এখন কোথায় রাখি?

জওয়াবে আলী আশরাফ বললো, আমিও তো হরকদম সেই চিন্তাই করছি। সময় থাকলে সোজা একে জৌনপুরে রেখে আসতাম। কিন্তু সে চিন্তাই এখন বাতুলতা।

তাদের ইরাদার কথা শুনে লায়লা আকতার বললো, আমাকে নিয়ে আপনার এত পেরেশান হচ্ছেন কেন? যে ফৌজী এলেমটুকু এত তকলিফ করে হাসিল করেছি, তা কোন্ কাজের জন্যে? আপনাদের এই উদ্যোগে আমিও কি শরিক হতে পারি নে?

আলী আশরাফ বললো, কোন সুনির্দিষ্ট লড়াই হলে তোমাকে আমি সেই উৎসাহই দিতাম। কিন্তু এমন একটা কাজে আমরা যাচ্ছি যে, কখন কি অবস্থায় পড়তে হবে

আমাদের, কি অবস্থায় কখন কোন্ কাজ করতে হবে, কোন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও বা একাকী, কখনও বা দল বেঁধে ছুটোছুটি করতে হবে আমাদের। এ অবস্থায় কাজ করা কোন মহিলা সেপাইয়ের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এতে দলের বিপত্তই বাড়বে শুধু।

লায়লা আকতার আরো খানিক পীড়াপীড়ি করে অবশেষে হাল ছাড়তে বাধ্য হলো। স্থির হলো, হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবের হেফজতিতেই রেখে যাবে লায়লা আকতারকে। পরোয়ারদেগারের ইচ্ছায় ইরাদা হাসিল করে ওয়াপস আসতে পারলে আলী আশরাফ লায়লা আকতারকে নিয়ে জৌনপুরে রওনা হবে।

সিদ্ধান্ত স্থির করে সবাই আবার সুফী সাহেবের খানকাহ শরীফ হয়ে পাণ্ডুয়া যাওয়ার লক্ষ্যে ছুটতে লাগলো। খাল-বিল, নদী-নালা পার হয়ে তারা অনেক রাতে এসে হাজির হলো সুফী সাহেবের খানকাহ শরীফে। সেপাইদের খানকাহ শরীফের বাইরে রেখে আলী আশরাফ, লায়লা আকতার আর আতা খাঁ অশ্ব থেকে নামলো এবং খানকাহ শরীফে প্রবেশ করলো।

সুফী হযরত নূর কুতুব-ই-আলম সাহেবও জেগেই ছিলেন খানকাহ শরীফে। তিনি অস্থির হয়ে খানকাহ শরীফের আঙ্গিনায় পদচারণা করছিলেন। অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্ভ্রান্ত ছিলেন তিনি। আলী আশরাফকে খানকাহ শরীফে প্রবেশ করতে দেখেই তিনি অনেকটা আশান্বিত হলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, এই যে আলী আশরাফ! রহমানুর রহিমের কি অশেষ শান, তুমি এসে গেছো!

তিন জনই এগিয়ে গিয়ে সুফী সাহেবের কদম বুছি করলো। আলী আশরাফ বললো, হুজুর!

সুফী সাহেব বললেন, আজই আমি কামরূপ সীমান্তে লোক পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে। হয়তো সে এখনও পৌঁছেই নি সীমান্তে, যদিও আমি জানি, সে তোমাদের পাত্তা লাগাতেই পারবে না, তবু আমার লোক পাঠানো ছাড়া আর করার কিছুই ছিলো না।

ঃ জনাব!

ঃ খোদ সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহর জীবনই এবার চরমভাবে বিপন্ন। আজ কালের মধ্যেই তাঁকে গুপ্ত হত্যা করা হবে।

আলী আশরাফ আর আতা খাঁ এক সঙ্গে চমকে উঠলো। আলী আশরাফ বললো, সেকি! এ খবর কোথায় পেলেন আপনি?

ঃ নওকার মুহব্বত খাঁ জানের উপর ঝুঁকি নিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। গাদ্দারদের পরিচিতজন হিসাবে গাদ্দার মহলে ঘুরে ঘুরে সে এ তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছে।

ঃ মুহব্বত খাঁ?

ঃ হ্যাঁ, বৃদ্ধ মুহব্বত খাঁ। সালার দৌলত খাঁর নওকার। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দৌলত খাঁর সাথে রণাঙ্গনে যাওয়া থেকে নিজেকে রেহাই করে নিয়ে সে পাণ্ডুয়াতেই আছে।

ঃ পাণ্ডুয়ার হুকুমাতের হালত দেখে সে নিঁদঘুম ছেড়েছে। বাংলা মুলুকে মুসলমানদের হুকুমাত হেফাজত করার লক্ষ্যে যে কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তি জানে প্রাণে তৎপর, মুহব্বত খাঁ তাদের প্রথম সারির।

ঃ হযরত!

ঃ মুহব্বত খাঁ গতকাল সন্ধ্যেয় এই খবর যোগাড় করে আমার ভাই উজির আজম খাঁকে দিয়েছে। আজম খাঁ জহিরুদ্দীনকে নিয়ে চিন্ত-ভাবনা করে তোমাদের কাছে আজ সবেরেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। লড়াইয়ের ময়দানের চেয়ে তোমাদের এখন বড় প্রয়োজন এখানে। তোমরা এসে না পৌঁছালে একা জহিরুদ্দীন কিছুই করতে পারছে না।

ঃ কি রকম?

ঃ জহিরুদ্দীনের খত পেলাম আজকেই অবেলায়। সে পুনঃপুনঃ মুহব্বত খাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, পাণ্ডুয়ায় মুসলমানদের হুকুমাত কায়েম রাখার আপাতত একমাত্র উপায় সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহকে বাঁচিয়ে রাখা। তিনি যদি নিহত হন, অন্যকোন প্রক্রিয়াতেই সে হুকুমাত টিকিয়ে রাখা যাবে না। শাহজাদা সাইফুদ্দীন তা পানির দামে বিকিয়ে দেবে।

এবার আতা খাঁ বললো, গোস্তাকী মাফ হয় হযরত! এখানে আমাদের ভূমিকাটা সঠিক আমরা অনুধাবন করতে পারছি নে।

ঃ সুলতানকে হেরেমেই গুপ্তহত্যা করা হবে। ঘাতকও হেরেমেরই কে বা কারা? খুব সম্ভব তাঁর কাছের কোন লোক বা দাসী-বাঁদী, ঝি-চাকর। কখন, কিভাবে আর কি অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হবে, বাইরের কারো পক্ষে তার সন্ধান রাখা সম্ভব নয়। কাজেই সেই মোতাবেক সুলতানকে হেফাজত করা জহিরুদ্দীনের সাধ্য ও এক্তিয়ারের বাইরে। অবস্থাটা এমনই যে, সুলতান নিজেও যদি সে খবরটা জানতে পেরে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করেন, তবুও বেড়াতেই ধান খেয়ে ফেলবে।

ঃ তাহলে তো আমাদের করার কিছুই দেখছি নে।

ঃ জহিরুদ্দীন আর উজির আজম খাঁর বক্তব্য– একমাত্র অসাধ্য সাধন করা ছাড়া এই মুহূর্তে করার কিছু নেইও। সেই অসাধ্য সাধনটাও আবার এমনই এক অসম্ভব ব্যাপার যে, কোন সুস্থ দিমাগের লোকের পক্ষে এটা কল্পনাতেও আসবে না।

আলী আশরাফ বললো, কি সেটা?

সুফী সাহেব বললেন, মুখের কথায় সুলতানকে সরিয়ে আনা যাবে না। তাই বাধ্য

হয়ে সুলতানকে কয়েদ করে শাহী মহল থেকে তাকে আপাতত সরিয়ে রাখা। অতর্কিতে রাজধানী আর শাহী মহলে হামলা চালিয়ে সুলতানকে বন্দী করা। অন্য কথায় পাণ্ডুয়ার মসনদ দখল করা। বন্দী সুলতানকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়ার পর গাদ্দারদের খতম করা। পরে সুলতানকে আজাদ করে মসনদে বসিয়ে দেয়া – এই পরিকল্পনার শেষ পর্ব। এটা একটা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তবু এ ছাড়া আর দুস্‌রা কোন্ রাহাও নেই। জহিরুদ্দীনের একার পক্ষে এত বড় কাজ উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলেই তোমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে সে এন্তেজারে আছে।

আলী আশরাফ, আতা খাঁ আর লায়লা আকতার নিবিষ্টচিত্তে সুফী সাহেবের বক্তব্যগুলো শুনলো। তারা কিছু বলার আগেই সুফী সাহেব ফের বললেন, জহিরুদ্দীন আর আজম খাঁ এ ব্যাপারে আমাকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করতে গিয়ে এসব কথা বলেছে। তাদের ধারণা, সুলতানকে আমি বললেই তিনি শাহী মহল আর মসনদ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবেন। কিন্তু এটা কি একটা বলার কথা, না তা বললেই তিনি করবেন তাই? কাজেই নিরুপায় হয়ে তাদের পরিকল্পনার সমর্থনেই তোমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।

সুফী সাহেবের বক্তব্য শেষ হলে আলী আশরাফ বললো, আমি আর আতা খাঁ সাহেব সেই ইরাদাতেই বেরিয়েছি। সুলতানকে কয়েদ করাটুকুই আমাদের পরিকল্পনায় ছিলো না। তবে গাদ্দারদের মোকাবেলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমরা।

সুফী সাহেব বললেন, ওটুকুও সেই সাথে যোগ করে নাও। কামিয়াব হওয়া না হওয়া আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

আতা খাঁ বললো, আপনি দোওয়া করবেন হযরত। চেষ্টার কোন কসুর আমরা করবো না। লড়াইয়ের ময়দানেও যে গাদ্দারীর মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের, তাতে আমরা বুঝেছি, চরম বিপ্লব ছাড়া পরিত্রাণের কোন পথ নেই। আতা খাঁ সংক্ষেপে লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণনা করলো। এর পর আলী আশরাফ লায়লা আকতারকে দেখিয়ে তার ভাগ্য বিড়ম্বনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললো, এই এতিমটাকে আপাতত হুজুরের হেফাজতিতে রেখে যেতে চাই। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যদি সহি সালামতে পাণ্ডুয়া থেকে ওয়াপস্ আসতে পারি, তাহলে এর দায়িত্ব আবার আমি নেবো। যদি অন্যরকম কিছু ঘটে, তাহলে এর আখেরী দায়িত্ব হুজুরের উপরই বর্তাবে। জৌনপুরে আমার যা বিষয়বিত্ত আছে তার অর্ধেকটা আব্দুলালাহ চাচাদের থাকবে। আর অর্ধেকটা আমি এই লায়লা আকতারকে দিয়ে গেলাম। আমার বরাত দিয়ে আপনি একটু বললে আব্দুল্লাহ চাচা দ্বিরুক্তি করবে না। মেহেরবাণী করে হুজুর, এই তকলিফটুকু এই এতিমের মুখ চেয়ে করবেন।

আলী আশরাফের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ভারী হয়ে উঠলো। বোরকার তলে লায়লা আকতারের মুখমণ্ডল কারো দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল না। সেখানে তখন অঝোর ধারায় আঁসু

ঝরে পড়ছে। সে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুফী সাহেব বললেন, হেফাজতির আখেরী মালিক পরোয়ারদেগার। তবে তোমাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, এর জন্যে আমার পক্ষে যা কিছু করণীয় তা করতে আমি এতটুকু তকলিফ বোধ করবো না। কিন্তু এ নিয়ে পেরেশান হওয়ার ফুরসুৎ নেই। আমি দোওয়া করছি আল্লাহ যেন তোমাদের কামিয়াব হয়ে সহি সালামতে ফিরে আসার তৌফিক দেন। তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

আলী আশরাফ লায়লা আকতারের কাছে এসে বললো, আসি লায়লা!

লায়লা আকতারের কণ্ঠ তখন রুদ্ধ। শত চেষ্টা করেও শুধু একটু কান্নার আওয়াজ ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর অন্য কোন শব্দই সে বের করতে পারলো না। তবে তার দীল তখন আল্লাহ তায়ালার আরশের কাছে পৌঁছে মোনাজাতে বসে গেছে।

সুফী সাহেবকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ দ্রুত পদে খানকাহ শরীফের বাইরে এসে ঘোড়ায় চেপে বসলো। আলী আশরাফ সেপাইদের উদ্দেশ্য করে বললো, ভাইসব, এবার আমাদের একমাত্র লক্ষ্য পাণ্ডুয়া। অশ্বের গতি যথাসাধ্য বৃদ্ধি করুন।

ফৌজ নিয়ে প্রাণপণে ছুটে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ পাণ্ডুয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছলো তখন শেষরাত। উপকণ্ঠ পেরিয়ে রাজধানীতে পৌঁছেই তারা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। গোটা রাজধানীটাই দিনের মতো কর্মতৎপর। বস্তি বাজার প্রাণচঞ্চল, রাজপথে আলোকসজ্জা, জনগণ কর্মমুখর, প্রতিগৃহ জাগ্রত–ঘরে-বাইরে সর্বত্র বাৎচিৎ আর হৈ হুল্লোর।

এক অশুভ আভাসে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ উভয়েরই মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। আলী আশরাফ আতা খাঁকে বললো, ভাই সাহেব, বড় নাখোশ আলামত। চলুন, আগে উজির আজম খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি।

উজির আজম খান সাহেব মকানেই ছিলেন। তখন তিনি ছদ্মবেশ পরিধানে ব্যতিব্যস্ত। আলী আশরাফদের দেখে তিনি শোকে-দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন। অত্যন্ত আফসোস করে বললেন, সব খতম হয়ে গেলো বাপজান! বাংলা মুলুকে মুসলমানদের ভবিষ্যতের কবর হয়ে গেলো!

আলী আশরাফ আর আতা খাঁ উভয়েই এক সঙ্গে চমকে উঠলো। আলী আশরাফ বললো, মানে!

আজম খান বললেন, সেই তোমরা এলে, আর একটা দিন আগে এলে হয়তো পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারতো।

আলী আশরাফ বললো, সে ফুরসুত আমাদের কৈ? গতকাল পথেই আমাদের কেটে গেছে। তার আগের দিন আমরাই আমাদের জান বাঁচানোর জীবন মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত

ছিলাম। তা যাক! ঘটনা কি এদিকে?

• ঃ আজ সাঁঝরাতেই সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ নিহত হয়েছেন। তাঁকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছে।

আলী আশরাফ আর আতা খাঁ আর্তনাদ করে বললো, সে কি!

ঃ তাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে জহিরুদ্দীনও জান দিয়েছে। উভয়ের আর এক দফা আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠলো। তারা চীৎকার করে বললো, উজির সাহেব!

ঃ আজই সাঁঝ ওয়াক্তে মুহব্বত খাঁ খবর দিলো– আজ রাতেই সুলতানকে হত্যা করতে যাচ্ছে ওরা। পারলে সুলতানকে বাঁচান। তার পর পরই সুলতানের খাসবান্দা গাজী গাফফার আমার কাছে পড়ি-মরি ছুটে এসে বললো, সুলতানকে বাঁচান! শাহজাদা আর রাজা গণেশের নির্দেশে শাহী মহলের নওকর আর শান্ত্রীরা সুলতানকে তাঁর অস্ত্রাগারের পাশের কক্ষে তুলে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের খবর এই মাত্র তিনি পেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সাথে কারা কারা জড়িত আছে, তাও তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিলো। এসব জানতে পেরেই তিনি আমাকে ডেকে বললে, গাজী গাফফার, তুমি শীগগির জহিরুদ্দীন আর আজম খাঁকে খবর দাও। আমি তৈরী হয়ে আমার বাহিনী নিয়ে বেরোচ্ছি। বলেই তিনি অস্ত্রাগারের দিকে ছুটলেন। অস্ত্রাগারের নিকটে এসে পৌঁছতেই শাহী মহলের নওকর আর শান্ত্রীরা এসে তাঁকে ধরে জোর করে অস্ত্রাগারের পাশের কক্ষে তুলে তালা লাগিয়ে দিলো। সুলতান তাঁর খাস-বাহিনীকে চীৎকার করে তলব দিলেন। কিন্তু একজনও তাঁর উদ্ধারে এলো না। সুলতান এখন আবদ্ধ ঘরে থেকে আলী আশরাফ, জহিরুদ্দীন আর আতা খাঁব নাম ধরে পাগলের মতো এন্তার আওয়াজ দিচ্ছেন। আপনারা তাঁকে বাঁচান।

এই বলেই গাজী গাফফার আবার মহলের দিকে ছুটলো।

দারুন-উৎকণ্ঠার সাথে শুনে আলী আশরাফ বললো, তারপর?

ঃ জহিরুদ্দীনকে এ খবর বলতেই সে মার মার রবে তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এমনটি ঘটতে পারে অনুমান করেই মুরাদ বেগ, আরব আলী, ভরত সিং, শ্রী মাধব, শাহজাদা স্বয়ং ও আরো কয়েকজন নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শাহী মহলের ফটকে মোতায়েন ছিলো। সুলতানের খাস বাহিনীও এসে তাদের সাথে যোগ দিলো। ঐ ফটকেই শুরু হলো সংগ্রাম। দুশমনদের সম্মিলিত ফৌজ জহিরুদ্দীনের ফৌজের প্রায় পাঁচ ছয় গুণ অধিক ছিলো। তবুও প্রাণপণে লড়ে সে একাই তামাম দুশমনদের পেরেশান করে তুলেছিলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত জহিরুদ্দীন দীর্ঘক্ষণ লড়ে অবসন্ন অবস্থায় তলোয়ার হাতে শহীদ হলো। তোমাদের একজনও সেই সময় তার পাশে থাকতে যদি, পাণ্ডুয়ার ইতিহাস অন্য রকম হতো।

উজির সাহেবের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। আলী আশরাফ হিসেব করে দেখলো- পথের ঐ বিঘ্নগুলো না ঘটলে তারা বড় জোর মাঝরাতে পৌঁছতে পারতো পাণ্ডুয়ায়, সাঁঝরাতের প্রশ্নই কিছু উঠে না। দিশেহারা কণ্ঠে সে বললো, তারপর?

ঃ এরপরের খবর– শাহী মহলের ফটকে যখন তুমুল লড়াই চলছে সেই ফাঁকে কে বা কারা সুলতানের সেই কক্ষে ঢুকে অসহায় ও নিরস্ত্র সুলতানকে ছুরির পর ছুরি চালিয়ে নির্মমভাবে খুন করেছে।

আলী আশরাফ আর আতা খাঁ পাথর হয়ে গেলো। যেন রা-টুকু করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে তারা।

উজির আজম খান সাহেব কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর আবার অনুতাপের সাথে বললো, গাদ্দার কি শুধু চোখে গোণা কয়েকজন? গোটা পাণ্ডুয়া শহরটাই গাদ্দার আর মোনাফেকে ভর্তি। মুলতানের লাশ ঐভাবেই পড়ে রয়েছে ওখানে আর গোটা শহর মেতে উঠেছে নয়া সুলতানের সম্বর্ধনার আয়োজনে।

বিস্ময়াভিভূত আতা খাঁ বললো, মানে!

ঃ মানে, পিতার লাশ ঐভাবেই ফেলে রেখে পুত্র সাইফুদ্দীন হামজা শাহ আজ রাতেই মসনদে উঠে বসেছেন। কিছুক্ষণ আগে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। এখনই আবার দরাবার ডেকেছেন তিনি।

ঃ দরবার!

ঃ হ্যাঁ, দরবার! শাহজাদার মনোরঞ্জনে গাদ্দারদের সবাই ইতিমধ্যে দরবারে জুটে গেছে। আমার কাছেও ডাক এসেছে দরবারে হাজির হওয়ার। কিন্তু আমি তা জানি, আমার পরিণতি কি হবে ওখানে!

আলী আশরাফ চমকে উঠে বললো, গাদ্দারেরা জুটে গেছে দরবারে?

উজির সাহেব বললেন, আজ কি আর বাড়ী ঘর আছে কারো? দরবার আর শাহজাদা, শাহজাদা আর দরবার নিয়েই মত্ত আছে সবাই।

আলী আশরাফের দুই বাহু শক্ত হয়ে এলো। সে দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, আতা খাঁ সাহেব...

আতা খাঁর মধ্যেও ঐ একই অনুভূতি কাজ করছে তখন। জওয়াবে সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললো, আমি তৈয়ার!

দুইজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তা দেখে উজির আজম খান সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তার মানে! তোমরা এখন কোথায় যাবে?

আলী আশরাফ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, জহিরুদ্দীন সাহেব আমাদের ফাঁকি দিয়েই কর্তব্য পুরোপুরিই [illegible] করে গেছেন আমাদের কাজ এখনও বাকী বাংলা মুলুকের

কওমী হুকুমাতের কোন কাজেই লাগতে পারলাম না। এ আফসোস্ জিন্দেগীভর থাকবেই আমাদের দীলে। কিন্তু বাংলা মুলুকের পাপের বোঝা খানিকটা যদি হালকা করে যেতে না পারি, জওয়াবদিহির জবার থাকবে না আমাদের। আপনি আর কালবিলম্ব না করে নিরাপদ স্থানে সরে পড় ল–এই আমাদের শেষ অনুরোধ।

আঁধার তখনও কাটেনি। আলী আশরাফ আর আতা খাঁ নিজ নিজ বাহিনীকে তালিম দিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো। সদর রাস্তা এড়িয়ে চোরাগলির মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে অশ্ব চালিয়ে তারা শাহী ভবনের ফটকে এসে দাঁড়ালো। এরপর আচমকা হামলা চালিয়ে ফটকের শান্ত্রীদের শুইয়ে দিয়ে তারা দরবারের দিকে ছুটলো।

দরবারকক্ষে তখন তুমুল আনন্দ উৎসব আর হৈ হুল্লোর চলছে। মিয়া মোস্তাক, দশরথ দেব, ভরত সিং, মুরাদ বেগ, আরব আলী, আফতাব খাঁ আরো অন্য অনেক গাদ্দার তখন মসনদটা ফুলসাজে সজ্জিত করার কাজে মশগুল হয়ে লেগে গেছে। নয়া সুলতান এখনই দরবারে এসে আসন গ্রহণ করবেন। সেই চিন্তায় তারা অত্যন্ত তৎপর হয়ে সাজান গোজান করছে। নয়া সুলতান সাইফুদ্দীন হামজা ও রাজা গণেশ তখনও দরবারে এসে পৌঁছেন নি।

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ ফৌজসহ ক্ষিপ্র গতিতে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো। পাহারাদার সিপাই শান্ত্রীদের এক পলকে খতম করে তারা দরবারকক্ষে ঢুকলো। হঠাৎ এই আক্রমণে দরবারীরা দিশেহারা হয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে লাগলো এবং তারস্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলো। আলী আশরাফ সগর্জনে বললো, এই গাদ্দারদের একজনেরও বেঁচে থাকার হক নেই। খতম করো শয়তানদের।

সঙ্গে সঙ্গে আলী আশরাফদের ফৌজ চারদিক থেকে আঘাত করলো গাদ্দারদের। চোখের পলকে গোটা দরবার গাদ্দারদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। আফতাব খাঁকে আঘাত করলো আলী আশরাফ নিজে। বললোঃ অনেক জুলুম করেছো তুমি আমার উপর। এই নাও তার তামাম শোধ!

আর্তনাদ করে আফতাব খাঁ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো পলকেই তার দেহ সঞ্চারণ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দরবারের হৈ চৈ এ চারদিকে তৎক্ষণাৎ সাড়া পড়ে গেলো। গাদ্দারদের খতম করে দরবার থেকে বেরিয়েই তারা দেখলো চারদিক থেকে শাহজাদা আর গাদ্দারদের তামাম ফৌজ তাদের ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে মার মার রবে ছুটে আসছে। বাইরে আছে ফৌজ নিয়ে শ্রীমাধব আর বিন বিল্লাহ। পাশেই তাদের টহল দিতে দেখে এসেছে তারা।

আতা খাঁ চমকে উঠে বললো, ভাই সাহেব, আর এক মুহূর্তও নয়। এক্ষুণি পালাতে হবে আমাদের।

আলী আশরাফ উদ্ভ্রান্তের মতো বললো, কিন্তু রাজা গণেশ? আসলটাই যে বাংলার বুকে জিন্দা রয়ে গেলো!

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর কারো হাত নেই। আমাদের আক্কেল হতে আরো কিছু বাকী আছে বলেই হয়তো এতলোকের মধ্যে ঐ আসলটাকেই সরিয়ে রেখেছেন তিনি। আসুন শীগগির। এক্ষুণি সদর ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিরুক্তির আর যুক্তি নেই দেখে আলী আশরাফ সেপাইদের দ্রুত বেগে ফিরে যাবার হুকুম দিলো। ফেরার পথে আরো কিছু ছোটখাটো বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করতে করতে আলী আশরাফ আর আতা খাঁ তাদের ফৌজ নিয়ে শহরের বাইরে চলে এলো।

চারদিকে তখন ফর্সা হয়ে গেছে। সূর্য তখন উঠি উঠি করছে। এমন সময় তাদের কানে ভেসে এলো শাহী এলানঃ এত দ্বারা নয়া সুলতান হুজুরে মুল্‌ক্ জনাবে আলা সাইফুদ্দীন মোহাম্মদ হামজা শাহ বাহাদুর মুহাফিজ আলী আশরাফ আর ফৌজদার আতা খাঁকে পদচ্যুত করেছেন। তাদেরকে হাতিয়ার সমর্পন করতে বলা যাচ্ছে। সেই সাথে তাদের সেপাইদের সুলতানের ফৌজে এসে যোগদানের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

আলী আশরাফেরা আরো খানিক সরে এসে এক বনের মধ্যে থামলো। তারপর তারা নিজ নিজ বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললো, আপনারা তো নয়া সুলতানের ফরমান নিজ কানেই শুনলেন। এবার বলুন, কি করবেন আপনারা, যদি নয়া সুলতানের ফৌজে যোগ দিতে আগ্রহ থাকে কারো, আপনারা নির্দ্বিধায় যেতে পারেন সেখানে। এতে আমরা নাখোশ কেউ হবো না, বরং আপনাদের এই একনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রশংসনীয় বীরত্ব চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে ইয়াদ রাখবো আমরা।

এ প্রস্তাবে উভয়ের ফৌজই প্রতিবাদ করে জানালো, যদি নকরী কোথাও নাও জোটে, ক্ষেতখামারে কাজ করেই খাবে তারা। তবু ঐ মোনাফেকের অধীনে নকরী তারা করবেন না, বা তারপক্ষে তলোয়ার তারা ধরবে না।

শুনে আলী আশরাফ খুশী হয়ে বললো, এই সাফ নিয়াতের জন্যে আপনাদের সবাইকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে এ ভরসাও দিচ্ছি যে, নকরীর অভাব কারো আপনাদের থাকবে না। আপনাদের সবাইকে আমি জৌনপুর ফৌজে উপযুক্ত পদে বহাল করে দেবো, এ ওয়াদা করছি।

সকলেই খোশ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, মারহাবা! মারহাবা!

ঃ এখান থেকেই আপাতত ছুটি আপনাদের। আপনারা নিজ নিজ মকানে এখন চলে যান। বালবাচ্চাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে কয়েকদিন পরেই জৌনপুরে চলে আসুন। আমি আপনাদের এন্তেজারে থাকবো।

আলী আশরাফকে সকলেই আবার মোবারক বাদ জানালো। এদের একজন মুখপাত্র বললো, ছুটি এখন বড়ই প্রয়োজন আমাদের। একটানা মেহানত করে আমরা পেরেশান

হয়ে পড়েছি। মকানেই আমরা ফিরে যাবো ঠিক, কিন্তু আপনাদের নিরাপদে জৌনপুরের সীমান্তে পৌঁছে না দিয়ে আমরা একজনও দল ছেড়ে যাবো না।

সকলেই আবার সমস্বরে আওয়াজ দিলো– হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কথাই আমাদের সবার কথা।

জওয়াবে আলী আশরাফ খোশ দীলে বললো, সাব্বাস্!

আবার তারা যাত্রা শুরু করলো। তাদের জন্যে এখন এ এলাকা নিরাপদ নয়। প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটার মধ্যে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন দুশমন তাদের আপাতত ধাওয়া করতে না পারলেও যে আঘাত হেনে এসেছে তারা, নয়া সুলতান তা বরদাস্ত করে অধিকক্ষণ নীরব হয়ে থাকবে না। আলী আশরাফ তাই সবাইকে অশ্বের গতি যথাসাধ্য বর্ধিত করে এক লক্ষ্যে খানকাহ শরীফের দিকে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

একটানা ছুটে খানকাহ শরীফের কাছাকাছি আসতেই তারা দেখতে পেলো, সুফী সাহেব আর লায়লা আকতার খানকাহ শরীফের বাইরে এসে তাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি আসতেই তাদের অক্ষত দেখে সুফী সাহেব স্বস্তির সাথে বললেন, আল হামদুলিল্লাহ! তোমরা যে সহি সালামতে ওয়াপস আসতে পেরেছো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে শোকর গুজারি করছি।

আতা খাঁ আফসোসের সাথে বললো, হুজুর, আশা ভরসা সব খতম হয়ে গেছে।

সুফী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এইমাত্র সব শুনলাম। আমার ভাই আজম খান এসে এইমাত্র তামাম খবর দিয়ে গেলো।

আলী আশরাফ বললো, কোথায় গেলেন তিনি?

ঃ আপাতত কোন এক নিরাপদ আশ্রয়ে। পরে মক্কা শরীফে চলে যাবেন।

আতা খাঁ বললো, হুজুর আপনিও তাহলে চলুন আমাদের সাথে। আপনার আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

সুফী সাহেব মুসকি হাসি হাসলেন। বললেন আমি ফকির দরবেশ মানুষ। আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকি। আমি আবার যাবো কোথায়?

ঃ হুজুর!

ঃ আমাকে নিয়ে তোমাদের পেরেশান হতে হবে না। আমাকে হেফাজত করার দায়িত্ব ঐ একজনের। আমার গায়ে হাত উঠানোর সাহস কেউ করবে না। এবার তোমরা বলো, কি করে এলে ওদিকে?

আলী আশরাফ সংক্ষেপে সবকিছু জানিয়ে দুঃখিত কণ্ঠে বললো, আফসোস্ যে রাজা গণেশের পাত্তা লাগাতে পারলাম না।

সুফী সাহেব কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। কিন্তু তোমাদের এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। যে কোন সময় বিপদের ঝুঁকি

আসতে পারে।

আতা খাঁ বললো, এক্ষুণি আমরা বেরিয়ে পড়বো হুজুর।

ঃ কিন্তু এত লোক কোথায় যাবে তোমরা?

ঃ আমি যাবো পাটনায়। আমার বড় ভাই সেখানে এক ফৌজী উস্তাদ। আমিও ঐ পেশাতেই যোগ দেবো। আলী আশরাফ সাহেব আর আমাদের এই বহিন যাবেন জৌনপুরে। সেপাইরা আপাতত নিজ মকানে চলে যাবে। পরে তারা জৌনপুর ফৌজে গিয়ে যোগ দেবে। আলী আশরাফ সাহেব সে ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছেন।

ঃ আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুন! সেপাইদের জৌনপুরের ফৌজে নেয়ার জন্যে জৌনপুরের সুলতানকে আমিও সুপারিশ করবো। কিন্তু তোমরা কি এইভাবেই রওনা হবে, না একটু জিরিয়ে নেবে? এই মুহূর্তেই পাণ্ডুয়ার ফৌজ তোমাদের বিরুদ্ধে এখানে আসার সাহস করবে বলে আমি মনে করিনে।

আলী আশরাফ বললো, তবুও আপনি এযাযত দিলে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়বো আমরা। এ মুলুকে আমি আর স্বস্তির সাথে নিঃশ্বাস নিতে পারছিনে।

সুফী সাহেব বললেন, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন!

সুফী সাহেবকে কদমবুছি করে আলী আশরাফ, লায়লা আকতার আর আতা খাঁ পুনরায় ঘোড়ায় চেপে বসলো এবং ফৌজসহ জৌনপুরের দিকে রওনা হলো।

জৌনপুরের সীমান্তে পৌঁছে আবার তারা দাঁড়ালো। এখানে এসে সেপাইরা সকলেই সকলের সাথে কোলাকুলি করে জুদা হয়ে গেলো এবং নিজ নিজ মকানের দিকে ছুটলো। আতা খাঁও জুদা হয়ে ভিন্ন রাস্তা ধরলো। যাবার আগে সে অল্পদিনের মধ্যেই জৌনপুরে এসে সবার সাথে সাক্ষাত করে যাবে এই ওয়াদা দিয়ে গেলো।

রইলো শুধু আলী আশরাফ আর লায়লা আকতার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে তারাও জৌনপুরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

নয়

ঘোড়াগুলোকে দানা দিয়ে এসে সহিস কোরবান আলী বাইরের আঙ্গিনায় দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে সে সুদূর রাস্তার দিকে নয়ন দুটি ছেড়ে দিলো। দূর থেকে দু'টি অশ্ব ছুটে আসছে– এ দৃশ্য হঠাৎ তার নজরে আটকে গেলো। সে কৌতূহলবশেই

সেইদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। অশ্ব দু'টি ছুটে আসছে। কখনও আগেরটা পেছনে, কখনও পেছনেরটা আগে, আবার কখনও বা পাশাপাশি।

অশ্ব দু'টি নিকটতর হতেই কোরবান আলী চমকে উঠলো। সে খেয়াল করে দেখলো, একটার উপর আলী আশরাফ। আর যায় কোথায়! দেখামাত্রই সে উল্লাসে আর চীৎকারে মকানটা তামামই মাথায় তুলে নিলো। সে হাঁক দিয়ে বললো, আব্দুল্লাহ ভাই, ও আব্দুল্লাহ ভাই, শীগগির এদিকে এসো! শীগগির শীগগির!

শেখ আব্দুল্লাহ মকানের ভেতরে থেকে জবাব দিলো, কেন, কি হয়েছে?

কোরবান আলী বললো, আরে ভাই, এসো না জলদি। এসে দেখো, এদিকে কি তাজ্জব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে!

ভেতর থেকেই শেখ আব্দুল্লাহ বললো, তাজ্জব কাণ্ড মানে? কি বলছো?

কোরবান আলী চীৎকার করে বললো, ওরে বাস্‌রে! ভাতিজা–ভাতিজা! ভাতিজা আ-গিয়া!

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শেখ আব্দুল্লাহ বললো, ভাতিজা কোথায় পেলেন?

ঃ ঐ যে, ঐ রাস্তায়!

ঃ রাস্তায় ভাতিজা। কোন্ ভাতিজা? কার ভাতিজা? দিমাগ তোমার বিগড়ে গেলো নাকি?

ইতিমধ্যেই আলী আশরাফ নিকটে এসে গেছে। শেখ আব্দুল্লাহ বাইরে এসে চোখ তুলতেই সে আলী আশরাফকে দেখতে পেলো। তখন আব্দুল্লাহও একে ওকে ডাক-হাঁক করে আর একদফা মকানটা গরম করে ফেললো।

আলী আশরাফ আর লায়লা আকতার দহলজের সামনে এসে থামতেই কোরবান আলী ছুটে গিয়ে অশ্বের লাগাম ধরলো এবং শেখ আব্দুল্লাহ আনন্দে ছটফট করতে লাগলো। অশ্ব থেকে নেমে আলী আশরাফ উভয়ের সাথে মোসাফেহা করতে করতে সকলের তবিয়তের খবর নিলো। লায়লা আকতার নেমে এসে শেখ আব্দুল্লাহকে কদমবুছি করার জন্যে পায়ের কাছে বসতেই শেখ আব্দুল্লাহ উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে বললো, আরো মা'শা আল্লাহ! ভাতিজা আমার একা আসেনি। কোরবান মিয়া? শাদি করে বউও সঙ্গে এনেছে!

আলী আশরাফ মজাক করে বললো, ছিঃ! বউ কোথায় দেখলে চাচা? ওতো একটা বেগানা আউরাত!

ফুটো বেলুনের মতো শেখ আব্দুল্লাহ চুপসে গেলো। সে হতভম্ব হয়ে বললো, বেগানা আউরাত! বেগানা আউরাত কোথা থেকে আনলে?

আলী আশরাফ বললো, ঐ রাস্তা থেকে চাচা। আমি একজন বেগানা আদমী জেনেও

ঐ বেগানা আউরাতটা আমার ঘোড়ার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে!

শেখ আব্দুল্লাহ হতবাক! সে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কদমবুছি করে উঠে লায়লা আকতারও মুখ খুললো এবার। বললো, ঐ বেগানা আদমীটাকে জিজ্ঞাসা করুন চাচা, আমি ওর ঘোড়ার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি, না উনিই আমার ঘোড়ার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে আমাকে তাড়া করে এখানে নিয়ে এসেছেন?

বোরকায় মুখমণ্ডল ঢাকা ছিলো বলে শেখ আব্দুল্লাহ লায়লা আকতারকে পয়চান করতে পারনি। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই সে চমকে উঠলো। ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, কে! কে তুমি?

লায়লা আকতার বললো, আমি আপনার তালেবে এলেম।

আলী আশরাফ বললো, মহিলা তালেবে এলেম!

শেখ আব্দুল্লাহ বললো, মানে?

আলী আশরাফ বললো, চিনতে পারলে না চাচা? এই আউরাতটা আমাকে গুনাহগারীর ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে একদম ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। ও ভয় আর আমি করছি নে। এই দেখো–

বলেই সে লায়লা আকতারের মুখের ঢাকনা তুলে ধরলো। কোরবান আলীও এই সময় শেখ আব্দুল্লাহর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তারা এক সাথে চমকে উঠে বললো, একি! লায়লা আকতার! –তাজ্জব!

আনন্দে আর উল্লাসে আলী আশরাফের জৌনপুরের মকান আবার ভরপুর হয়ে উঠলো। আলী আশরাফ আর লায়লা আকতারকে পাশে বসিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ উভয়ের তামাম খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে লাগলো। লায়লা আকতারের কাহিনী শুনে সে যেন তাজ্জব হলো। তেমনি আলী আশরাফ তাকে উদ্ধার করে এনেছে শুনে দীলে তার খুশীর তুফান ছুটলো। আলী আশরাফের বাহিনীর মধ্যে মিয়া মোস্তাককে খতম করার খবর শুনে শেখ আব্দুল্লাহ খুশীতে লাফিয়ে উঠে বললো, সাবাস! বাপের বেটার মতো কাজ করেছো একখানা।

আফতাব খাঁর অপকীর্তি আর তার পরিণতির কথা শুনে শেখ আব্দুল্লাহ আর কোরবান আলী এক সাথে বললো, ব্যাটা গিদ্দরের বাচ্চা! যেমন কুকুর তেমন মুগুর খেয়েছে। বাহাদুরী একখান দেখিয়েছো বটে।

পরের দিন সবেরেই লোকজন নিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ মকানটা সাফা করতে মনোনিবেশ করলো। সেই সাথে কোরবান আলী ও অন্যান্য ঝি-চাকর নানা রংগে তামাম মকান সুসজ্জিত করতে লাগলো। তা দেখে আলী আশরাফ আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, চাচা, এসব কি?

শেখ আব্দুল্লাহ ধমক দিয়ে বললো, থাম বেটা গুনাহগার! গুনাহগারীর জের টানতে আর দিচ্ছি নে।

লায়লা আকতার আলী আশরাফকে আড়াল থেকে বললো, এসব কি?

আলী আশরাফ ঠেস দিয়ে বললো, কোনো বেগানা আউরাতের স্থান এ মকানে নেই। সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।

সেইদিনই বাদ মাগরিব আলী আশরাফের সাথে লায়লা আকতারের শাদি মোবারক সুসম্পন্ন হলো। খানাপিনা ধুমধাম আর লৌকিকতার পর আলী আশরাফ তার ঘরে ঢুকে দেখলো লায়লা আকতার ইতিমধ্যেই তার সর্বস্ব দখল করে বসে আছে। আলী আশরাফ ঘরে ঢুকেই বললো, গোস্তাকী মাফ হয় হুজুরাইন, আদব আখলাক খুইয়ে হঠাৎ এই পর্দানশীন আউরাতের ঘরে ঢুকে পড়লাম। গুনাহ্ কিছু করলাম নাতো?

ঃ তবে রে

কপট ক্রোধে ফুসে উঠে লায়লা আকতার ছুটে এলো এবং আলী আশরাফের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

* * *

পরম তৃপ্তি আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে আলী আশরাফের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো। বর্তমান জিন্দেগীর রসঘন আমেজে অতীত তার নসরে ঝাপ্সা হয়ে এলো। ফিকে হয়ে এলো বাংলা মুলুকে কওমী স্বার্থরক্ষার্থে তার ব্যর্থতার তামাম আফসোস্ আর গ্লানি।

বছর তিনেকের অধিকাংশ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আলী আশরাফ একদিন তার দহলজে বসে বিস্মৃত প্রায় অতীত নিয়ে টানা হেঁচড়া করছিলো। ঠিক এই সময় তার হাতে এলো লেফাফাবদ্ধ একটা মোটা ধরনের খত। লেফাফা ছিঁড়ে খতটা বের করতেই সে দেখে খত একটা নয়, দুটো। যে খতটা পয়লা তার হাতে এলো সেইটেই সে পড়তে শুরু করলো ঃ

ভাই সাহেব,

বাদ তসলিম জানাই, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির মতো আমার বক্তব্যগুলো আপনার কাছে পেশ করছি। আপনাকে কিছু বলার মতো মুখ আমার নেই। যে জুলুম আপনার উপর চালিয়েছি, যে না-ফরমানি আপনার সাথে করেছি, তাতে জাহান্নাম ছাড়া মুখ লুকানোর দুস্রা কোন ঠাঁইও আমার নেই। আপনি যে সত্য আর শাশ্বতকে উপলব্ধি করেছিলেন, নাদান আমি কোনদিন তা দীল দিয়ে অনুভব করতে চাইনি। দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য না বুঝতে পেরে, মূর্খ আমি অন্ধ হয়ে মিথ্যার পেছনে ছুটেছি। কওমী স্বার্থের সাথে যে নিজের স্বার্থ জড়িত, এ উপলব্ধি কোনদিনই দীলে আমার পয়দা

হয়নি। আর তাই, কওমী স্বার্থ দুই পায়ে মাড়িয়ে নিজ স্বার্থ হাসিল বলতে আজ আর লজ্জা নেই। দোস্ত দুশমন নিরূপণে ব্যর্থ হয়ে আপনার মতো কওমের একজন এত বড় খাদেমকে খুন করার জন্যে আমি উঠে পড়ে লেগেছি। মাফ চাওয়ার জবানটাও তাই হারিয়ে ফেলেছি আজ।

ভাই সাহেব, আমি আজ মওতের রাহার রাহাগীর। এই খত যখন আপনার হাতে পৌঁছবে তখন নিশ্চয়ই আমি এ দুনিয়ায় আর থাকবো না। আমি এখন কয়েদখানায়। এই কয়েদখানা থেকে এসব কথা আপনাকে বলার অন্যতম কারণ এবং বড় কারণ, লায়লা আকতার আপনার কাছে। মওতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শুধু একটা মাত্রই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি যে, আমার চিরদুঃখিনী বহিনটা একটা পরম আশ্রয় পেয়েছে। অনেক দুঃখ আমি তাকে দিয়েছি। মেহেরবানী করে আপনি যেন তাকে আর কোন দুঃখ না দেন এই আরজটুকু রাখার জন্যেই এই খত আপনাকে লেখা।

আপনি জানেন কিনা জানি না, রাজা গণেশ গত পরশু পাণ্ডুয়ার মসনদে আরোহণ করেছে আমার মতো গাদ্দারদের ঘাড়ের উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে সে মসনদে উঠে বসেছে। আমরাই গাদ্দারী করে পাণ্ডুয়ার পর পর কয়েকজন মুসলমান সুলতানকে খতম করে দিয়েছি এবং তার মসনদ লাভের রাহা সাফা করে দিয়েছি। অথচ শুনে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন, মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মদদকারী তামাম মুসলমান সঙ্গীদের সে খতম করে দিয়েছে। দৌলত খাঁ, বিনবিল্লাহ, কামরুদ্দীন, আবু হোসেন প্রভৃতি আপনার জানা-নাজানা তামাম গাদ্দারদের সে দাওয়াত করে ডেকে এনে শাহী মহলের উদ্যানের পেছনে জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছে।

আমি পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেও কামিয়াব হতে পারিনি। গত সন্ধ্যায় শ্রী মাধবের ফৌজ আমাকে কয়েদ করে এনে কয়েদখানায় পুরেছে। কয়েদ করার সময় পরম বন্ধু শ্রী মাধবের কাছে দয়া ভিক্ষে করলে সে আমার মুখে থু থু ছিটিয়ে দিয়েছে। আমার জান এখন রাজা গণেশের মুখের একটা কথার অপেক্ষায় ঝুলছে। আগামীকাল এ দুনিয়ার মুখ আর আমি দেখবো কিনা জানিনা। কয়েদখানায় বসে এই যে খত লিখছি আপনাকে, এটাও শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে পৌঁছবে কিনা, তাও কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি পৌঁছে, তাহলে এই দোয়াই করবেন যাতে করে আমাকে দিয়েই শেষ হয় কওমের বিরুদ্ধে এই গাদ্দারী।

গুনাহ্‌গার

আব্দুল লতিফ

খতখানা পাঠ করে আলী আশরাফ আবার তা আগাগোড়া পাঠ করলো। দ্বিতীয় বার পাঠ করে সে খতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো। এরপর

সে দুস্‌রা খত মেলে ধরে লেখকের নামটা আগে দেখে নিলো। এ খতখানা লিখেছেন মুহব্বত খাঁ। আলী আশরাফ তারিখ মিলিয়ে দেখলো, আব্দুল লতিফের লেখার পনের দিন পরে মহব্বত খাঁ লিখেছেন এই খতখানা। তিনি লিখেছেন ঃ

দোয়ারব ভাতিজা,

আপনার প্রতি আমার স্নেহ ও দোয়া রইলো। এতোদিন পর আমার খত পেয়ে নিশ্চয়ই আপনি অবাক হবেন। আমার একান্ত ইরাদা ছিলো আপনার সাথে সাক্ষাত করার। কিন্তু নসীব আমার বিপক্ষে থাকায় আমি মওকা করতে পারিনি। আজও আমি মওকা করতে পারলাম না বলেই এই খত লিখছি আপনাকে। এই জিন্দেগীতে আর আমাদের মোলাকাত হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাই রইলো না। আমি মক্কা শরীফ চলে যাচ্ছি। যে কাফেলার সাথে যাচ্ছি আমি সে কাফেলা আগামীকালই রওনা হবে। আমি যদি এ মওকা হারাই, এ জিন্দেগীতেও আর আমার যাওয়া হবে না সেখানে।

আমার পুত্রবধূ আর নাতী-নাতনীর কি হবে, তা ভেবে হয়তো আপনি পেরেশান হচ্ছেন। কিন্তু তারাই আমাকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। আমার পুত্রবধূ অন্যত্র নিকাহ বসেছে এবং নাতী-নাতনীদের তাদের মামরা এসে নিয়ে গেছে। এদিকে আবার আমার মুনিব দৌলত খাঁও জিন্দা নেই। আমি এখন আযাদ!

বাপ আশরাফ, রাজা গণেশ এখন এই বাংলা মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর পর এই তিন সাড়ে তিন বছরে পর পর তিন তিনটা মুসলমান সুলতানদের কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে এখন তিনি নিজেই মসনদে উঠে বসেছেন। সবচেয়ে গরম খবর যে, মসনদে উঠেই তার মুসলমান তামাম সঙ্গীদের তিনি খতম করে দিয়েছেন। আমার মুনিব দৌলত খাঁও রেহাই পাননি। গাদ্দারেরা সকলেই তাদের গাদ্দারীর আখেরী এলেম পেয়েছে। আমার এই খতের সাথে জায়গীরদার আব্দুল লতিফের একখানা খত পাঠালাম। কয়েদখানায় থেকে যেদিন তিনি এই খত লেখেন, তারপরের দিনই রাজা গণেশ তাকে প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে মেরেছেন। নানা হাত ঘুরে খতখানা আমার কাছে গতকাল এসে পৌঁছেছে। আমার খতের সাথে তাই এ খতটাও পাঠিয়ে দিলাম।

বাপজান, গাদ্দারদের গাদ্দারীর জন্যে বাংলা মুলুকে মুসলমানদের ভাগ্যরবি অস্তাচলের ওপার চলে গেলো। এখন আমাদের জন্যে এখানে শুধু আঁধার আর আঁধার। এই আঁধারে এখন বসে থাকা শুধু অর্থহীনই নয়, বিপজ্জনকও বটে। তাই মক্কা শরীফে চললাম। আমাদের এই পরিণতির জন্যে কারা দায়ী তা আপনি জানেন। শুধু গাদ্দারেরা একাই নয় বেহুঁশ সুলতানেরাও নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়ে বাংলা মুলুকে এই আঁধারি এনে দিয়েছেন। তাঁদের এই উদাসীনতা, তাদের এই অদূরদর্শিতা, ইতিহাসে

একটা জ্বলন্ত নজীর হয়ে রইলো। অনাগতকালের মুসলমানদরে পথ নির্দেশিকা হিসাবে গাদ্দারদের এই গাদ্দারী আর সুলতানদের এই অদূরদর্শিতা লাল অক্ষরে লেখা একটা দলিল হয়ে রইলো। জানি না এ থেকে কোন পাঠ আমাদের আগামী দিনের কওম গ্রহণ করবে কিনা।

শুধু একটা কারণেই রাজা গণেশের আমি প্রশংসা না করে পারছিনে। তাঁকে উপদেশ দেয়ার জন্যে তাঁর গোত্রে কোন মাওলানা মোজাফফর শামস বলখীও নেই, তাঁর কোন ধর্মগ্রন্থের চরম নির্দেশও নেই। তবু জেনে আপনি অবাক হবেন যে, আমীর উমরাহ তো দূরের কথা, তহসীলদারের উপরে কোন মুসলমান কর্মচারী তাঁর হুকুমাতে নেই। যে এলেম গুলে খাইয়েও আমাদের সুলতানদের দেয়া যায়নি, সে এলেম রাজা গণেশ নিজেই হাসিল করেছেন।

কওমে কওমে জেহাদ করে টিকে থাকার ময়দানে তাঁর এ দূরদর্শিতা প্রশংসার বৈ কি!

খাদেম

মুহব্বত খাঁ

- ০ -